বিশ্বপথিক বাঙালী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা - ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়,
১৮৮২ শকাব্দ

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অসীম মুখার্জি

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

যাঁহাকে সশ্রদ্ধচিত্তে গুরু বলিয়া
বরণ করিয়াছিলাম সেই স্বর্গত
বিনয়কুমার সরকারের
উদ্দেশে

ভূমিকা

সমাজ ও সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, এই গ্রন্থে সেগুলি একত্রিত করা গেল। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ের হলেও সেগুলির মধ্যে একটা মূলসূত্র পাওয়া যাবে এই ভরসাতেই সেগুলি একত্রিত করা হল।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বিশ্বপথিক বাঙালী

সভ্যতার আদি যুগে মানুষ ঘর বাঁধতে শেখে নি, তখন তার ছিল যাযাবরবৃত্তি। পৃথিবীর সহজ দানের প্রাচুর্য যেখানে মিলত সেখানে দিনকয়েক থাকত সে, তারপর আবার চলত অন্যত্র দানভাণ্ডার খোঁজার পালা। এমনি করে সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে, সে তখন ছিল পথচলতি মানুষ, তার জঙ্গমতায় স্থাবরত্বের কোনো বাঁধন ছিল না। তার পরে এল যুগবদলের পালা। পৃথিবীর দান দোহন করবার কৌশল তখনো মানুষের আয়ত্ত হয় নি, কিন্তু জীবজন্তু পালন তখন তার আয়ত্তে। সে দুধ খায়, মাংস খায়, মেষের লোমে জামা করে, জন্তুর চামড়ায় তাঁবু করে—তার জীবনের সঙ্গে পশুপালন সংযুক্ত হয়েছে। কালক্রমে এই পশুচারণ যুগও মানুষ কাটিয়ে এল সে যখন শিখল কৃষির গোড়ার তত্ত্ব—পৃথিবীর দানকে নিজের মতো করে আদায় করার কৌশল। সে কৌশল প্রথমে খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। এখনও আদিম জাতের মধ্যে জুম চাষের প্রচলন আছে—হলকর্ষণ তারা শেখে নি। যাই হোক, কৃষিযুগের শুরু সেখানেই। সেই প্রথম স্থাবরত্বের শক্ত বাঁধন পড়তে লাগল জঙ্গমতায়। যাযাবর বাঁধনছেঁড়াভাবে যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারে, তার কোনো পিছটান নেই। পশুচারণ যুগে হয়তো সামান্য কিছুটা বাঁধন লেগেছে, কেননা পশুর পাল নিয়ে অত সহজে ঘুরে বেড়ানো যায় না, যেখানে চারণভূমি নেই সেখানেও বসবাস করা যায় না। তা ছাড়া পশুর পাল শুধু জীবনের সহায়ই ছিল না, সময় সময় বিনিময়েরও বাহন ছিল। কিন্তু তবু তার জঙ্গমতার অভাব হয় নি। কিন্তু মাটির মায়া লাগালো প্রথম বাঁধন। যে জমি চাষ করে সে জমি ফেলে সহজে অন্যত্র যেতে পারে না, অন্ততঃ যতক্ষণ না আর এক জায়গায় আরও ভালো জমি পায়। পেলেও

সে জমি তৈরি করায় পরিশ্রম আছে। সুতরাং কৃষিসভ্যতার সঙ্গে মানুষও ঘর বাঁধতে শুরু করল, আরম্ভ হল গ্রামের পত্তন। ক্রমে ক্রমে গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী। সভ্যতা যুগে যুগে বিবর্তিত হতে লাগল।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে জীবিকার কৌশলই বদল হয়েছে তা নয়, মানুষের জীবন ও তার সমাজসংগঠনও বদল হয়েছে। কারণ, ইতিহাসের এই ব্যাপক পটভূমিকায় আলোচনা করলে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত মানুষ তার সমাজকে সেইভাবেই সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছে যে সমাজের মাধ্যমে তার জীবনযাত্রা সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। যেখানে সে তা পারে নি সেখানেই তার ক্ষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টয়েনবী বলেছেন যতদিন গ্রীক রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল না ততদিন তাদের সমাজসংগঠন হিসেবে নগর-রাষ্ট্র বা City States-গুলির সার্থকতা ছিল যথেষ্ট—কিন্তু যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেখা দিল এবং প্রয়োজনও হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের, তখনও তারা নগর-রাষ্ট্রের বাঁধন কাটিয়ে দেশজোড়া বৃহৎ সংস্থা গড়তে পারল না বলেই গ্রীসের ঘটল অপমৃত্যু। কিছু কিছু এরকম সংস্থা গড়ে ওঠার চেষ্টা শেষের যুগে গ্রীসে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সফল হয় নি। বাস্তবিক, এই সহজ সত্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। যে যাযাবর মানুষ সঙ্গীহীন চলেছে দেশদেশান্তরে, কোথায় তার পরিবার, কোথায়ই বা তার সমাজ আর কোথায়ই বা তার রাষ্ট্র! সে একা। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পশুর দল চারণ করতে গেলেও কিছুটা সংগঠন দরকার, দরকার পারস্পরিক সাহায্য—কাজেই তার মধ্যে রাষ্ট্রের বা সমাজের সন্ধান না পাই, অন্ততঃ পরিবারের বা গোষ্ঠীর সন্ধান পেলে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। তেমনি একথাও সহজেই বোঝা যায়, কৃষির কাজ একলার নয়, তার মধ্যে বিপুল

এবং বিরাট সংগঠন ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। কাজেই তার তাগিদে যদি শুধু পরিবার বা গোষ্ঠী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় তা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। গ্রামীণ জীবন ও নাগর জীবনের পার্থক্যের মূলও তো এইখানে। যে প্রয়োজনের তাগিদে নগর বা মহানগর গড়ে সে তাগিদ আর গ্রামসমাজের তাগিদ এক তো নয়,—বরং একেবারে মূলতঃ তফাত।

কৃষিজীবন জগতে বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, শুধু ভারতবর্ষে নয়, অন্যত্রও। সে তুলনায় যন্ত্রসভ্যতা তো নেহাতই নাবালক। কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে যে কৃষিসভ্যতা চলে এসেছে বাহ্যতঃ সে কৃষিসভ্যতা বলে চিহ্নিত হলেও তার চেহারা কালে কালে বিপুল পরিবর্তিত হয়েছে—বস্তুতঃ তার আদি ও অন্ত যুগের চেহারা মোটেই একরকম নয়। সমাজশাস্ত্রীরা জানেন কৃষিসভ্যতার গোড়ার যুগে জমির মালিকানা ছিল যৌথ, ক্রমে ধীরে ধীরে তা ব্যক্তিগত হয়ে উঠল। এ বিবর্তন হতে কমদিন লাগে নি। এইভাবে কৃষিসভ্যতা চলতে চলতে আর এক ধাপ দেখা দিল। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও যেমন চেহারা গেল বদলে, তেমনি অন্যদিকে দেখা দিল হস্তশিল্প। এর সঙ্গে ঘটল আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এঙ্গেলস্ তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের গোড়ার কথা' (*The Origin of the Family, Private Property and the State*) নামক পুস্তকে এই বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, The division of production into two great branches, agriculture and handicrafts, gave rise to production for exchange.... and with it came trade, not only in the interior and on the tribal boundaries, but also overseas. অর্থাৎ কৃষি এবং হস্তশিল্প এই দুটি বিভাগ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন আর শুধু নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উৎপাদন রইল না—

উৎপাদন হল বিনিময়ের বাহন। লক্ষ্মী ছেড়ে মানুষের মন ধাবিত হল কুবেরের ভাণ্ডারের দিকে—প্রয়োজনের সীমানা গেল বদলিয়ে। সেই সঙ্গে স্বতঃই দেখা দিল বাণিজ্য। শুধু দেশের চতুঃসীমার মধ্যে বাণিজ্য নয়, সপ্তসাগর পেরিয়ে বাণিজ্যও।

কৃষিসভ্যতার ইতিহাস মোটামুটি অনুধাবন করলে দেখা যায়, যন্ত্রযুগের পূর্ব পর্যন্ত তার বিবর্তন মোটামুটি এইভাবেই চলে এসেছিল। সেই প্রাচীন ফিনিসীয় নাবিকেরা পণ্য বহন করে ফিরত দেশ-দেশান্তরে, ভারতবর্ষের বাণিজ্যতরী নোঙর ফেলেছে দেশবিদেশের ঘাটে ঘাটে। বাংলার মসলিনের বাজার জমেছে গ্রীসে, রোমে—পরের যুগে ইংলণ্ডেও। সেই বাণিজ্যতরী গিয়েছে প্রাচ্যভূখণ্ডের বন্দরে বন্দরে, তার সপ্তডিঙা মধুকর পাড়ি জমিয়েছে উত্তাল ভারত-মহাসাগরে—শুধু বাণিজ্যের পণ্য নয়, সংস্কৃতির বার্তাও পৌঁছে দিয়েছে দ্বীপময় মহা-ভারতবর্ষে। তেমনি পাহাড় মরুভূমি পার হয়ে চলেছে সার্থবাহ, চীনে জাপানে নিয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষের বার্তা। বস্তুতঃ ইতিহাসের সেই সুদূর অতীতে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল এশিয়া—ইউরোপ তখনও জাগ্রত হয় নি। তাই সভ্যতার বিকাশের সেই গোড়ার যুগে প্রাচ্যভূখণ্ডেই চলত বেশিরকম আনাগোনা—দেশ-দেশান্তরের মধ্যে সংযোগ রচিত হতে থাকত।

এই বিরাট আদানপ্রদান সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কৃষিসভ্যতার মূল কথাটা ছিল আঁকড়ে থাকা। বণিকসম্প্রদায় দেশ-বিদেশে যতই ঘুরুন না কেন, কৃষিসভ্যতার গোড়ার কথা হল মাটি। মাটি ছেড়ে নড়াচড়া সহজ নয়। সেইজন্য কৃষিসভ্যতার আনুষঙ্গিক হিসেবে যতই বাণিজ্য চলতে থাকুক না কেন, তার মূল ছিল মাটির গভীরে, তার শিকড় ছিল পোঁতা। বণিকদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী লোক দেশ-বিদেশে প্রায় যেতই না, দূরের শহর-নগরেও নেহাত প্রয়োজন না পড়লে যেত না। গ্রামকে কেন্দ্র করেই তাদের

জীবন আবর্তিত হত, কারণ তাদের সমস্ত কর্মই ছিল গ্রাম ও ভূমিকে কেন্দ্র করে। অর্থনৈতিক জীবনের এই তাগিদে সমাজজীবনও গড়ে উঠেছিল অনুরূপভাবে। তাই আমাদের পণ্যতরী যতই মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাক না কেন, জীবন ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, বহির্বিস্তারী নয়।

কালক্রমে দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের এই যোগসূত্রও গেল শুখিয়ে। বাণিজ্যের ক্ষীণধারা লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে আমরা আরও স্বাশ্রয়ী হয়ে পড়লুম, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গেল কেটে। আর কোনো বশিষ্ঠ হিমালয় পার হয়ে গেলেন না তিব্বত-চীনে, কোনো অতীশ-দীপংকর গেলেন না বিদেশে, বিদেশের কোনো ছাত্র এসে শোভাবর্ধন করতে থাকল না নালন্দার মতো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের। অজ্ঞান হল ভয়ের জন্মভূমি, অজানাকে ভয় করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। দেশবিদেশের মানুষ ও তার আচার-ব্যবহার-সংস্কৃতি আমাদের যতই অজানা হয়ে পড়ল ততই তারা হয়ে দাঁড়াল ভয়ের আকর—আমরা তাদের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। যে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ সামাজিক গঠন এবং মানসিক আদর্শের ফলে একদিন নিখিল বিশ্বে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলতে পেরেছিল আয়স্তু সর্বতঃ স্বাহা, সকলে আসুক সকল দিক থেকে, যার বাণী কাল ও দেশের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে নিখিল মানবচিত্তে ধ্বনিত হতে পেরেছিল, সেই ভারতবর্ষ ক্রমে জীর্ণ ঠুন্‌কো আচারের বেড়াজালের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে উটপাখির মতো ভাবতে শুরু করল, এইবার মাটিতে মুখ লুকিয়েছি, আর বুঝি কেউ আমায় দেখতে পাবে না। আমাদের জীবনদর্শনও তখন সমাজের প্রাণপ্রবাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ন্যায়ের চুলচেরা তর্কের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের প্রাণপদ্মের যে বিকাশ-সৌরভে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা এশিয়া আমোদিত হয়েছিল সেই প্রাণপদ্ম মুদিত হয়ে গেল। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এর পিছনে একটা বিরাট্ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বদল ছিল।

যা ঘটেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে হয় আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি কি না। তার জন্য বুঝতে হবে, এখন জগতে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠন হয়েছে এবং তার দাবি কি। একথা পাঠ্যপুস্তকেও বারবার বলা হয়ে থাকে, গত দু'শো বছর ধরে জগতে যে যুগের আবির্ভাব হয়েছে সে যুগ হল যন্ত্রের যুগ, তার সভ্যতা হল যন্ত্রসভ্যতা। যন্ত্র যে আগে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে যন্ত্র এখনকার যন্ত্রের মতো মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে নি, আর তখন যন্ত্রই সভ্যতার নিয়ামক হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কালক্রমে যন্ত্ররাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা গেল বদলিয়ে। উৎপাটিত হল কৃষিসভ্যতা, ভেঙে গেল গ্রামকেন্দ্রিক স্বাশ্রয়িতা, গড়ে উঠল বড় বড় নগর বন্দর, পণ্য চলতে লাগল অনবরত দেশবিদেশে। এ পণ্য আগের যুগের পণ্য নয়, যা কেবল বণিকদের ব্যাপার ছিল। এ পণ্য উৎপাদন করে সারা দেশের লোকে, বিদেশের বাজারের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়, জগতের এক কোণে মন্দার লক্ষণ দেখা দিলে জগতের অপর কোণে সারা দেশের লোকের যায় মুখ শুখিয়ে। আর্জেন্টিনায় বিপ্লব ঘটলে ইংরেজের ঘরে ঘরে দেখা দেয় মাংসের অভাব, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ডাণ্ডীর ম্যান্‌চেস্টারের কলে কারখানায় পড়ে কালো ছায়া। সারা দেশের লোকের ভাগ্য গেল অপরাপর দেশের সঙ্গে জড়িয়ে। মার্ক্‌স্ পর্যন্ত তো বলেছেন, এই হল ধনতন্ত্রের বৈপ্লবিক ভূমিকা। সে তার খরনখর প্রসারিত করেছে সারা জগতের গ্রামে নগরে, তার ছায়া পড়েছে নিখিল বিশ্বের প্রান্ত-প্রান্তরে, উৎখাত করেছে সে দেশ-বিদেশের গ্রামীণ সভ্যতাকে, বিপর্যস্ত করেছে কৃষিব্যবস্থাকে, অবসান ঘটিয়েছে সামন্ততন্ত্রের, বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে গোটা জগৎকে, আকাশবাতাসে শোনা গিয়েছে তার পরাক্রান্ত সিংহগর্জন। এইভাবে বাড়তে বাড়তেই তো দেখা দেয় তার শেষ রূপ, যাকে

লেনিন বলেছেন ফিনান্স-ক্যাপিটাল। তার রূপই হল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ মানবিক প্রয়োজন মেটাবার উপকরণ নয় অর্থ, সে হল বিপুল উৎপাদন ও লাভের উপকরণ মাত্র। সে উৎপাদন আদিম যুগের মতো নিজের বা আশেপাশের লোকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়, সে হয়তো স্বদেশের ক্ষুধা না মিটিয়ে বিদেশে চালান দেবার জন্য, যদি স্বদেশের চেয়ে বিদেশের বাজার হতে লাভের মাত্রা বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বিরাট বিশ্ব একত্র গ্রথিত হয়েছে, তাদের পারস্পরিক যোগসূত্র আর কাটাবার নয়। এক সময় তো বিলেতী লাট্টু মার্কা কাপড়ের দামের ওঠাপড়ার উপর অন্ততঃ কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি হত আমাদের চাষীর ব্যয়ের অঙ্কের।

আজ ধনতন্ত্রের যুগও অবসান হতে চলেছে, দেশে দেশে দেখা যাচ্ছে নতুন যুগের জয়যাত্রা, শোনা যাচ্ছে নতুন কালের পদধ্বনি। সে বস্তু সাম্যবাদই হোক সমাজবাদই হোক, একথা নিশ্চিত যে ফিনান্স-ক্যাপিটালের নির্বাধ পরাক্রম জগতে আর কোনোদিনই ফিরবে না। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে আমরা কুবেরের বদলে লক্ষ্মীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছি বলে জগৎকে আবার পিছিয়ে নিয়ে যাব বা পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারব। বস্তুতঃ তা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আর তার প্রয়োজনও নেই। যে যন্ত্ররাজ মানুষের হাত-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল, আজ তাকে আয়ত্তে এনে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে এর মানে নয় যে যন্ত্রটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তার অর্থ হল যন্ত্রটার মোড় ফেরাতে হবে, এই মাত্র। সুতরাং মনে রাখতে হবে, আমরা দু'শো বছর ধরে যে জালে জড়িয়েছি, যখন প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আমরা সমান মানুষ হিসেবে অপরের সঙ্গে মিশব তখন সেই জাল তো কাটবেই না, বরং অধীনতার গ্লানিমুক্ত অবস্থায় মানবকল্যাণের পরিবেশে সে জাল আরও শক্ত হবে কল্যাণময় হবে সুষমায় ভূষিত হবে।

আজকের দিনের প্রত্যেক দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন এমনই যে আর আমরা একলা থাকতে কিছুতেই পারছি না। বরং বলতে পারা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা শ্রেণীর মধ্যে শোষক-শোষিত সম্বন্ধ বিলুপ্ত হলে তখনই তো বেশি করে এবং সত্য করে শুরু হল বিশ্ব-পথিকের মহাভিনিষ্ক্রমণ, এই তো আরম্ভ হল তার প্রকৃত জয়যাত্রা। এই হল জগতের মেলায় মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, এই হল প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি যে আজকের দিনে কোনো মানুষই অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এতদিনে দেখা দিল সত্যকার মহামিলনের মন্ত্র। বাস্তবিক, স্বাধীন ভারতবর্ষ দেশে দেশে যে পঞ্চশীলের বাণী বহন করে ফিরছে সেটা মূলতঃ এই কথা ছাড়া আর কিছু নয়। সেকালের ভারতবর্ষ যেমন সেকালের পরিবেশে ডাক দিয়েছিল বিশ্বমানবকে আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, আজ তেমনি সে বলতে চাচ্ছে আমরা তোমাদের আহ্বান করছি রণদামামা বাজিয়ে নয়, দৌর্বল্যের গ্লানিতে নয়, পরাক্রমের অহংকারে নয়, আমরা তোমাদের আহ্বান করছি মানব-কল্যাণের যজ্ঞশালায়, তোমরা আয়ন্তু সর্বতঃ, সকল দিক হতে এসো, স্বাহা, তোমাদের মঙ্গল হোক। আজকের সন্দেহদিগ্ধ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জগতে ভারতবর্ষের ক্ষীণ কণ্ঠ কতদূর শ্রুতিগোচর হবে তা জানিনে, কিন্তু একথা সত্য যে ভারতবর্ষ আবার নতুন করে এ যুগের পরিবেশে সেই মানবকল্যাণের জয়ঘোষণা করবারই চেষ্টা করছে যা শুধু ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই নয়, শাশ্বত মানবাত্মার বাণী। কথাটা নতুন নয়।

আমাদের এই প্রসঙ্গে এই কথা ভাবতে হবে, প্রথমতঃ আমরা যে যুগে এসে পড়েছি সে যুগে দূরদূরান্তরের মানুষও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা। শুধু গ্রামটুকু নয়, শুধু চারপাশের সমাজটুকু নয়, কত দেশের কত চেনা অচেনা মানুষ তার সমাজ ও সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি নিয়ে আমাদের জীবনে ছায়াপাত করছে। তার উপর যাতায়াতের

সুবিধার জন্য কোনো দেশই আর দূর নেই। লণ্ডন তো আমাদের ঘরের কাছে, বিলেত থেকে ফিরবার পথে কায়রো এসে পৌঁছলেই মনে হয় যেন আসানসোল পৌঁছে গেলুম, পরের স্টেশনই বর্ধমান অর্থাৎ বোম্বাই, তারপরেই কলকাতা। অহরহ চলছে দেশবিদেশে যাতায়াত। এইভাবে আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছি, দূরত্ব ক্রমেই বিলীয়মান। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এসব ব্যাপার তো জগতের সর্বত্রই আজ ঘটছে, কিন্তু আমরা তার উপর দায়িত্ব নিয়েছি মানবমিলনের বাণী প্রচার করবার। আজকের পথই যে শুধু আমাদের বিশ্বপথিক হতে বাধ্য করছে তাই নয়, আমরাও আগ্রহসহকারে সে পথ বেছে নিয়েছি। সেজন্য আজকের দিনে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হল বিশ্বপথিক হবার। এ যুগের তাৎপর্যই এই। এমন কি সে পথ ছাড়া আমাদের স্বকীয়তার সাধনাও হতে পারে না।

প্রশ্ন হল, আমরা সে পথে সত্য সত্যই বেরিয়েছি কি না। মনে রাখতে হবে, যখন জগৎ এরকম ঘনসংবদ্ধ হয় নি, পরাধীনতার প্রথম ধাক্কায় যখন আমরা জীর্ণ এবং উদ্বিগ্ন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রথম সংস্পর্শে আমরা যখন ব্যতিব্যস্ত ও ভারকেন্দ্রচ্যুত, সেই বেসামাল বিপর্যস্ত যুগে বাঙালীই সব প্রথম বিশ্বপথিকতা ও ভারতপথিকতার পথে বেরিয়েছিল। 'ভারতপথিক রামমোহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> "যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদবিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন যোগায় সকল দেশকে সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা।…শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে ; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।…

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে ; …ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন ক'রে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে।…

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা ; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনীশক্তি বললাভ করে।…মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায় ? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা।…

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন

ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়।...এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী।"

তারপর কালে কালে শুধু রামমোহন নয়, বহু মহাপুরুষ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা এই ধারাকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করেছেন স্বকীয় তেজে এবং বীর্যে। বিদ্যাসাগর এর মধ্যে আর এক বিস্ময়কর আবির্ভাব। আচারনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে সংস্কৃতের পণ্ডিত হয়ে কি উদার আগ্রহ ছিল তাঁর সকল মানুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবার, চিত্তের স্বারাজ্য এবং মোহমুক্ত মনের নির্বাধ অনুশীলন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার। আর কি নিদারুণ নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন তার জন্য! একদিকে বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীলোকের অধিকার-প্রতিষ্ঠা, বহুবিবাহ-নিবারণ ও অন্য নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা হতে শুরু করে অন্য দিকে জাতিনির্বিশেষে জ্ঞানলাভের সুযোগদানের জন্য মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা—কোন্ দিকে তিনি অসীম বীর্যবত্তার সঙ্গে যুদ্ধ না করে গিয়েছেন! শকুন্তলা সীতার বনবাসের সঙ্গে তিনি যেমন পরিচয় ঘটিয়েছেন বাঙালী পাঠকের, তেমনি বালকপাঠ্য পুস্তকে লিখেছেন অস্ট্রিয়া ভিয়েনা জার্মানির গল্প। কি উদার আকাশে তাঁর চিত্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু শুধু বিদ্যাসাগর নন। বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়েও, যেমন তাঁর তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হয়েছে আমাদের সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের উপর। আর এই আম্নায়ে শেষ পর্যন্ত এলেন এই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। এঁদের সঙ্গে ছোটবড় আরও অনেকে এসেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে

সাধারণতঃই সংকীর্ণতার ধুলোর ঝড় ওড়ে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা যখন কংগ্রেসের কল্পনা করেছিলেন তখন সারা ভারতই তাঁদের চিত্তাকাশ জুড়ে ছিল। 'এক ধর্মরাজ্যপাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—এই ছিল তার মোটামুটি উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, বিশ্বপথিক বা ভারতপথিক হয়ে তাঁরা বাঙালীত্ব বা বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেন নি, বাংলার ক্ষতিসাধন করেও অন্য জায়গার হিত করতে যান নি। বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের প্রকৃত সাধনায় তা হয় না। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা, সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনীশক্তি বল লাভ করে। সুতরাং নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে বিশ্বপথিকতার কথা আওড়ানো কেবল ভানমাত্র। বস্তুতঃ যে মানুষ তার নিজের স্বকীয়তায় সফল হবে, সৃষ্টি করতে পারবে তার চারিত্রদীপ্তি, উৎসারিত হবে তার তেজ, সেই তেজের জোরেই সে বিশ্বমানবের সাধনাকে জয়যুক্ত করতে পারে, অন্যথায় নয়। এই পথে তার নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বহমান চিন্তাস্রোত অন্যকেও সঞ্জীবিত করতে থাকে, সাড়া জাগিয়ে তোলে দিকে দিকে, দেখতে দেখতে সে নতুন ইতিহাসের পুরোধা হয়ে দাঁড়ায়। গত শতকে বাঙালীর তাই ঘটেছিল।

আজ বাংলা তথা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, যখন আমরা বাইরের সঙ্গে একালের সমাজ ও রাষ্ট্রিক বন্ধনের অনিবার্য ফলস্বরূপে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ছি, ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে এমন কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা মনে ভরসা জাগায় না। স্বাধীনতালাভের পর এ আশা অসংগত ছিল না যে দেশময় এবার বিপুল কর্মের নির্মল স্রোত বইবে, যে স্রোতে আমাদের বহুকালসঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু তা হয় নি। আজ

দেশে নানাস্থানে কর্মের কিছু কিছু ধারা বইতে শুরু করেছে সত্য, কিন্তু তা এমন পরিমাণে নয় যাতে দেশের চেহারা ফিরে যেতে পারে। পক্ষান্তরে দেখা যাচ্ছে, আমরা পুরাতন বাঁধন সব ছিঁড়ে ফেলেছি, কিন্তু নতুন কোনো বাঁধন গড়ে তুলতে পারি নি। আগেকার সমাজ ও অর্থনীতির বাঁধনে শহর এবং গ্রামগুলি একধরনে বাঁধা ছিল। আজ সে বাঁধন কেটেছে। তার বদলে নতুন সমাজের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগের মধ্য দিয়ে মৌচাকের কোষগুলির মতো গ্রামগুলিকে গড়তে চেয়েছিলেন গান্ধিজী। কিন্তু তা-ও হয় নি। এখন আমরা যে পথ ধরেছি তাতে গান্ধিজীর কথা আর চলবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু সে কথা না চললেও ক্ষতি নেই, যদি আমরা একালের অন্য কোনো সফল পদ্ধতিতে দেশ গড়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা-ও হচ্ছে না। তার ফলে আজ দেশে সকল বাঁধন কেটে স্বার্থ দ্বেষ হানাহানি প্রবল হয়ে উঠেছে। তার একটা বড় উদাহরণ অত্যুগ্র প্রাদেশিকতা। সেই সঙ্গে জাতিগত ভেদবুদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বাধীনতার পর একদল ফিরে যেতে চান সেই প্রাচীন কালে, অর্থাৎ সেই রামরাজ্যে, যে অর্থে গান্ধিজী কখনো রামরাজ্য শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু অন্য প্রদেশের কথা বলি কেন? আজ বাংলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেও তো দেখা যায়, এখানে প্রাদেশিকতা প্রখর না হলেও ভেদবুদ্ধির অভাব নেই। বৃহৎ কাজে নতুন সমাজ গড়ার আহ্বানে আমরা তেমনভাবে মিলতে পারছি কই? এমন কি সার্বজনীন পুজো কি সংস্কৃতি-সম্মেলনের মতো ছোট ছোট ব্যাপারেও তো আমরা কেবল ভেঙে ভেঙে টুকরো করতেই সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের কথায় এরকম বুদ্ধি নিয়ে চুল চেরা যায় কিন্তু গ্রন্থিচ্ছেদন করা যায় না। সেইজন্যই বিস্মিত হবার কারণ নেই যে আমাদের ভাগ্যে কেবল গ্রন্থির উপর গ্রন্থি পড়ছে—আমরা যে সারা ভারতবর্ষের

হাতেই নিদারুণ মার খাচ্ছি তাই নয়, আত্মহত্যার চেষ্টাও কম করছি নে। এক-এক সময় মনে হয় এই মারের অনেকখানিই হয়তো আমাদের ন্যায্য পাওনা। যদি পাশের লোকের সঙ্গে মিলতে না পারি, মিলতে না পারি পাশের গ্রামের সঙ্গে, স্বার্থবুদ্ধি যদি প্রলয়ংকর হয়ে ওঠে, প্রতারণা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে প্রশংসিত হতে থাকে, সত্যনিষ্ঠার নাম হয় বোকামি, মানবসভার কল্যাণযজ্ঞে নিঃস্বার্থ কর্মীর সন্ধান বিরল হতে থাকে, তা হলে বলতেই হবে, যে পথ শ্রেয়স্কর তাকে পরিত্যাগ করে আমরা আপাত-প্রেয়স্কর পথই বেছে নিয়েছি, তা হলে স্বীকার করতেই হবে আজ বিরাট্ বিশ্ব তার বিশিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিন্যাসের ফলে এ যুগে বিশেষ করে আমাদের যে পথে আহ্বান করছে আমরা সে পথে চলছি না—তা হলে মেনে নিতেই হবে মনুষ্যত্বের যে উদ্বোধনে আজ শুধু আমাদের মুক্তি নয় এমন কি আর্থিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠাও, সেই উদ্বোধনের তূর্যধ্বনি আমাদের কানে পৌঁছয় নি। অথচ একদিন এই পথেই বাংলা ও বাঙালী বড় হয়েছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত বড় হবার পথই এই। আজ সেজন্য সে পথই কাম্য যে পথে বাঙালী শুধু যে পরস্পর মিলিত হতে পারবে তাই নয়, বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিহিতার্থকে পূর্ণ বিকশিত করে ভারতপথিকতা ও বিশ্বপথিকতার পথে বাংলাকেই বড় করবে, কারণ তাতেই তার চরিত্রের প্রতিষ্ঠা, তাতেই তার সেই তেজের বিকিরণ, যে মহনীয় তেজ সকল কালে সকল জাতিকে উন্নতির উত্তুঙ্গশিখরে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

বাংলার ভবিষ্যৎ

বহুকাল আগে প্রমথ চৌধুরী "বাঙালী পেট্রিয়টিজম্" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কোনও এক বন্ধু তাঁর বিরুদ্ধে বাঙালী পেট্রিয়টিজমের অভিযোগ এনেছিলেন। তার উত্তরে প্রমথ চৌধুরী কবুল জবাব দিয়েছিলেন, "বাঙালী পেট্রিয়টিজম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি।" কিন্তু ব্যাপারটা কেবল ব্যক্তিগত কবুল জবাবের ব্যাপার নয়। কারণ আমরা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর বাঙালী পেট্রিয়টিজমের দোষে দোষী এবং সেজন্য অল্পবিস্তর তিরস্কারও শুনতে হয় যে, আমরা মনেপ্রাণে সর্বভারতীয় হয়ে উঠতে পারছিনে এবং যে পরিমাণে তা পারছিনে সেই পরিমাণে আমরা সর্বভারতীয় ঐক্য এবং সংহতি বিনষ্ট করছি। বিশেষতঃ রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সময় যখনই কোনও প্রদেশ কিছু চেয়েছে তখনই তার মুখ চাপা দিয়ে বলবার চেষ্টা হয়েছে, আজ তোমরা জোরগলায় কিছু বোলো না কারণ সকলের আগে ভারতীয় ঐক্য দেখতে হবে। এই কথাটা আমরা ইদানীং এত বেশি শুনছি যে এবিষয়ে একটা সুষ্ঠু বিচার হওয়া দরকার।

ভারতীয় ঐক্য বলতে কি বুঝি? ভারতের ইতিহাস আজ আমাদের এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে যে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যতই বীর হই না কেন, আমাদের দেশপ্রেম যতই জ্বলন্ত হোক না কেন, সারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য আমাদের কখনই ছিল না। যে বন্ধন ছিল তা ছিল ধর্মে, তা ছিল সমাজগঠনে। কিন্তু তার বাইরে যাকে পোলিটিক্যাল ঐক্য বলা চলে তা কখনই গড়ে ওঠে নি, অন্ততঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সে কথা বলে না। আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন, পুরু তার বিরোধিতা করলেন, কিন্তু তক্ষশীলার

রাজা করলেন আলেকজান্দারের সাহায্য। তুর্কী আক্রমণের সময়ও ঠিক সেই একই ঘটনা। পৃথ্বীরাজ খুব জোর লড়াই করলেন বটে, কিন্তু জয়চাঁদও তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। বাবরের সঙ্গে রাণা সঙ্গ কিছু দলবল পাকিয়ে লড়াই করেছিলেন বটে, কিন্তু সারা উত্তর ভারতও এই প্রতিরোধে একবাক্যে যোগ দেয় নি। মারাঠারা যখন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে পারতেন তখন ভারতবর্ষের অন্যত্র সে সাড়া জাগে নি। ইংরেজ আক্রমণের সময়ও একই কথা—সে সময় মারাঠা আর শিখ-শক্তি একত্রিত হয়ে সারা ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারলে ইতিহাসের চাকাই হয়তো অন্যভাবে ঘুরে যেত। কিন্তু তা হয় নি। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ঐক্য ছিল ধর্মে এবং সমাজবন্ধনে—রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নয়। ব্যাপারটা এতই সত্য যে একথাটা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও তাঁর *Unity of India* নামক গ্রন্থে স্পষ্ট স্বীকার করেছেন ঃ

> "In India, where for long ages there had been a large measure of local self-government, the people were far more interested in their local freedom and rights than in the machinery of government at the top........An all India political unity thus was not possible in the past....This Indian background and unity were essentially cultural."—*Unity of India*, pp. 13-15

কাজেই আমরা এইভাবেই বরাবর চলে এসেছি। সে তো নেহাত ইদানীংকার কথা—যেসময় ইংরেজ অধীনতার নাগপাশে সারা ভারতবর্ষকে বেঁধে দিল সেইসময়ই আমরা সেই নাগপাশ ছেদন্ করবার জন্য কেবল এই ভাঙার সূত্রে একটা সর্বভারতীয় ঐক্য অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। উপরোক্ত গ্রন্থে জওহরলালই বলছেন, The British gave political unity of India. সুতরাং

ইংরেজ যেমন দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে বসে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে শাসন করেছে, আমরাও তেমনই আমাদের ধ্যানে এই আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তা অনুভব করতে শুরু করেছি, আমরাও সারা ভারতবর্ষকে একস্যূত্রে বেঁধে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি। সেইজন্যই বহুকাল পরে আমরা যে অখণ্ড ভারতবর্ষের ঐক্য নিবিড়ভাবে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, সেটা খুব বেশি দিনের কথা নয় এবং এক হিসেবে তা ভারতের ইতিহাসেই অভিনব।

যতদিন ইংরেজ ছিল ততদিন এই কৃত্রিম ঐক্যও ছিল, ততদিন আমরা আসল ঐক্যের দিকে মন দিই নি। বহুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন—

> "কারণ যাই হোক্‌ প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি। মনে পড়ছে আমার কোন-এক লেখায় ছিল, যে জীর্ণ গাড়ির চাকা-গুলো বিশ্লিষ্ট, মড়মড় ঢলঢল করে যার কোচবাক্স, জোয়ালটা খসে পড়বার মুখে, তাকে যতক্ষণ দড়ি দিয়ে বেঁধে সেঁধে আস্তাবলে রাখা হয়, ততক্ষণ তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে ঐক্য কল্পনা করে সন্তোষ প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু যেই ঘোড়া জুতে তাকে রাস্তায় বের করা হয়, অমনি তার আত্মবিদ্রোহ মুখর হয়ে ওঠে।···ভারতবর্ষের মুক্তি-যাত্রাপথের রথখানাকে আজ কংগ্রেস টেনে রাস্তায় বার করেছে। পলিটিক্সের দড়িবাঁধা অবস্থায় চলতে যখন শুরু করলে, তখন বারে বারে দেখা গেল তার এক অংশের সঙ্গে আর-এক অংশের আত্মীয়তার মিল নেই।···যে জিনিসটা ঘরে-বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তা নয়, যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিতমত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক কোন-একটা প্রবৃত্তির বাহ্য বন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্য তাকে

নাড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশ-দেবতার রথযাত্রা বলে ? এই প্রবৃত্তির বন্ধন এবং টান কি টেকসই জিনিস ?"—কালান্তর

তা যে টেকসই নয় সেকথা ইংরেজ-বিতাড়নের যোগসূত্র ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই টের পাচ্ছি।

২

সুতরাং আজকের দিনে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ হতে ইংরেজ চলে যাবার পর, যাঁরা সর্বভারতীয় ঐক্যের কথা বলেন তাঁদের পরিষ্কারভাবে মনে করিয়ে দেবার দরকার হয়েছে, এখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে সত্যকারের মেলাতে হবে। প্রত্যেকটি অংশ নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়ে ক্ষোভ হতাশা থেকে মুক্ত হলে তবেই ভারতবর্ষের সংহতি সাধনে সহায় হতে পারবে, নচেৎ উল্‌টো ফল ফলবে।

যেমন বাংলা দেশের কথা ধরা যায়। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার ভূগোল বিশিষ্ট। এমন নদীনালার দেশের সঙ্গে রাজপুতানার মরুভূমির কোনও মিল নেই, এই চীন-মঙ্গোলিয়ার ছায়ায় সংবৃত দেশের সঙ্গে কাশ্মীর পাঞ্জাবের জনসমষ্টির রক্তেরও তফাৎ আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় তফাৎ মনের তফাৎ। প্রমথ চৌধুরী উক্ত 'বাঙালী পেট্রিয়টিজম' প্রবন্ধে বলেছেন, "মানুষের মন পর্বতপ্রমাণই হোক, আর বল্মীক-প্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে আর অনেকটা নিজের অন্তরে তরলভাবে ডুবে আছে; যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারিনে।" বাঙালীর মনের পুরো পরিচয় কি ? এক কথায় জ্যামিতির সূত্রাকারে তা উপস্থিত করা চলে না, কিন্তু নিঃসন্দেহেই একথা বলা চলে যে তা ভারতবর্ষের

অন্যত্র হতে বিশিষ্ট। প্রমথ চৌধুরীরই কথায়, "আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব নির্ভয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করিনে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোন জাত তদনুরূপ পারে নি।" অন্য প্রদেশে এতখানি হয় নি। সেইজন্য, বলা বাহুল্য, আমাদের মনের সঙ্গে অনেকের মনের মিলবে না। সেক্ষেত্রে মনোজগতে আমরা ইংরেজের বেশি নিকটবর্তী, সে তুলনায় অন্য অনেক ভারতবাসী আমাদের বেশি দূরে, একথা বললে বাস্তব সত্যকেই স্বীকার করা হয় এবং জাতীয়তাকে অপমান করা হয় না। কারণ এইসব বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে যে ঐক্য সে ঐক্য ঐক্যই নয়, তা অনৈক্যের মূল। কেননা, প্রমথ চৌধুরীরই কথায়, "কোন জাতির পক্ষে স্বধর্ম হারিয়ে স্বরাট্ হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা-না-একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে, এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোন জিনিসই নেই, অথবা নিজস্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায়, তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই ; শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বত্বসাব্যস্ত করবার জন্যই তো স্বাধীনতার আবশ্যক।" সুতরাং আমাদের মনে রাখতে হবে প্রদেশগুলি বিকশিত না হলে প্রকৃত সর্বভারতীয় ঐক্য দানা বাঁধবে

না। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, "প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক দলের পলিটিশিয়ানরা আঁতকে ওঠেন, তার কারণ তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোন মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোন প্রতিবাদ করা আবশ্যক ? যদি কোন জননী নিজেকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়েদের নিজের স্তনের দুধ জোগাতে ব্রতী হন, তা হলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান করে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে।" বিধাতার কাছে বাংলাদেশ কি অপরাধ করেছে জানিনে, কিন্তু হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণ বর্জন করে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা সম্প্রতি নানাদিক্ থেকে এমন মার খেয়েছে যার জন্য সে বিপর্যস্ত। তার মধ্যে প্রথম কথা হল বঙ্গভঙ্গ, তার ফলে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ভাষা সকলই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। যেটুকু রইল, সেটুকুর কথা বিবেচনা করলেও দেখা যায়, সেই বাংলাটুকুর মধ্যেই সকল বঙ্গভাষী একত্রিত নেই, বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় বহুসংখ্যক বঙ্গভাষী ছড়িয়ে আছে—অন্যান্য প্রদেশের কথা ছেড়েই দিলাম। এমনতর অবস্থা সম্ভবতঃ অন্য কোনও ভাষাভাষীর ঘটে নি। স্বভাবতঃই এ চারটি প্রদেশ একতালে চলে না, সর্বত্রই বঙ্গভাষা প্রধান হবে এমন কথাও বলা যায় না—কিন্তু একথাও ঠিক যে এইরকম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির পথে যে নিদারুণ বাধা পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা তো আছেই। কিন্তু আর্থিক দিকের উপরেও আর একটা দিক্ আছে, সেটা আত্মিক দিক্। ইতিহাস একথা বারবার বলে থাকে, আর্থিক দুরবস্থা কোনও

জাতি কাটিয়ে উঠতে পারে যদি তার আত্মিক বল অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু দেখা গেছে, আত্মিক তেজ বিনষ্ট হলে সে জাতি আর উঠতে পারে নি তার সৈন্যসামন্ত যতই থাক্ না কেন। আজ বাংলার সামনে সেইটেই সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। দেখছি, বিধাতার দরবারে—এমন কি, ভারত-বিধাতার দরবারেও—তার মুষ্টিভিক্ষা মিলছে কৃপণ হাতে, সবসময় তার প্রতি সুদৃষ্টি পড়ছে তাও বলা যায় না। কিন্তু স্বকীয় তেজে এই দুঃসময়কে অতিক্রমণ করবার শক্তি বাঙালীকে অর্জন করতেই হবে, তা না হলে তার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল হবে না।

বাংলায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের ধারা : আদিযুগের কথা

সমাজের সঙ্গে শিক্ষার ধারার সম্পর্ক কখনও নিবিড় কখনও শিথিল। এর বহু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, যে সময় সমাজের মোটামুটি কাঠামোটা জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত এবং যে সময় অন্নবস্ত্রের সংকট খুব দুরূহ হয়ে ওঠে না সে সময় শিক্ষা কেমন হবে তা নিয়ে বেশি লোক মাথা ঘামায় না। এই আবহাওয়ায় যাকে আমরা বলে থাকি পিওর আর্টস্ বা ফিলোসফি—অর্থাৎ যেসব বিদ্যা আমাদের চিৎপ্রকর্ষের উন্নতি করে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে জীবিকার কাজে লাগে না—সেইসব বিদ্যার চর্চা হতে থাকে বেশি। কিন্তু যে যুগে সমাজ সংকটের মুখে বিপর্যস্ত হতে থাকে তখন সমাজের মূল পর্যন্ত নাড়া খায়,—লোকে চিন্তা করতে বাধ্য হয় সেই সংকট হতে পরিত্রাণের উপায় কি। আগের যুগে যখন শিক্ষার প্রসার এত ব্যাপক ছিল না তখন সমাজসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসংস্কারের কথা সব সময় তীক্ষ্ণভাবে হয়তো উঠত না। কিন্তু আজ সে অবস্থা পাল্‌টেছে। সমাজের সংস্কারের প্রধানতম অস্ত্রগুলির মধ্যে শিক্ষার সংস্কার অন্যতম। সেইজন্য এযুগে যখনই সমাজসংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখনই শিক্ষার সংস্কারের কথা ওঠে। বস্তুতঃ সমাজের সংস্কার ও শিক্ষার সংস্কারের তাগিদ এখন একই প্রয়োজন হতে উদ্ভূত। বরং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের দাবী আজকাল এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, যেসমস্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা প্রত্যক্ষভাবে সমাজের কাজে লাগে না সেইসব বিদ্যার প্রতি সাধারণের তেমন আর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা জ্ঞানলাভের সোপান না হয়ে দাঁড়াবে যেন কেবল জীবিকা অর্জনের উপায়। যুগে যুগে সমাজসংস্কারের ধারার বদল ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসংস্কারের ধারারও বদল হতে থাকে।

বস্তুতঃ একথা সকল দেশের পক্ষেই মোটামুটি সত্য,—আমাদের দেশের পক্ষে তো বটেই। বিশেষতঃ আমাদের দেশের সমাজবিবর্তন ঘটেছে শুধু আভ্যন্তরীণ বিকাশের মধ্য দিয়েই নয়, নানা বাইরের অবস্থার চাপেও। আমাদের এই গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কৃষি-সচ্ছলতার দেশে যখন পশ্চিমী সভ্যতার খরনখরাঘাত এসে পড়ল, তখন আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সবই বিপুল বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে একেবারে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও যে একেবারে চরম ওলটপালট হবে সে-কথা বিচিত্র নয়। এই বিরাট ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে দেখা যায়, যখন মিথিলার বিদ্যার ধারা বাংলার মাটিতে নতুন রূপ নিল তখন দেশে বিদ্যার বহুল প্রচলন ছিল, কিন্তু সে বিদ্যা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার। একটা বর্ণনা দিই। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে সে সময়কার নবদ্বীপের বর্ণনা দিয়েছেন :

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্নিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বইসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব করে।
বালকেও ভট্টাচার্য-সনে কক্ষা করে॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুদয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥

—আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়

সুতরাং নবদ্বীপের এই চিত্র থেকেই বোঝা যায় তখন দেশে অধ্যাপক আর টোলের অভাব ছিল না। সম্প্রতি রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থে

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বাংলাদেশে ন্যায়চর্চার যে ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা হতে প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী হতে শুরু করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত শুধু ন্যায়চর্চার কেন্দ্রই কত বহু বিস্তৃত ছিল।

ইংরেজ আমলের গোড়া পর্যন্ত যে এই ধারাই মোটামুটি চলে আসছিল তার প্রমাণ ইংরেজ আমলের গোড়ার যুগের দলিল-দস্তাবেজেও আছে। এর সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় অ্যাডামের বিখ্যাত রিপোর্টগুলিতে। অ্যাডাম ১৮১৭ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরী হয়ে কলকাতায় আসেন এবং ক্রমে সংবাদপত্র-জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। সে যুগের সংবাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন অ্যাডাম, পরে ঐ কাগজ প্রিন্স দ্বারকানাথের বেঙ্গল হরকরার সঙ্গে যুক্ত হলে অ্যাডামই আবার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তখন ইংরেজী অথবা দিশি ভাষায় এদেশে শিক্ষাদান হবে তাই নিয়ে তর্ক আরম্ভ হয়েছে। এই তর্কের মধ্যে, সম্ভবতঃ ১৮২৯ সালে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ককে একটি স্মারকলিপি দেন। ১৮৩৫ সালে অ্যাডামকে বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করবার জন্য কমিশনার নিয়োগ করা হয়। সেই অনুসারে তিনি পর পর তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টগুলি ১৮৩৫ সাল হতে ১৮৩৮ সালের মধ্যে পেশ হয়।

এই রিপোর্টগুলিতে সেকালের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর আছে। তার ব্যাপক আলোচনা এই স্বল্পপরিসরে অসম্ভব —দুই-একটা কথার উল্লেখ করছি মাত্র। তাতে তিনি বলেছিলেন, বাংলা ও বিহারে গ্রাম আছে ১,৫৫,৭৪৮—সেগুলিতে মোট ইস্কুল (বা পাঠশালা) আছে এক লক্ষ। এই পাঠশালার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অ্যাডাম বলেছিলেন,—

"those schools in which instruction in the elements of knowledge is communicated and which have been originated and are supported by the natives themselves."

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই ইস্কুলগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারা ও ভাবধারার কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং এর ব্যয়ভারও রাষ্ট্র বহন করত না। সেই প্রসঙ্গে পাঠশালাগুলির ব্যাপক প্রসার এবং জনসাধারণের মনে শিক্ষার প্রতি আগ্রহের কথা উল্লেখ করে অ্যাডাম বলেছিলেন,—

It will appear that the system of village schools is extensively prevalent : that the desire to give education to their male children must be deeply seated in the minds of the parents even of the humblest classes : and that these are the institutions, closely interwoven as they are with the habits of the people and the customs of the country, through which primarily, although not exclusively, we may hope to improve the morals and intellect of the native population.

অ্যাডাম এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে দরিদ্রতম লোকের মনেও ছেলেদের শিক্ষা দেবার আগ্রহ খুব গভীর। দ্বিতীয়তঃ যেসব পাঠশালা ছিল সেগুলিই এদেশের গণ-জীবনের ও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই সব পাঠশালাগুলির অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত টোল বা ফারসী পাঠশালা। তখন বেসরকারী চেষ্টায়, বিশেষ করে মিশনারীদের আগ্রহে, ইংরেজী পাঠশালা স্থাপিত হওয়া শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি তখনও ব্যাপক হয় নি। উদাহরণস্বরূপ জেলা দিনাজপুরের

উল্লেখ করি। সেখানে "উচ্চ হিন্দু বিদ্যালয়" ছিল ১৬টি, "সাধারণ হিন্দু পাঠশালা" ছিল ১১৯টি, ফারসী পাঠশালা ছিল ৯টি। হুগলী জেলায় কেবলমাত্র বার কি চৌদ্দটি 'কলেজ' ছিল, সেখানে ন্যায়শাস্ত্র পড়া হত। ত্রিবেণীতেও সাত-আটটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল, তার মধ্যে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের টোল প্রসিদ্ধতম ছিল। এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হতেই তখনকার আবহাওয়াটা বোঝা যাবে।

আমাদের সমাজ যখন এইভাবে চলছিল তখন তার উপর পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউ এসে পড়ল। তার ফলে আমাদের সব উলটপালট হতে আরম্ভ হল। আমাদের জীবনের মূল্যবোধ গেল বদলে, আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে ঘটল নিদারুণ বদল। এর ব্যাপক ইতিহাস আলোচনা করার স্থান অন্যত্র। সংক্ষেপে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে এসে আমাদের কৃষিপ্রধান সমাজ গেল বিপর্যস্ত হয়ে, কুটিরশিল্প ধ্বংস করা হল, এমন কি ভূমি-রাজস্বের ব্যাপারেও ঢুকল ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়বুদ্ধি। কালে কালে আমরা সম্পূর্ণ কৃষিজীবী হয়ে পড়লাম—সেখানেও অত্যধিক শোষণের ফলে একদিকে ঘটতে লাগল দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে ঘটতে লাগল কৃষকের চরম অর্থনৈতিক দুর্গতি। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সে শোষণের ইতিহাস অনেকেই লিখে গিয়েছেন, বিশেষতঃ তার অতি গভীর বিবরণ রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, ইংরেজের সামরিক শক্তি যেমন তার বলদর্পিত অস্ত্রঝন্‌ঝনার সঙ্গে আমাদের উপর আঘাত করেছিল ইংরেজী সভ্যতা ও চিন্তাধারাও আমাদের মনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম আঘাত করে নি। আমরা এতকাল যে সব জিনিসকে চরমার্থ ও পরমার্থ ভেবে আঁকড়ে ধরে বসেছিলাম তা এক মুহূর্তে গেল ভেসে। জীর্ণ আচারের ঠুনকো বেড়া প্রবল সংঘাতে এক মুহূর্তেই ভেঙে পড়ল। তখনই মনে জাগল প্রশ্ন। সকলেই জানেন, সেকালের নব্যসম্প্রদায়

কি আকুল আগ্রহে এই নব সভ্যতার রস পান করবার চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে প্রথম যুগে আমরা অনেক সময় বাড়াবাড়ি দেখি, যে বাড়াবাড়ি হতে আত্মস্থ হতে বাঙালীর বহুদিন সময় লেগেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-বিদ্যাসাগরের আগে এই আত্মস্থতার লক্ষণ দেখা যায় নি।

সুতরাং ইংরেজী সভ্যতার এই ঢেউ আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার অনুশীলন। প্রথমে পাদরীদের চেষ্টায় এদেশে ঐ ধরনের ইস্কুল স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত পাদরী মে'র চুঁচুড়াস্থ পাঠশালা এই দিকের অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা। তারপর স্টুয়ার্টের বর্ধমানের পাঠশালার খবর পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে শ্রীরামপুরের পাঠশালা। ১৮১৩ সালের শেষে পাদরী মার্শম্যান একটা শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করেন। তাঁর রচনা হতেই জানা যায়, সে সময়ই শ্রীরামপুরের পাদরীদের পরিচালনায় আশেপাশে অন্ততঃ কুড়িটি ইস্কুল চলছিল। কিছুকালের মধ্যেই ইস্কুলের সংখ্যা বাড়ল এবং ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৩১ সালে এই কলেজের তত্ত্বাবধানে একুশটি বালক বিদ্যালয় ছিল, ছাত্রসংখ্যা ছিল এগার শ' পঁচানব্বই। এসব ইস্কুলে ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী শিক্ষা দেওয়া হত। কিছুকাল পরে এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপক রূপ দেবার জন্য কলিকাতা ইস্কুল সোসাইটি তৎপর হলেন। এই সময়েই হিন্দু কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ এই সময় হতে এই দিকের স্রোত ক্রমেই প্রবলতর হতে লাগল। বহু প্রতিষ্ঠান জন্ম-গ্রহণ করতে লাগল। তার মধ্যে হিন্দু কলেজ অবশ্য প্রধানতম। এতে বহু গণ্যমান্য বাঙালীর আগ্রহ খুব বেশী ছিল। কিন্তু এই আগ্রহ শুধু কলেজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দিকে দিকে তার প্রসার ঘটতে লাগল। বালকশিক্ষার ক্ষেত্রে দেখি পাদরীদের চেষ্টা ছাড়াও

বহু গণ্যমান্য বাঙালীর চেষ্টায় ইংরেজী ধরনের ইস্কুল ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে কলিকাতায় হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু লিবার‍্যাল অ্যাকাডেমি, ওরিয়েন্টাল ফ্রি স্কুল, পটলডাঙ্গা স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) এবং গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল (এখন ওরিয়েন্টাল সেমিনারী) প্রভৃতি ইস্কুলের নাম উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বলেও এর ঢেউ গিয়ে পৌঁছেছিল। দিকে দিকে জমিদারেরা এ ধরনেরই স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তা ছাড়া শুরু হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষার চেষ্টা। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৯ সালে। তাঁদের পরিচালনায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় গৌরীবেড়েতে, ১৮১৯ সালে। ১৮২৩ সালে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটটি। ১৮২৪ সালে পাদরীদের সহায়তায় লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরাও কিছু ইস্কুল চালাতে শুরু করেন। ইংরেজ মহিলাদের চেষ্টায় ১৮২৫ সালে লেডিজ অ্যাসোসিয়েশান নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের চেষ্টাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখের বিষয় এই যে, এগুলি প্রধানতঃ পাদরী বা সাহেবদের চেষ্টায় স্থাপিত হলেও স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষতঃ হিন্দুরা এগুলিকে কম সাহায্য করেন নি। বিশেষতঃ তখন ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গের ঢেউ এসেছে—কাজেই রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতারা এ বিষয়ে কম উৎসাহী ছিলেন না। এমন কি, এক সময় রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবও এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই চেষ্টা আরও ব্যাপক রূপ ধারণ করল বেথুনের আগ্রহে। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুন 'বিক্টোরিয়া বাঙ্গলা বিদ্যালয়' স্থাপনা করেন এবং সে প্রচেষ্টা ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকরে অভিনন্দিত হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও এতে সাহায্য করেছিলেন। পরের যুগে এসব দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কর্মচেষ্টার আদি সূত্র এই যুগে।

এই দ্বিধারার লড়াই চলতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজীই জয়লাভ করল। Anglicist-Orientalist বিবাদের ইতিহাস সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। প্রথমে সরকার এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাতে বিশেষ রাজী ছিলেন না। কিন্তু একদিকে পাদরীদের চাপ অন্যদিকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজন ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। তার উপর যখন এদেশের লোকদের মধ্যেও ইংরেজী সভ্যতার রস পান করবার আগ্রহ দেখা যেতে লাগল তখন তাঁদের মতির পরিবর্তন ঘটল। নানা তর্ক-বিতর্কের পর শেষে শিক্ষা সভার সভাপতি ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত স্মারকলিপি পেশ করলেন। তাতে তিনি ইংরেজীর সপক্ষে রায় দিলেন। সপারিষদ বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ঐ বছরই ৭ই মার্চ তারিখে সেটি গ্রহণ করে তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করলেন। আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এইটিকেই সবচেয়ে যুগান্তকারী ঘোষণা বলা যায়। এই ঘোষণার মূল কথাটা হল ইংরেজ সরকারের অতঃপর উদ্দেশ্য হবে ইউরোপীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার করা এবং সরকারী টাকা এই শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে। অবশ্য দেশী বিদ্যালয়ে যে যা বৃত্তি পাচ্ছিলেন তা দেওয়া হতে থাকবে, কিন্তু টোলে ছাত্রদের খরচ দেবার যে ব্যবস্থা আছে তা চলবে না। অতঃপর প্রাচ্য পুরাতন গ্রন্থাবলী ছাপবার জন্য সরকার কোনও টাকা খরচ করবেন না। এদেশীয়দের ইংরেজীর মাধ্যমে ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যই অর্থ ব্যয় করা হবে। এর সঙ্গে মেকলে সূচিত করলেন তাঁর বিখ্যাত Filtration Theory. এই শিক্ষার বিস্তার কেমন করে হবে? মেকলে বললেন, প্রথমে কতকগুলি বড় বড় শহরে এবং জেলার সদরে বিদ্যালয় স্থাপনা করা যাক্, তারপর ক্রমশঃ তা ছোট ছোট শহরে এবং গ্রামে বিস্তৃত করা যাবে। এইভাবে উপর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে শিক্ষার ধারা পরিব্যাপ্ত হবে। এরই নাম Filtration Theory. অ্যাডাম এর বিরোধিতা

করেছিলেন। তাঁর মত ছিল, গোড়া ঠিক না করে মাথা ঠিক করা কোনও কাজের কথা নয়। তাঁর কথা ছিল দেশীয় পাঠশালার সূত্র ধরেই আগে কয়েকটি জেলায় শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। এইভাবে তলার বুনিয়াদ সুগঠিত হলে ক্রমে ক্রমে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ গ্রাহ্য করে নি। মেকলের কথাই চলল, ফিলটারের মত উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়বার ব্যবস্থাই কার্যকরী হল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ধুম লাগল। ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজ, ১৮৩৬ সালে মহসীনের চেষ্টায় হুগলী কলেজ, ১৮৩৫ সালে মেডিক্যাল কলেজ—তাছাড়া অগুনতি বিদ্যালয় খুব দ্রুতবেগে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এই ধারা বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

২

এই হল আমাদের শিক্ষার গোড়ার যুগের মোটামুটি ইতিহাস। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট পরিবর্তনের কথা আলোচনা করলে কয়েকটি তাৎপর্য খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা আজকাল সব জিনিসেই—এমন কি সাহিত্যেও—সামাজিক ব্যাখ্যা করতে উৎসুক হয়েছি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। এ দেশের সমাজ যেমন বদলিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের ছাপ যেমন পড়েছে, তার যেমন প্রয়োজন ঘটেছে, শিক্ষারও তেমন তেমনই বদল ঘটেছে। এই যোগাযোগ সাধারণতঃ স্পষ্ট নয়, কিন্তু তবু সে যোগাযোগ খুব প্রগাঢ় এবং নিবিড়। ব্যাপারটা একটু বুঝলেই ধরা পড়ে।

ইংরেজ আসবার আগে আমাদের অবস্থা কি ছিল? বাংলার

ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলার বৈশিষ্ট্যই হল তার নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা। কট্টর ব্রাহ্মণ্যধর্ম সে নেয় নি। সে চিরকালই প্রোটেস্টান্টের দেশ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব এবং প্রথম প্রসার পূর্বভারতে—ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের পূর্বপ্রান্তে। শংকর যখন বৌদ্ধমত নিরসন করে সারা ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন তখনও বাংলাদেশে বৌদ্ধবিহার বহু জায়গায় ছড়িয়ে ছিল এবং আরও অনেক দিন চলেছিল। তারপর যখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করলেন তখন তিনি আবার ফিরে গেলেন লোকসংস্কৃতিতে। ধর্মের ভেদাচার ও কাঠিন্য ভেঙে দিয়ে টেনে নিলেন জনগণকে। সেইজন্য নবদ্বীপের অত পাণ্ডিত্যেও তাঁর মন ওঠে নি, কারণ তাতে প্রেম ছিল না। বৃন্দাবনদাস বলছেন,

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥

সেইজন্য এদের সবাইকে বলা হয়েছে পাষণ্ডী। বস্তুতঃ বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যখনই সমাজে বা ধর্মে কোনও সংকট এসেছে, তখনই বাংলা ও বাঙালী আত্মরক্ষা করেছে জনসাধারণ থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে। শুধু আত্মরক্ষাই করে নি, নতুন শক্তিতে উজ্জীবিতও হয়েছে। এই হল বাংলার ও বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে মৌলিক সত্য। এরই ইতিহাস জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে শুরু করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামধর্ম প্রচার অবধি ছড়িয়ে আছে, এরই ইতিহাস লিখিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে, এরই ছাপ আছে আউল বাউল সহজিয়ার গানে, এরই চিহ্ন ফুটেছে ছড়ায় লোকসঙ্গীতে লোকশিক্ষায়। এমন কি আমার এক এক সময়ে মনে হয় কট্টর ব্রাহ্মণ রঘুনন্দন পর্যন্ত এই শক্তিশালী

প্রাণধারাকে ভয় না করে পারেন নি। তিনি বাংলা দেশের সমস্ত জাতিকে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র—এই দুই বর্ণে ভাগ করে ছেড়ে দিলেন, অন্য জায়গার মত চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন তিনি করেন নি। এ হতে মনে হয় তিনি একজন ভয়ানক ব্রাহ্মণ অ্যারিস্টোক্র্যাট ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাইকে শূদ্রের দলে ফেলে দিয়েছেন। একথাটা সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু এর বোধ হয় আরও একটা দিক আছে। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ যখন এদেশে পদার্পণ করেন তখনই যে কেবল তাঁরা ঔপনিবেশিক ছিলেন তাই নয়, বহুকাল পরেও তাঁদের বংশধরেরা সেই ধারা পরিত্যাগ করতে পারেন নি। অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি ও লোকধর্মের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের অঙ্গাঙ্গীভাবে মেলাতে পারেন নি। কেবল আচার-ব্যবহার ও ধর্মের বেড়াজালের আড়ালে আত্মগোপন করে ছিলেন মাত্র। এর ইঙ্গিত ইতিহাসে আছে। সুতরাং রঘুনন্দন সেই অবস্থাকেই স্বীকার করে নিলেন মাত্র। বেড়াজাল দিয়ে ঔপনিবেশিকদের আলাদা করে দিলেন, কিন্তু তার বাইরে যে বিপুল জনসাধারণ নিজস্ব সংস্কৃতি ও লোকাচারে চলে আসছিল তাদের মধ্যে আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রভেদ ঢোকাতে সাহস করলেন না—বাংলার সংস্কৃতি ও লোকাচার তাদের মধ্যে এতই দৃঢ় ছিল।* কিন্তু সে যাই হোক, একথা সত্য যে, যখনই কোনও সংকট এসেছে তখনই বাংলা নতুন প্রাণশক্তি আহরণ করেছে লোক-সাধারণকে আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে কাছে টেনে নিয়ে। এইখানেই তার বিশেষত্ব, এইখানেই তার শক্তি—ইতিহাসের বহু নজির দাখিল করে তা সবিশেষ প্রমাণ করা চলতে পারে। যখনই এ ধর্ম থেকে তার

* বরং ব্রাহ্মণেরাই রঘুনন্দনের বিধান সত্ত্বেও ক্রমে কিছুটা ঢিলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্রাম্যদেবতার পূজা, ষষ্ঠী শীতলা মনসার অর্চনা শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে সে পূজা করতে আপত্তি নেই। ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর লোকধর্মের প্রভাব।

বিচ্যুতি ঘটেছে তখনই তার পতন হয়েছে। যেমন ইংরেজ আমলে ঘটেছে। সেকথা ক্রমশঃ আলোচ্য।

প্রাক্-ইংরেজ শিক্ষাধারার বিশ্লেষণ করলে সেইজন্য তিনটি জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। (১) সে যুগে উচ্চশিক্ষা বলতে শাস্ত্রজ্ঞান বোঝাত। হিন্দুরা কাব্য সাহিত্য অলংকার ছাড়াও ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি দর্শন বেদ জ্যোতিষ নিয়ে চর্চা করতেন, মুসলমানেরা তাঁদের শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতেন। সেইজন্য শিক্ষা একদিকে সংস্কৃত, অন্য দিকে আরবী বা ফারসী অবলম্বন করে চলত। (২) তা ছাড়া যাঁরা রাজকার্যে জড়িত ছিলেন তাঁরা আরবীতে বা ফারসীতে এবং উর্দুতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতেন (৩) কিন্তু এই দুই শিক্ষাই ছিল সমাজের উপরস্তরচারীদের জন্য। লোকশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা তখন টোলে মাদ্রাসায় হত না বটে, কিন্তু তার আয়োজন কম ছিল না। বস্তুতঃ লোকশিক্ষার এই আয়োজন যতদিন ব্যাপক ছিল ততদিনই বাংলা সজীব এবং প্রাণবন্ত ছিল, ততদিন বাংলার লোকসমাজ থেকে শক্তি আহরণ করে বাংলা বেঁচেছে। এই লোকশিক্ষা হরিনামসংকীর্তন হতে শুরু করে রামায়ণ-পাঠ, রামায়ণ গান, আউল-বাউলের দেহতত্ত্ব, কবি পাঁচালী ছড়া ব্রত পালপার্বণের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে ছিল। তাদের অক্ষরপরিচয় না থাকলেও তাদের শিক্ষার বা সংস্কৃতির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সাক্ষরতাই যে শিক্ষা নয় তা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই।

বস্তুতঃ তখন যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ ছিল তাতে এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার ছিল না। কারণ সচ্ছল কৃষির যুগে গ্রামীণ জীবনে জীবিকার হাতিয়ারস্বরূপেই শিক্ষাকে দেখবার দরকার হয় নি। তাই সমাজের একস্তরে 'বিশুদ্ধ' জ্ঞানচর্চা স্বচ্ছন্দে করা চলত। যে কয়জন স্বল্প কর্মচারী রাজকার্যে বা ব্যবসায়ে দরকার হত কিছু আরবী ফারসী শিখলেই তাঁদের কাজ চলে যেত। আর

বাকী বিপুল জনসাধারণ কৃষিপ্রাচুর্যের অবসরে লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে চিৎপ্রকর্ষের সন্ধান পেত। সে সমাজের তাগিদে মোটামুটি উচিতমত শিক্ষাই চলছিল।

কিন্তু ইংরেজ আসার আগেই আমাদের সমাজে সংকট ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এর প্রধানতম কারণ, বাংলার মৌলিক-ধর্মবিচ্যুতি। অর্থাৎ সমাজের শ্রেণীবিন্যাস কঠোরতর হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সংকটাপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার সকল বেড়া ভেঙে জনসাধারণ থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারি নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি বড় বই লিখতে হয়, কাজেই সে চেষ্টা এখানে অসম্ভব। কিন্তু এক দিকে যেমন মোগল আমলের ক্ষীণদশায় দেশবিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে য়ুরোপের আক্রমণ শুরু হল, অন্য দিকে তেমনই কৃষির উপর শুরু হল নতুন কর ধার্য করা। সুজাখানী বন্দোবস্তের পর এল জাফরখানী বন্দোবস্ত, ভূমিরাজস্ব লাগল বাড়তে, আবওয়াবের পর আবওয়াব বসানো হতে লাগল, ভূম্যধিকারীর শ্রেণীচেহারা ততই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, কৃষির ও কৃষকের ঘটতে লাগল অবনতি, ব্যবসা-বাণিজ্য গেল উড়ে, শিল্পীরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়ল। এই সামাজিক পরিবেশেরই প্রতিফলন ঘটল ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ধর্মের নামে চলতে লাগল জীর্ণ কুসংস্কার, সমাজে চলতে লাগল ভ্রষ্ট আচার, তফাৎ বাড়তে লাগল শ্রেণীতে শ্রেণীতে, রুদ্ধ হয়ে গেল লোকসংস্কৃতির স্রোত, মঙ্গলকাব্য শেষে আশ্রয় নিল রাজদরবারের ছত্রচ্ছায়ায় ভারতচন্দ্রের ঝাঁঝালো নাগরিকতায়, লোকসংগীত শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো গিয়ে হাফ্-আখড়ায়ের শহুরে অশ্লীলতায়।

এই জিনিস কিছুকাল ধরেই ঘটছিল। কাজেই একথা অপ্রিয় হলেও অসত্য নয়, যে যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ঢেউ আমাদের উপকূলে প্রবলবেগে আছড়ে পড়ল তখন তার প্রতিরোধ করবার

সাধ্য আমাদের ছিল না। আমরা আসলে ভিতরে ভিতরে অন্তঃসার-শূন্য হয়ে গিয়েছিলাম। তার উপর যখন সে নিয়ে এল চিত্তের উদার স্বারাজ্য এবং মোহমুক্ত জ্ঞানের নির্বাধ অনুশীলন তখন প্রত্যক্ষ এরোপ্লেনের সামনে গল্পের পুষ্পকরথ সহজেই টিকল না। এ অবস্থায় ইংরেজী সভ্যতার রস পান করবার জন্য আমাদের অধীর হওয়া বিচিত্র নয়।

কিন্তু এ হতে যদি কেউ মনে করেন ইংলণ্ডের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যই বা শেকসপীয়র-শেলী পড়বার জন্যই মেকলে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তা হলে নিদারুণ ভুল করা হবে। আসলে তখনকার সমাজের প্রতিফলন ঘটেছিল তখনকার শিক্ষানীতিতে। এ বিষয়ে Mayhew সাহেবের বই থেকে কিছু উদ্ধৃত করি—

> The aims that ultimately inspired this concentration on English literature and science were—
>
> (a) The training of Hindus and Mahomedans to assist in the administration of the country.
>
> (b) The increase of its material resources and prosperity, and
>
> (c) The enlightened co-operation of the Indian peoples in the suppression of moral and social evils attributed to superstituous ignorance.
>
> —Mayhew : *Education of India* p. 20

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এর প্রথমটি তো প্রত্যক্ষই শ্রেণীমূলক। এ দেশে ইংরেজ-শাসন চালাবার জন্য কর্মচারী চাই, ডেপুটি চাই, কেরানী চাই। অতএব ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। এর পিছনে

শিক্ষাবিস্তারের তাগিদ ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের তাগিদ। দ্বিতীয়টিও প্রকারান্তরে তাই। ভারতবর্ষকে ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা করে তোলবার কোনও দায়ই শাসকসম্প্রদায়ের ছিল না। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মেহিউ লিখছেন:

> Recognition of their value and practicability was a deep and vital conviction with such men is Duff, Macaulay and Trevelyan. They were going to ensure for India "the vast moral and material blessings" arising out of general diffusion of useful knowledge "which India may under Providence derive from her connexion with England".

অর্থাৎ ইংলণ্ডের তাঁবেদারিতে থেকে যেটুকু উন্নতি হয় তার জন্যই এই চেষ্টা—ইংলণ্ডের তাঁবেদারির বাইরে নয়। তাঁদের আরও বিশ্বাস ছিল—

> The natives "stimulated by the prospect of honourable and lucrative employment could not fail to be struck by our moral and intellectual superiority."—Mayhew : p. 20

চাকরদের পক্ষে মনিবের জয়গান গাওয়া তো এমনিতেই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তখন য়ুরোপীয় সভ্যতা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন উপকরণ নিয়ে প্রবল শক্তিমত্তার সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিল একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই ছিল শাসকশ্রেণীর মোটামুটি মনোভাব। আমাদের দেশের যেসব লোক কিন্তু সে সময় ইংরেজীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গোড়ার দিকে চাকরির লোভের চেয়ে জ্ঞানতৃষ্ণাই প্রবল ছিল। মেহিউ বলেছেন—

> But this was hardly western civilisation as appreciated by Ram Mohun Roy, Dwarkanath

> Tagore and the small band of reforming Hindus that joined Macaulay to fight the Orientalists. To them it was essentially a means of combating existing moral and social evils. If in subsequent generations this ethical aim became dulled and materialised, if the prospect of Government employment gradually prevailed as an educational stimulas, it cannot be said that the Indian outlook on life or conception of values ever became unmistakably and aggressively Victorian.

সুতরাং পরে যাই হোক্, আদি যুগে এ দেশের ইংরেজী-উৎসাহীরা চেয়েছিলেন চিত্তের স্বারাজ্য, চেয়েছিলেন মনের মুক্তি। তাঁরা চেয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই নির্বাধ চর্চা, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান পঞ্জিকা-মনসা-ওলাবিবিকে মানে না, সতীদাহকে ধিক্কার দিতে পারে, জগন্নাথের রথের তলায় সন্তান বিসর্জন দেওয়াকে ধর্ম বলে মানতে রাজী নয়। এই ছিল আদিম আকাঙ্ক্ষা। যদিচ, মেহিউ ঠিকই বলেছেন, কালক্রমে ডেপুটিত্ব ও কেরানীত্বের লোভে এদিকটা অনেকখানি ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তখন লেখাপড়ার চর্চা বাড়ল জ্ঞানের জন্য নয়, গাড়িঘোড়া চড়বার লোভে।

এই যুগের পরিবর্তনগুলির একটা সামগ্রিক রূপ ধরলে কয়েকটা খুব বড় ইঙ্গিত ধরতে পারা যায়। সেগুলি মোটামুটি এই :—

(১) পূর্বেকার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কৃষিপ্রধান জীবন ভেঙে গেল। তার বদলে দেখা দিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ছাপ।

(২) তারই প্রভাব পড়ল শিক্ষার ক্ষেত্রেও। প্রথম, 'বিশুদ্ধ' সংস্কৃত জ্ঞানের চর্চা ভেঙে গেল। তার বদলে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিল চিত্তের স্বারাজ্য ও মনের মুক্তিলাভের দারুণ আগ্রহ। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন।

(৩) কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোকের সংখ্যা ছেড়ে দিলে শিক্ষার বাকী উদ্দেশ্য হল এদেশের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন মিটানো। ইংরেজের রাজত্ব চালাবার জন্য যেসব ডেপুটি কেরানী অপরিহার্য, তাই তৈরী করা।

(৪) সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হল লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে। এতদিন শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরও একটা স্থান ছিল। যদিচ তাদের সবাই টোল-পাঠশালায় যেত না তবুও তাদের অন্য নানাবিধ উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আর তাদের মধ্যে পাঠশালায় ছেলে পাঠাবার আগ্রহ খুব তীব্র ছিল একথা অ্যাডামও স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হল। তারা আর মানুষ বলে গণ্য হল না। শিক্ষার সমস্ত লক্ষ্য হল নবোদ্ভূত চাকরে শ্রেণী। তার বাইরে যে বিপুল জনসাধারণ বাংলার মেরুদণ্ড সেই জনসাধারণের কোন ব্যবস্থাই হল না—তাদের ছেড়ে দেওয়া হল Filtration Theoryর মর্জির উপরে। উপরতলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তাদের ভাগ্যে যা জোটে।

সত্য কথা বলতে এমনতর দুর্ভাগ্য বাংলা দেশের কখনও হয়নি। বাংলা দেশে আগেও শ্রেণীবৈষম্য ছিল, শ্রেণীপার্থক্যও ছিল, কিন্তু তা এতখানি ছিল না। গ্রামীণ জীবনে পূজাপার্বণে সামাজিকতায় বিভিন্ন শ্রেণী অনেকখানি কাছাকাছি ছিল। এখন ঔপনিবেশিক সভ্যতায় নতুন বাবুর দল সরে গেলেন অনেকদূর, শহুরেআনা উঠতে লাগল প্রবল হয়ে, শ্রেণীবৈষম্য বাড়তে লাগল এবং শিক্ষার ব্যবস্থার সমস্ত লক্ষ্য হলেন এঁরাই—জনসাধারণকে একেবারে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল। তার ফলে শহরে জ্বলতে লাগল টিম টিম করে আলো, কলকাতায় স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু দেশময় আঁধার ছেয়ে গেল। চলল Filtration Theory, অ্যাডামের কথা নয়।

এই হল ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক তাৎপর্য। বস্তুতঃ সেকালের সামাজিক পরিবেশেরই প্রতিফলন তার মধ্যে। আজ সেইজন্য সামাজিক অবস্থা ভাল করে বিশ্লেষণ না করে কোনও শিক্ষাব্যবস্থা গড়লে তা সফল হবে না। শিক্ষাব্যবস্থাকে সফল করতে হলে এই ধারাটিকে বুঝে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়তে হবে।

শিক্ষা-সমস্যার কয়েকটি দিক

শিক্ষা হওয়ার কথা :

আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নানারকমের আলোচনা হতে শুনি। বিশেষতঃ স্বাধীনতা হবার পর থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কি রকম হওয়া উচিত, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কমিটি-কমিশনের অন্ত নেই। এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে। কারণ এ হতে প্রমাণ হয় যে, আর কিছু হোক বা নাই হোক আমরা অন্ততঃ এটুকু অনুভব করতে শুরু করেছি, আমাদের চলিত শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক নেই, তার বদল দরকার। এখনও আমরা রাস্তা খুঁজে পাই নি বটে, কিন্তু এই হাঁকপাকানি হতে বোঝা যায় যে, রাস্তা খোঁজবার দরকার আমরা বুঝতে শুরু করেছি। সে হিসেবে আনন্দিত হ'লেও আমার একথা মনে হয়েছে, আমাদের সমস্ত আলোচনার মধ্যে অধিকাংশ সময়ই একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ভাব আছে। প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন, "আমরা কলেজে যুগপৎ ইংরেজি-সুরা এবং সংস্কৃত-সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায় সে সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই করছে।" যতদিন আমরা স্বাধীন হই নি ততদিন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাদের পশ্চিমী সভ্যতা ও সাহিত্য বিজ্ঞান অনুশীলন করতেই হত এবং আমরা তা করতাম ফরাসী জর্মান বা অন্য কোনও য়ুরোপীয় ভাষার মাধ্যমে নয়, ইংরেজীরই মাধ্যমে। ফলে যেসব ছাত্রের পক্ষে পশ্চিমী সভ্যতা ও জ্ঞান হতে মনের সত্যকারের আলো জ্বালাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না সেসব ছাত্রকেও এককালে গাড়িঘোড়া চড়বার লোভে এবং ইদানীং জীবন-সংকটে ভাসবার জন্য ডিগ্রী নামক একটা ভেলা পাবার আশায় বাল্যবয়স থেকেই চতুর খেঁকশেয়ালীর সঙ্গে মুরগির দেখা হবার কাহিনী মুখস্থ করতে হয়েছে। কিন্তু জোরে-টানা ধনুক হঠাৎ ভেঙে

গেলে তার ছিলেটা ছিঁড়ে দুদিকে ছট্‌কে যায়। ইংরেজের টান চলে যেতে আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা—আমরা দুদিকে ছট্‌কে গিয়েছি। সেইজন্য একদিকে যেমন দেশময় ল্যাবরেটরি তৈরি হয়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ঝোঁক পড়েছে ভারতবর্ষের অতীতকে আবার নতুন করে দাঁড় করাবার। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় হবার কথা সেদিন মন্ত্রীমহাশয় এখানে ঘোষণা করেছেন—কাশীতে রাষ্ট্রপতি নাকি বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পা নিজে ধুইয়ে দিয়েছেন। ডাঃ কাটজু তো সংস্কৃতকেই ভারতের সর্বজনচলিত ভাষা করতে বলতেন। অর্থাৎ একদল বলছেন, ওদের দেশের জিনিসগুলো (কাজে লাগুক আর নাই লাগুক) পুরোপুরি আমদানি করা চাই। বোধ হয় মনে মনে এঁরা ভাবেন যে, তা না হলে আমরা জাত হিসেবে জাতে উঠব না। আর অন্যদল বলেছেন, ওরা কি এতই শ্রেষ্ঠ? যে সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকে আমরা এতকাল কাটিয়ে এলাম সেই তো আমাদের আসল সংস্কৃতি। সেটাকে সব চেয়ে বড় করে তুলে না ধরলে আর আমাদের নির্বাধ জাতীয় স্বাধীনতা হল কই? এর কোনটাই নিন্দার্হ নয় যদি আমরা তাকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ এই দ্বি-ধারা যেভাবে চলেছে তাতে তাকে সাংখ্য বা কোনও কিছুরই মতানুসারে দ্বৈতবাদ বলা যাবে না। এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ পুরুষ নেই, যা আছে তা হল কেবল অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। এককালে এই দ্বৈতের সমন্বয় যুগোপযোগী ভাবে বিদ্যাসাগরের মধ্যে হয়েছিল বলেই "হুতোম প্যাঁচার গানে" হেমচন্দ্র তাঁকে বলতে পেরেছিলেন,

ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্।
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্॥

কিন্তু আজকাল যা চলছে, তা হল দ্বৈরথ যুদ্ধ। যাঁরা অতীতের

দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন তাঁদের দৃষ্টি বেশির ভাগ সেখানেই আটকে থাকে, ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয় না। অন্যদিকে যাঁরা কেবল পশ্চিমী বন্দর থেকে পণ্য আমদানি করতে চান তাঁরা ও দোষ থেকে মুক্ত নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁরাও সবসময়ে এদেশের সমাজের বাস্তব অবস্থার দিকে সমুচিত মনোযোগ দেন না। শুধু যে ইংরেজী বা পশ্চিমী ধারা ও প্রাচ্য ধারার মধ্যেই এই সংঘাত চলছে তা নয়, শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই এ রকম দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রসারিত হতে চলেছে। হিন্দী ও অন্যান্য ভাষা—বিশেষতঃ বাংলা ভাষার—দ্বন্দ্ব; কলা ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব; ইস্কুল ও কলেজের দ্বন্দ্ব; প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার দ্বন্দ্ব; কেবল জ্ঞানের জন্য শিক্ষা এবং অর্থের জন্য শিক্ষা—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব। এই রকম হাজার প্রকারের দ্বন্দ্ব। কোন্‌টায় বেশি ঝোঁক পড়া উচিত? কোন্‌টার কি রকম চেহারা হওয়া উচিত?

আমি যদি য়ুনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের সভ্য হতাম, তা হলে এখানে প্লেটো থেকে নিউম্যান এবং উপনিষদ থেকে টি. এস. এলিয়ট মন্থন করে শিক্ষা যে আত্মবিকাশের উপকরণ এবং তা যে ইর্‌ফান এবং ইল্‌ম্ অথবা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্মিলন, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করাই যে তার কাজ—এসব কথা বলতে পারতাম এবং সেই মানদণ্ডে উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ধারণ করবার চেষ্টা করতাম। অথবা আমি যদি মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনের নাড়া-বাঁধা শিষ্য হতাম তা হলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারতাম যে, শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হল শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধনে সহায়তা করা। কারণ যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন আত্মবিকাশ মানে হচ্ছে বুর্জোয়াদেরই আত্ম-বিকাশ,—যারা অর্থাভাবে পড়াশুনা করতে পারে না তাদের নয়। বিপ্লবোত্তর কালে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত সাধনাই হবে বটে, কিন্তু সমাজের মূল লক্ষ্যকে অতিক্রম করে নয়। কিন্তু যতদিন বিপ্লব

না হচ্ছে ততদিন শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতিতে সর্ববিধ সাহায্য। কিন্তু যেহেতু আমি য়ুনিভার্সিটি কমিশনের সভ্যও নই, মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনের নাড়া-বাঁধা শিষ্যও নই, সেহেতু ও দুয়ের কোনটাই না বলে একটা খুব ছোট ও সহজ কথা বলতে চাই।

সে কথাটা হল, আমাদের শিক্ষার আগে আমাদের শিক্ষা হওয়া চাই। কেননা দেখছি, বহুকাল হাড়ে হাড়ে ভুগেও আমাদের এ বিষয়ে উচিত শিক্ষা হয় নি। পূর্বেই বলেছি, আগে এমন একটা কাল ছিল যে সময় অন্ততঃ কিছু বাঙালী নতুন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাচমকিত পাশ্চাত্য সভ্যতার রস আকণ্ঠ পান করবার আকুল আগ্রহে ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন। এ রকম মানুষ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক যুগেই গুটিকয়েক করে থাকেনই। এঁদের মধ্য হতেই সে রকম মানুষ বেরোয়, যাঁদের বাণী মহাকালের সীমানা অতিক্রম করে ভূগোলের ভেদরেখাকে অস্বীকার করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের মানুষের চিত্তাকাশ দীপ্ত করে থাকে। কিন্তু এ রকম মানুষ সংখ্যায় কম। বেশির ভাগ লোকই এই স্তর অবধি পৌঁছুতে পারে না। কাজেই শিক্ষার ফলাফল এইসব সাধারণ মানুষদের জীবনে আরও সীমিত। যেমন, বাঙালীরাও অনেকেই সে-যুগে লেখাপড়া শিখেছে রামমোহন-মাইকেলের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে নয়, নিশ্চিত-ডেপুটিত্বের প্রত্যাশায়। এমন কি, 'মাই লার্ড' 'ইয়োর অনার' বলতেও শিখেছে মুচিরাম গুড়ের মত। শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ আত্মবিকাশ নিশ্চয়ই। কোনও কোনও মহামানবের ক্ষেত্রে সে আত্মবিকাশের প্রায় কোনও শেষ সীমাই নেই। কিন্তু সাধারণের বেলায় সে বিকাশ অনেকখানি সীমাবদ্ধ। তার স্বল্প ক্ষমতাকে যথোচিত পরিপুষ্ট করে একদিকে সুষ্ঠু জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং অন্যদিকে সেই জীবিকার মাধ্যমেই আত্মবিকাশের পথ করে নেবার ক্ষমতা অর্জন করায় তা

আটকে থাকে। একটি ছেলের মধ্যে ইন্‌জিনিয়ার হবার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা গেল; শিক্ষার সহায়তায় সে পাশ করে শুধু যে চাকরিই পেল তা নয়, ইন্‌জিনিয়ারিং কাজটাও শিখল ভাল করে এবং সে জীবিকার মধ্যে কাজটাও ভাল করে করতে থাকল। সাধারণ আত্মবিকাশের দৌড় এর বেশি নয়।

এই কথাটা আমাদের ভাবতে হবে। যে সাধারণ মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশের চেষ্টা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে করতে হবে, সেই সাধারণ মানুষের জীবন চারপাশের কাল ও সমাজের কাঠামোতে বাঁধা। মহামনীষীরা পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু অতিক্রম করে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষ অনেক পরিমাণে তা পারে না। চারপাশের সমাজের মধ্যে তারা কি কি কাজ করতে পারে এবং কে সেই কাজ কত ভালভাবে করতে পারে, শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। অথচ আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের যেসব কথাবার্তা সাধারণতঃ হয় তার মধ্যে এই ব্যাপক ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাই নে। এক-কালে শেক্‌স্‌পীয়র-বার্ক পড়ে বি. এ. পাস করলেই ডেপুটিগিরি মিলত, কিন্তু এখন তা পাওয়া যায় না। সুতরাং তার উপর আমাদের বিতৃষ্ণা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তার ফলে আমরা করছি কি? এখন ঝোঁকটা পড়েছে সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে। হাতে-কলমে শিক্ষার বদলে আমরা চাচ্ছি হাতে-হেতেরে শিক্ষা দিতে। দেশটাকে কেজো মানুষের দেশ করে তুলতে হবে। অতএব ছেলেবেলা থেকে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা দিতে হবে। যেন তাতেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানুষের কাজ থাক আর নাই থাক কাজের মানুষ চাই।

কিন্তু গলদ তো ঐখানেই। প্রথম প্রশ্ন, জীবিকার পথ কি এতে সহজ হবে? হাতিয়ার ধরতে শিখলেই কি জীবিকা সহজ হয়ে যায়?

বরং বই পড়লে অনেক ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যদি কিছু বুদ্ধি থাকে) জীবিকা না হলেও কিছুটা বিত্তে হলেও হতে পারে, কিন্তু হাতিয়ারবন্ধ্ হলেই যে জীবিকা মিলবে এ রকম চিন্তা করা নিতান্ত ভুল। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল। গোবিন্দবাবু লোহার কারবারে বড়লোক হয়েছেন, নতুন বাড়ি করেছেন, করে বন্ধুকে সেই নতুন বাড়ি দেখাচ্ছেন। বন্ধু সব দেখেশুনে বললেন, বাড়ি তো চমৎকার হয়েছে, কিন্তু বাড়িতে একটা লাইব্রেরি না থাকলে আজকাল লোকে বাড়ির মালিককে অভিজাত ও কালচার্ড বলে না। শুনে গোবিন্দবাবু বললেন, তা আর ভাবনা কি, কালই নিউম্যানে তিন টন বইয়ের অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি। তেমনি আমরা যদি কালই পনর কোটি মিস্ত্রী ও ফিটার এবং পাঁচ লক্ষ ইন্‌জিনিয়ার তৈরি করে ফেলবার ব্যবস্থা করি-ও, তা হলে তখনই প্রশ্ন উঠবে যে আমাদের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের কাজে লাগাতে পারব তো? এখনও তো দেখি, যাঁরা খুব কঠিন কৌশল আয়ত্ত করেছেন এবং যাঁরা সংখ্যায় বেশি নন—যেমন বায়ুযানচালক—তাঁদের অনেকেই তো বেকার বসে আছেন। দ্বিতীয় কথা, আত্মবিকাশ। চুলোয় যাক জীবিকা, যদি আত্মবিকাশ ঠিকমত হয়। কিন্তু তাও কি হওয়া সম্ভব? যদি এম. ডি. পাস ডাক্তারকে ঔষধের কারখানার পাবলিসিটি অফিসারেরই কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, পিএইচ. ডি.-রা কেবলই লেখেন বাজারের নোট, অথবা লেদ-এর কাজ শিখে সে লোককে ময়রার দোকানে সন্দেশই মাখতে হয়, তা হলে বাল্যবয়সে যে শিক্ষা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবজীবনে কর্মের ক্ষেত্রে সে শিক্ষা কোনও কাজে এল না; শিক্ষার সাহায্যে যে কর্মের দিকে ছাত্রটিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, পরের জীবনে তা সবই গেল উল্‌টে। এর নাম কি আত্মবিকাশ? বাল্যকালে উপ্ত বীজ কি পর পর বাড়তে পেল? তার চেয়ে সে লোকের পক্ষে কি লেদ-এর কাজ না শিখে ভাল করে

সন্দেশ মাখার কাজ শিখলেই ভাল হত না? যে গোমস্তা পরে কোনকালে রামপ্রসাদ হতে পারবেই না, তার পক্ষে জাবদা খাতায় গান লেখা মক্শ না করে ভাল করে জমিদারি সেরেস্তার কাজ শিখলেই কি বেশি উপকার হত না? এই বুঝেই এককালে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, "মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের গুরু-নামক গোরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোরু-তাড়ানো শ্রেয়। 'ক'-অক্ষর যে-কোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু 'ক'-অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই।" এইসব কথা ভুলে গিয়ে শিক্ষার সংস্কার করতে যাওয়া যে চূড়ান্ত বেকুবি—আমাদের এই শিক্ষাটাই সেইজন্য সব প্রথমে হওয়া দরকার। তা না হলে আমরা কেবলই skill-fetishism-এর পাকে পাকে ঘুরে মরব,—সে fetishism-এর অবলম্বন কখনও হবে শেক্স্পীয়র-বার্ক, কখনও চরকা-তাঁত। কিন্তু তার বাইরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত না হলে আমরা শিক্ষাকে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না, জীবনের ক্ষেত্রেও শিক্ষা কোনও কাজে লাগবে না।

বাস্তবিক, অন্যান্য দেশের বেলায় কি দেখি? সর্বাত্মক পরিকল্পনার নিগড়ে যেসব দেশ আটকে গিয়েছে সেসব দেশে কতজন ডাক্তার কতজন ইন্‌জিনিয়ার হবে এসব কথা পরিকল্পনায় ঠিক করে দেওয়া থাকে। কিন্তু এসব দেশের কথা ধরছি না। যেসব দেশে এ রকম কড়াকড়ি বাঁধাধরা নেই—যেমন ইংলণ্ড—সেসব দেশেই বা কি দেখি? সেখানে বছরে কতজন ডাক্তার হবে, কতজন ইন্‌জিনিয়ার হবে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কিন্তু তবু তার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় জীবনের একটা মোটামুটি বোঝাপড়া আছে। যার কোনও প্রবণতা নেই তাকে জোর করে যেমন অ্যাডমিরাল তৈরি করা হচ্ছে না, তেমনই কোনও প্রয়োজন নেই অথচ কেবলই অ্যাডমিরাল

তৈরি করা হচ্ছে তাও নয়। শিক্ষাব্যবস্থা সেখানে জাতির প্রতিভাকে বিকশিত করে জাতির কাজে লাগাচ্ছে, তাই প্রতিভারও বিকশন হচ্ছে, জীবিকারও অভাব হচ্ছে না, বরং জীবিকা সেই প্রতিভাবিকশনের আরও সাহায্য করছে। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার এই হল বৈশিষ্ট্য। দুটো দিকই হাত মিলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

আমাদের দেশে ওই দুটো দিক আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের হাত নেই এবং তারা চলছেও না। সুখের বিষয়, শিক্ষাবিদ্‌দের তরফ থেকে শিক্ষাসংস্কারের আলোচনাও এতদিনে এদিকটাতেও নজর পড়েছে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্, ইরফান্ এবং ইল্‌ম্ ইত্যাদি কথার সঙ্গে য়ুনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন এবার একথাটাও বলেছেন—

> "We must have a conception of the social order for which we are educating our youth.... Our educational system must find its guiding principle in the aims of the social order for which it prepares, in the nature of the civilisation it hopes to build. Unless we know whether we are tending, we cannot decide what we should do and how we should do it. Societies like men need a clear purpose to keep them stable in a world of bewildering change." (*Report*, p. 35)

আমার প্রশ্ন হল, শিক্ষাসংস্কারের কথা ভাবতে গিয়ে আমরা এদিকে নজর দেব কবে ?

শিক্ষা-সমস্যার কয়েকটি কথা :

শাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলতে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু এমন এক এক সময় আসে, যখন অপ্রিয় সত্য না বললে প্রত্যবায়গ্রস্ত হতে হয়।

বিশেষতঃ যখন জাতির স্বার্থের ক্ষতি হতে থাকে, অথচ 'জনপ্রিয়তা' হারাবার ভয়ে নেতারাও কঠোর সত্য উচ্চারণ করতে সাহস করেন না। আজ শিক্ষার ক্ষেত্র, বিশেষতঃ বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্র দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছে।

আমি শিক্ষাবিদ্ নই, শিক্ষণ-শাস্ত্রের তত্ত্ব আমার জানা নেই, কাজেই কমিটি কমিশনের মত গুছিয়ে ভাল ভাল কথা লেখবার বৃথা চেষ্টাও আমার নেই। কিন্তু আমি এই কথা ভেবে জোর পাই যে, দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিক এবং অভিভাবক আমারই মত অ-বিশেষজ্ঞ এবং আমি অন্ততঃ সেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে—যারা নিজেরা এককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা মাড়ালেও এখন দৈনন্দিন সমস্যায় সেই পরীক্ষার আগে নোট-মুখস্থ-করা বিদ্যে ভুলতে বসেছে এবং যারা ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে কলেজে পাঠায় এই আশায় যে, সেখানে ছেলেমেয়েরা বিদ্যেও কিছু শিখবে, ভবিষ্যতে জীবিকার পথও খুঁজে পাবে, আর মোটামুটি তাদের জীবন, আদর্শ এবং সংস্কৃতিতেও একটা পালিশ পড়বে। সুতরাং আজকাল খবরের কাগজের শিরোনামা পড়ে সাধারণতঃ যে মনে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রটা বুঝি শিক্ষকদের ও সরকারের দ্বন্দ্ব এবং তার উপর কমিটি-কমিশনের প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, ব্যাপারটা কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। তার বাইরেও ছাত্রসমাজ আছে, অভিভাবক সমাজ আছে, সবার উপরে দেশ আছে, জাতি আছে, যারা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বড় অংশীদার—হয়ত প্রধানতম অংশীদার। শেষ পর্যন্ত শিক্ষাই বলুন, শিক্ষকই বলুন, তাদের সামূহিক যাচাই হয় জাতিগঠনের কষ্টিপাথরেই।

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেদিকেই তাকানো যাক, সেদিকেই হতাশ হতে হয়। ঐ কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়ছে না, এমন কি ক্যারাট গোল্ডেরও নয়। এক এক সময় সন্দেহ হয় পিতলের কস উঠছে না কি! ইস্কুলে কলেজে নিম্নতম শিক্ষার প্রতিযোগিতা চলেছে।

ছাত্রের উৎকর্ষ বাড়াবার চেয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর বেশি। কোনও কলেজে শিফ্‌টে শিফ্‌টে যদি পাঁচ হাজার ছাত্র পড়ে, তা হলে সেখানে পড়াশোনার সত্যসত্যই কি কোনও আশা থাকে? শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকি একটি নিয়ম আছে যে, কোনও কলেজেই দেড় হাজারের বেশি ছাত্র থাকতে পারবে না (হয়তো রাধাকৃষ্ণণ কমিশন রিপোর্ট সত্ত্বেও এ নিয়ম এতদিনে উঠে গিয়েছে), কিন্তু ঐসব বিরাট কলেজের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়ম প্রয়োগ করতে সাহস করেন না। কারণ খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। ক্লাসে অগুন্তি ছাত্র। প্রোফেসারেরা কি করে বিনা মাইক্রোফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ঐরকম জনসভায় চেঁচিয়ে যান, ভাবলে তাঁদের কণ্ঠশক্তির তারিফ করতে হয় এবং তাঁদের ধৈর্যে বিস্মিত হতে হয়। বহু ছাত্রকে অবসরের ঘণ্টায় স্থানাভাবে কলেজের বাইরে রাস্তায় পাইচারি করতে হয়, তবু শিক্ষাবিস্তারের অজুহাতে ঐ বিপুলসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতেই হবে? এতে কি সত্যিই শিক্ষাবিস্তার হচ্ছে? ছেলেরা জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে? এমন কি যেসব বিষয় পড়ছে, সেগুলিতেও অন্ততঃ কি সত্যিসত্যি পণ্ডিত হচ্ছে? যদি তা না হয়, তা হলে শিক্ষাবিস্তারের অজুহাত দেওয়া কেন? আর কলেজগুলিরই অবস্থা এই,—ইস্কুলগুলির প্রসঙ্গ নাই তুললাম। সেখানে উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সামান্য, পঠনপ্রণালী অনাধুনিক, লাইব্রেরী নিয়মরক্ষা মাত্র, আর ত্রিশ পার্সেন্ট পেলেই খুব সসম্মানে পাস ও প্রমোশন। তার উপরে আছে গৃহশিক্ষক নামে একটি ব্যাপার। আজকাল কোন ছাত্রই ইস্কুলের পড়ানোর উপর নির্ভর করে না বা করতে পারে না। ঘরে ঘরে গৃহশিক্ষক। প্রায়শঃই তাঁরা সেই ইস্কুলেরই শিক্ষক। এই নিয়ে পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও সময় সময় ওঠে। কিন্তু সে অভিযোগ সত্য হোক্ আর নাই হোক্, প্রশ্ন হচ্ছে গৃহশিক্ষকের

প্রয়োজনই বা হবে কেন? আর গৃহশিক্ষকতা করতে করতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, শিক্ষকেরা ইস্কুলে গিয়ে পড়াবেনই বা কেমন করে? তাঁরা তো যন্ত্র ন'ন, তাঁরা তো মানুষ। আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বালকের বাড়িতে শিক্ষক ইস্কুলে শিক্ষক তার পাঠ্যকে বটিকা আকারে গিলিয়ে পরীক্ষায় ত্রিশ পার্সেণ্ট রূপ মোক্ষলাভের আশায় তাকে গরু তাড়াচ্ছেন তার সত্যিসত্যিই গরুতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে? তার মন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে কি করে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পথে নিজের পায়ে চলবার মত ক্ষমতা হবে কি করে? তার পঙ্গুত্ব ঘুচবে কি করে? তার বদলে ছাত্রেরা যে মাইনে গৃহশিক্ষকদের দেয় সেই মাইনে ইস্কুলের হাতে তুলে দিক, আর ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ সেই টাকা শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে শিক্ষকদের বলুন, ইস্কুলের অঙ্গ হিসেবে ইস্কুলেই বাড়তি টিউটোরিয়াল ক্লাস করতে হবে—এরকম ব্যবস্থা হয় না কেন? তা হলে আবহাওয়াটা পরিচ্ছন্ন হয়, শিক্ষারও বোধ হয় উন্নতি হয়। তার উপর সম্প্রতি আরও নতুন বিপদ দেখা যাচ্ছে। অনেক আগে ইস্কুলগুলি ছিল সেক্রেটারীবাবুর প্রবল প্রতাপের ক্ষেত্র। পরে কালক্রমে সে যুগ কেটে গেল, তখন শুরু হল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে মনকষাকষি ও দরকষাকষির যুগ। সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক মারামারির যুগ। এমনিতেই তো আজকাল সব বিষয়েই রাজনীতির হাওয়া চলছে। আমাদের জীবনে রাজনীতিই যেন প্রধানতম বস্তু হয়ে উঠেছে—যদিচ আমরা সত্যি কথা বলতে প্রকৃত রাজনীতি না করে রাজনীতির ফেনিল আবর্তে নাচানাচি করাটাকেই সারবস্তু বলে প্রাণপণে গ্রহণ করেছি।

এই আবহাওয়ায় শিক্ষাবিস্তার হবে কেন? আর, আমরা যারা ইস্কুল কলেজ চালাই তারা কোনওরকম সুযুক্তি-পূর্ণ ও সুসমঞ্জস ব্যবস্থার চেষ্টা হলেও শিক্ষাসংকোচ হবে বলে দেশময় চীৎকার

তুলি কিন্তু ভেবে দেখি না যে আমরা সত্যিই শিক্ষাবিস্তার করছি কি না। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে, wastage একটা খুব বড় সমস্যা বলে অনেকদিনই পরিগণিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ নীচের ক্লাসে যত ছাত্র ভর্তি হয় উপরের ক্লাসে উঠবার আগে তার অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের অনেকেই আবার নিরক্ষর পর্যন্ত হয়ে পড়ে একথা সরকারী রিপোর্টেও বহুদিন থেকে উল্লিখিত হয়ে আসছে। এর কোনও সমাধান হয়েছে? উপরের দিকেই বা কি হচ্ছে? মাত্র ত্রিশ পার্সেন্ট পাসমার্ক সত্ত্বেও এত ছেলে ফেল করে কেন? এত গ্রেস-মার্ক, এত শোভাযাত্রা, ভাইস-চ্যান্সেলারদের এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও তো পর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেলের কুতবমিনার রচিত হতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে তো সবচেয়ে বাছাই ছাত্র নেওয়া হয়—একদম সেরা ছাত্রেরাই সেখানে যায়। তবু শুনি একশো'র মধ্যে সেখানে নাকি পনের-কুড়িটার বেশি ছাত্র পাস হয় না। কিন্তু কেন হয় না? এন্‌জীনিয়ারিং কলেজেও তো ঐ রকম বাছাই ছাত্র নেওয়া হয়, আর সেখানে পাসও করে অনেক বেশি বলে শুনেছি। একথা যদি সত্য হয়, তা হলে প্রশ্ন করতেই হয় এন্‌জীনিয়ারিং কলেজগুলি যা পারে মেডিক্যাল কলেজগুলি তা পারে না কেন? গলদ কোথায়? এর নাম কি শিক্ষাবিস্তার? না, অভিভাবকদের অর্থদণ্ড?

কিন্তু ভাবলে দেখা যাবে, এহ বাহ্য আগে কহ আর। এসব গলদ তো আছেই। তার উপর সবচেয়ে বড় কথা হল, আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন অবাস্তব শিক্ষা। গোড়ার দিকের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে বেশি তর্ক নেই। সবচেয়ে গোড়ার স্তরে সে শিক্ষা Three R's নিয়েই মাথা ঘামায়। সব দেশেই এই আদর্শ। কিন্তু তার পর? তারপর হতে আমরা নানারকম আজেবাজে জিনিস দিয়ে ছেলেদের ভারাক্রান্ত করে তুলি। একজন সাধারণ বাঙালী ছেলের কথা ধরা

যাক্। সে প্রথমতঃ অনেকগুলো ভাষা শিখতে বাধ্য। বাংলা তো পড়তেই হয়, ইংরেজী পড়তে হয়, হিন্দীও পড়তে হয় বা হবে, সংস্কৃতও পড়ে। সে কি ভাষাতত্ত্ববিদ্ হবে? না সারাজীবন অন্য কাজকর্ম ছেড়ে শুধু এইসব সাহিত্যের রস আস্বাদন করেই কাটাবে? সে রকম ক'টা ছেলে পারে? সে যদি বাস্তবজীবনে এসবের চর্চা কোনওদিনই না করে তা হলে এতগুলি ভাষা শিখে তার লাভ কি? আর শেখেই বা সে কতটুকু? সাহিত্য আস্বাদনের মত প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করা দূরে থাক্, ভাষার কাঠামোটাও সে ভাল করে শেখে না, ব্যাকরণ চর্চা করে না। ফলে পদে পদে ভুল। পরীক্ষার খাতা দেখলেই দেখা যাবে, উঁচু পরীক্ষাতেও ইংরেজী ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে। ভাষাটা শিখব, অথচ কার্যকালে ব্যাকরণশুদ্ধ মোটামুটি ভাল ভাষা লিখতে পারব না—তা হলে অকালে যৌবনক্ষয় করে, মাথা ঘামিয়ে, অর্থ নষ্ট করে, সে ভাষা শিখে লাভ কি হল? তার উপর ভাষা ছাড়াও একজন ইস্কুলের ছাত্রকে অঙ্ক শিখতে হয়, বিজ্ঞান শিখতে হয়, ইতিহাস পড়তে হয়, ভূগোল পড়তে হয়—আরও কত কি পড়তে হয়। এককথায় জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখাতেই তাকে বিচরণ করতে বাধ্য হতে হয়। ফলে গাছের শিকড় গাড়ে না, কেবল পাতার বাহার হয়। তার উপর শিকড়ের রস না থাকায় পরীক্ষার মৌসুমী বায়ু কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাতা শুকিয়ে যায়। সুতরাং সেগুলি বিদ্যার মহীরূহও নয়, পাতাবাহার গাছও নয়, পরীক্ষার বর্ষার আগাছা। এইসব বিদ্যার পল্লবগ্রহণ করে আমরা ইম্পরট্যান্ট কোয়েশ্চনসের তালিকা বাছাই করে করে কোনওরকমে পরীক্ষার খাতায় তা উজাড় করে দিয়ে আসি। শুধু ইস্কুলেরই বা দোষ দিই কেন? আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলি। অর্থনীতিতে এম. এ পরীক্ষা আসন্ন, একটি বিষয় বিরাট পটভূমিকায় পড়তে হোত। বহু দেশের বহু যুগের কথা

—মধ্যযুগ হতে একেবারে একালের আগে পর্যন্ত। বিষয়টিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, বহু বই সাময়িক পত্রিকা নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে একজন সহপাঠী একটা সহজ উপায় বাতলে দিল। সে দেখাল, গত পনের-কুড়ি বছর ধরে কতকগুলি প্রশ্নই ফিরে ফিরে আসছে। একবার কতগুলি, পরের বছর আর কতগুলি, তারপর তৃতীয় বছরে প্রথম বছরের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, চতুর্থ বছরে দ্বিতীয় বছরের। এর কখনও ব্যতিক্রম হয় নি। সহপাঠী বলল, এর কারণ আমাদের অধ্যাপকটিই গত পনের বছর পড়িয়েও আসছেন, প্রশ্নও করে আসছেন এবং তিনি তাঁর বাঁধা প্রশ্নতালিকার একটুও বাইরে যান না। সুতরাং গত বছরের আগের বছরের প্রশ্ন দেখলেই এ বছরের প্রশ্নের হদিস মিলে যাবে। তখন তার কথা বিশ্বাস করি নি। কার্যক্ষেত্রে দেখলাম তার কথাই ঠিক। অন্য বিষয়ের কথা জানিনে, কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায় অন্ততঃ অর্থনীতির এম্. এ. ক্লাসে-ও দেখেছি, আধুনিক এবং জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান কোনও বিষয়েও অধ্যাপক বছরের পর বছর তাঁর টাইপকরা নোট ছেলেদের ঘণ্টা ধরে লিখিয়েই তাঁর লেকচার (?) শেষ করেন। ব্যবসাদারেরাও সে কথা জেনে সেই নোটের নকল সংগ্রহ করে পুরোটাই সাইক্লোস্টাইল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে বিক্রি করে দু'পয়সা কামায়। গুরুনিন্দা মহাপাপ, তা করছি নে। বস্তুতঃ এমন কিছু অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁদের স্পর্শে শুধু যে লেখাপড়াই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই নয়, জীবনের মলিনতা পর্যন্ত কেটে যায়। তবু দু-চার ক্ষেত্রে যে গলদ দেখেছি তার উল্লেখও নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। সুখের বিষয়, আজকাল উন্নতি হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু মোটামুটি এই রকম আবহাওয়াই যখন চলছে তখন সেখানে পাঠ্যবস্তুকে গভীরভাবে গ্রহণ করা হয় কি? যা শিখি তা কি আমার ভবিষ্যতের জ্ঞান ও কর্মের হাতিয়ার হয়েই রইল?

ডাঃ রেনিয়ার (Renier) নামে একজন ড্যানিশ ভদ্রলোকের একটি অনবদ্য বই আছে,—*The English : Are they human?* ইংরেজ জাতের অনেক অদ্ভুতত্ব এবং আপাতবিরোধী চালচলন সম্বন্ধে বইটিতে অনেক পরিহাসদিগ্ধ কৌতুককর কথা আছে। তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন :

> I have frequently noticed that the Masters of the world have little geography. I suppose that it matters not where one's possessions are when one knows that there is no corner of the globe where some of them cannot be found. If the gentleman who interpellated me was looking for the River Po in Florence, this gap in his mental equipment had not prevented him, as I subsequently learned, from becoming the owner of several large printing works, where proof-reading was done by people whose minds were free from the cares of administration and who had therefore found the time to learn those unimportant details which are stored up in atlases.

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, একথাটা সম্পূর্ণ সত্য। বিলেতে কোনও ইস্কুলের ছাত্র বলতে পারবে না ভারতবর্ষে ঔরঙ্গাবাদ, এমন কি এলাহাবাদ কোথায়। কিন্তু যে-কোনও ভারতীয় ছাত্র চোখ বেঁধেও মানচিত্রে বার্মিংহাম, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার দেখিয়ে দিতে পারবে। তবু ইংরেজ বড় হয় কেন? তার একমাত্র কারণ সে যা পড়ে সে সেটুকু সত্যি করে শেখে—অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। এলাহাবাদের খবর রাখুক আই-সি-এস পরীক্ষার্থীর দল,—কিন্তু যে কভেন্ট্রির সাইকেল ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিনিয়ার হবে তার সে খবরে দরকার কি? তাই যেসব বিলেতী আই-সি-এস

এদেশে এসেছে তাদের মধ্য হতেই কোলব্রুক হাণ্টার প্রভৃতি গ্রন্থকার আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের গ্রন্থ ভারতীয় আর্ট, মুদ্রাতত্ত্ব, সমাজবন্ধন, আদিবাসী, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখনও প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে রয়েছে। এদেশের আই-সি-এসরা চাকুরী করেছেন, কিন্তু ক'জন বই লিখেছেন ও রকম? অথচ যে সাইকেল ফ্যাক্টরীর ইঞ্জিনিয়ার সে ওসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন? লণ্ডন জেনারেল সার্টিফিকেট (অর্থাৎ লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা খুললে দেখা যাবে, তার ভূগোলের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে আছে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি; তার মধ্যে স্থানীয় আবহাওয়ার খবর নিতে হয়। আশেপাশের শহরগুলি ও গ্রামের সম্পর্কও জানতে হয়। তা ছাড়া পড়তে হয় বিলেতের ভৌগোলিক বিবরণ, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, আর তা ছাড়া হয় বাকী ইউরোপ অথবা মেক্সিকোর উত্তর পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা (অর্থাৎ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র); তাদের সঙ্গে যাদের কারবার, তারই খবর রাখতে হয়। এর নাম বাস্তবতা। আমরা ভূগোল পড়াবার সময় কি স্থানীয় ভূগোলের দিকে কোনও নজর দিই? অথবা স্টেপী আর প্রেইরির খবর মুখস্থ করতে করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়? আমরা স্বদেশ, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূগোল নিয়েই তুষ্ট থাকি কি? না, টাসমানিয়ার রাজধানী হোবার্ট মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি থাকে না? তেমনি ইতিহাসের কথা। কোনও সাহেববাচ্চা চট্‌ করে অশোকের নাম বলতে পারবে না, একেবারে পারবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে—কিন্তু কিং কানিউটের গল্প আমাদের ছেলেদের মুখে মুখে। এটা অবশ্য খানিকটা পরাধীনতার ফল। কিন্তু এখনও সে ধারা চলবে কেন? বাস্তবিক, আমাদের ইতিহাসের পাঠ্য-নির্বাচন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশনে আমরা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াই। কিন্তু সে তো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মামুলি।

তারপর আই.এ-তে—যেখানে অনেক বেশি ও অনেক বিস্তারিত পড়া হয়—সেখানে আবার ভাল করে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ানো উচিত, কিন্তু তা না পড়িয়ে পড়াই কেবলমাত্র গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস। সাহেবদের নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে গ্রীস আর রোমের ইতিহাস তো পড়তে হবেই—তাদের সভ্যতার আদিভূমিই তো গ্রীস আর রোম। কিন্তু আমাদের তো তা নয়। পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উঠেছে, পড়েছে। তার খবর টয়েনবী দিয়েছেন। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা খুব বড় সভ্যতা হলেও আমাদের চোখে তা আরও পাঁচটা সভ্যতার সঙ্গের দুটো সভ্যতা মাত্র। আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এশিয়ার সভ্যতা, চীন বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের কাহিনী। অথচ সেসব দিকে নজর না দিয়ে আমরা গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডেরই জের টানছি। এ কেন? ভারতীয় সাম্রাজ্য জয় হবার পরই বিলেতে ট্রপিক্যাল অসুখ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। যেমনই দরকার পড়েছে অমনই ইংরেজ তা চর্চা শুরু করেছে এবং সে চর্চা অত্যন্ত ভালভাবেই করেছে। লক্ষণীয় এই যে, দরকার না পড়লে করে নি, যাদের দরকার নেই তারাও করে নি। অথচ আমাদের যা প্রয়োজন সেদিকে নজর না দিয়ে আমরা অন্যদিকে তাকিয়ে আছি। এই কি শিক্ষার বাস্তবতা? আসল কথা, আমরা দেড়শ' বছর আগেকার গোলকধাঁধাতেই ঘুরে মরছি। দেড়শ' বছর আগের আবহাওয়াটা কি ছিল? আমরা তখন ইংরেজী সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আস্বাদ পেয়েছি। একদিকে তাই সে রস পাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তার মত শিক্ষাব্যবস্থা চাই। অতএব শেক্‌স্পীয়র, মিল্টন, বার্ক হতে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার আস্বাদ চাই। এই হল মুষ্টিমেয় উপর-স্তরচারীদের দাবী। তার ফলে বাঙলার সহস্র সহস্র মনীষীকে আমরা এই স্তর হতে পেয়েছি—বঙ্কিমচন্দ্র হতে শুরু করে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত। আর তা ছাড়া দরকার ছিল কেরানী ও ডেপুটির।

তখনকার দিনে বিশেষীকরণ খুব কমই ছিল, কাজেই ঐ সাধারণ বিদ্যে হতে কেরানী ডেপুটিও হত। এটা হল নীচুর স্তরের দাবী। দুটোই অবশ্য মধ্যবিত্তের দাবী। তার বাইরে বিপুল জনসাধারণের কথা তখন কে ভাবে? আজ অবস্থা বদলেছে, অথচ চিন্তার ধারা বদলায় নি। এই শিক্ষার ফলে আমরা এখনও মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পাচ্ছি বটে, (যদিচ এক বন্ধু বলেন বাংলাদেশে যাঁদের কিছুটা খ্যাতি আছে বা হয়েছে, তাঁর সকলেই এনট্রান্স পাশ—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন ও বড় হয়েছেন, এমন নাম একটাও নেই। জানি না সত্য কিনা। অন্ততঃ সুভাষচন্দ্র ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন, এনট্রান্স নয়)। কিন্তু মধ্যবিত্তের উপর স্তরেও সাধারণভাবে আর আগের মত জ্ঞানের বিকশন হচ্ছে না। অন্যদিকে কেরানীত্ব ও ডেপুটিত্বের বাজারদরও কমেছে, চাকরীও দুর্লভ হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজেই এই অবস্থা। তার উপর আজ বিপুল জনতা জেগেছে, তাদের কথা না ভাবলে আর চলবে না। তাদের প্রয়োজন তো সম্পূর্ণ অন্য। অথচ এইসব কথা না ভেবে আমরা দেড়শ' বছর আগের অদৃশ্য আস্ফালনকে আজও গায়ের জোরে চালাতে চাচ্ছি। কিন্তু তা চলা সম্ভব নয়। এই দিক দিয়ে গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষার একটা খুব বড় তাৎপর্য আছে। শিক্ষা শুধু মধ্যবিত্তের নয়, সকলের জন্য এবং সেই কারণেই জীবনের কাজের সঙ্গে তাকে মেলাতে হবে—এই কথাটা খুব বড় কথা এবং বাস্তব ও নতুন কথা।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দেশের লোক ও শিক্ষাব্রতীদের এসব বিষয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। এই সব সমস্যার সমাধান বাতলে দেওয়ার চেষ্টা আমি করব না। কেবল সাধারণভাবে কয়েকটি প্রস্তাব করতে চাই:

প্রথম: শিক্ষার উদ্দেশ্য বিনিশ্চয়। সব প্রথমেই ঠিক করতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে। কাকে শেখাতে চাই এবং কি

শেখাতে চাই তা স্থির হওয়া দরকার। এ বিষয়ে চিন্তার ঢিলেমি যথেষ্ট রয়েছে। এ সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সাধারণভাবে অনেক ভাল কথা বলেছেন, সেগুলিকে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। আজ যে সমাজজীবন দেখছি এবং জাতির যে প্রয়োজন অনুভব করছি, তাতে আমার মনে হয় শিক্ষার তিনটি ভাগ করতে হবে। প্রথম, উদার শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্যই শিক্ষা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাই কিছু-না-কিছু পড়ানো হবে, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ মান পর্যন্ত পড়ানো হবে, শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছাত্রেরাই এইসব পড়তে পাবে। কোথাও এর সীমা টানা হবে না। তা হলে এই গোষ্ঠী থেকেই আমরা অর্থনীতিবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ প্রভৃতি মনীষী পেতে থাকব, যাঁদের মনীষায় জাতীয় চিত্ত উদ্ভাসিত হবে, জাতির যাত্রাপথ আলোকিত হবে, আমরা নতুন নতুন পথ রচনা করতে পারব। ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীর কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পূর্ত বিভাগের বড়কর্তা, স্থাপত্যবিদ্যার ডিরেক্টর, আবহতত্ত্ববিদ্, রেল-প্লেনের নির্মাতা, নৃতাত্ত্বিক গবেষক, সমাজ-গবেষণা সংস্থার পরিচালক ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মীরা আসবেন এই স্তর থেকে।

দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত সমাজ। আগের কালে দু-চারজন ইংরেজী পড়তেন জ্ঞানের আশায়, কিন্তু অধিকাংশই ইংরেজী পড়তেন ডেপুটিত্ব, অন্ততঃ কেরানীত্বের আশায়। আজ অবস্থা বদলেছে। বি. এ ডিগ্রির বাজারদর নেই। আজকাল শুধু বি. এ পাস করে চাকরি তো দূরের কথা, এমন কি হবু শ্বশুরবাড়ি থেকে পণ পর্যন্ত আদায় করা যায় না। সুতরাং প্রথম স্তরের ভঙ্গীতে এই শ্রেণীকে পড়াবার প্রয়োজন নেই। দেখতে হবে সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে আগামী দশ-পনের বা বিশ বছরে আমাদের কোন্ কোন্ দিকে মোটামুটি কি ধরনের লোক দরকার। সেই দরকারের পরিমাপ করে নিয়ে সেই অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আজ হঠাৎ যদি প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার গ্রাজুয়েটের বদলে পঞ্চাশ হাজার

ফিটার মিস্ত্রি বাংলাদেশে তৈরী হতে থাকে, তা হলে তাতে বেকার-সমস্যা একটুও ঘুচবে না, কেননা এখন যেমন জীবিকার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার গ্রাজুয়েটের কোনও কর্মসংস্থান নেই, তেমনি পঞ্চাশ হাজার ফিটার-মিস্ত্রীরও নেই, বড় জোর পাঁচ হাজারের আছে। এদের শিক্ষাপ্রণালী হবে বিভিন্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রাথমিক জ্ঞান এদের কাছে এনে দিতে হবে, কিন্তু একটু দূর এগোলেই প্রত্যেকটি ছাত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে তাদের স্কুল-পাঠ্য অবস্থাতেই চালিয়ে দিতে হবে। আমেরিকায় বহু multi-purpose ইস্কুল আছে। তার উল্লেখ মুদালিয়র রিপোর্টেও আছে, এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে ঐসব ইস্কুলে উপরের দিকে বিভিন্ন বিভাগ আছে,—বিজ্ঞান বিভাগ, টেকনিক্যাল বিভাগ প্রভৃতি। কতকগুলি বিষয় সকলেই পড়ে আর কতকগুলি বিষয় বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে পড়ে। তাতে তাদের ক্ষমতার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ হয়। সে পদ্ধতি এখানে অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন্ ছাত্র কোন্ দিকে গেলে ভাল করতে পারবে, তা স্থির করবার জন্য আমেরিকার মত psychological test-এরও প্রবর্তন করা যেতে পারে। মোদ্দা কথা, একদিকে সামাজিক প্রয়োজন, আর অন্যদিকে ছাত্রের ক্ষমতা—এই দুটি দিককে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিতে হবে। এ স্তরে শিক্ষার হবে এই কাজ। সুতরাং এ স্তরে পরিব্যাপ্তি একেবারে না থাকলে চলবে না, কিন্তু একটুখানি পরিব্যাপ্তির পর কয়েকটি দিকে বিশেষীকরণের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথম স্তরে extensity ও intensity দুই-ই সীমানাহীন। এ স্তরে extensity প্রয়োজনমত সামান্য, কিন্তু intensity খুব বেশি।

তার পরের স্তর হল জনতার স্তর। এদের পক্ষে extensity আরও কম, intensity বেশি। পরে বলব, এদের অকারণে ভাষা-

তত্ত্ববিদ্ করে তোলবার চেষ্টা মোটেই চলবে না। আর বিদ্যাকে পুস্তকস্থা করে রাখলে চলবে না, জীবনের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে মেলাতে হবে।

এই ধরনের সংস্কার হলে তবে শিক্ষাও হবে, জীবিকাও হবে। বেকারসমস্যাও থাকবে না, দেশের কাজও ভাল হবে।

দ্বিতীয়ঃ পাঠ-তালিকার কার্যক্রম। পূর্বে যা বলেছি, তা হতেই পাঠ-তালিকার কার্যক্রম কোন্‌দিকে কিভাবে বদলান দরকার তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রও এটা নয়। এ বিষয়ে দুই-একটা দিকের ইঙ্গিত পূর্বেই করেছি। ইংলণ্ডে ছাত্রদের একটা খুব বড় সুবিধে এই যে, তারা নিজেদের ভাষা আয়ত্ত করলেই সেই ভাষার সাহায্যে আসল পাঠ্যবস্তু—যেমন বিজ্ঞান—সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন শুরু করে দেয়। ভাষার সবচেয়ে প্রাথমিক কর্তব্য হল জ্ঞানলাভের হাতিয়ার হওয়া। যারা সাহিত্য-চর্চা করবে না অথবা ভাষার গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবে না, তাদের কাছে ভাষাই ভাষার চরমার্থ নয়, ভাষা কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের হাতিয়ার মাত্র। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে যে চাষী চাষ করবে, তার সংস্কৃত হিন্দী বা ইংরেজী কিছু পড়ারই দরকার করে না। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর দরকার হবে কোর্টে আদালতে—তা সে কাজ তো সে উকিল-মুহুরী দিয়ে করিয়ে নেবে—তার জন্য তার নিজের সে ভাষা শিক্ষা করবার কোনও প্রয়োজন নেই। তার যা কিছু দরকার, সে সবই বাংলা ভাষার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে—এমন কি, কৃষিবিজ্ঞান ও পশুবিজ্ঞানের কঠিনতম জ্ঞান পর্যন্ত। তার ইস্কুলের শিক্ষা এই ভবিষ্যৎ জীবনের মত গড়ে দিতে হবে। তেমনি যিনি তাঁতকলের উইভিং মাস্টার হবেন, তাঁকে আর একটু বেশি পড়তে হবে অবশ্য, কিন্তু তিনিও যাতে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই কাজ চালাতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরেজরা কি ল্যাটিন

শিখে তবে বাইসম্যান কোরম্যান হয়? কিন্তু যিনি উকীল হবেন, এমন কি গ্রামের পোস্টমাস্টারও হবেন, তাঁকে বাংলা ছাড়াও হিন্দী ও ইংরেজী অবশ্য শিখতে হবে, কারণ তা না হলে তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না যদি হিন্দী বা ইংরেজী কোর্টে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তা বলে গ্রামের সকলকেই যে ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজী কার্স্টবুক পড়তে হবে তার কোনও মানে নেই। এককালে আমাদের একটা অদৃশ্য ইচ্ছা হয়েছিল আমরা ইংরেজদের হারিয়ে দেব তাদেরই ভাষার জ্ঞানে, তাদের সাহিত্যের আস্বাদনে, সেই জন্য সকলকেই মাইকেল বা হরিনাথ দে করে তুলবার একটা অদৃশ্য চেষ্টা হয়ে গেছে আমাদের পাঠতালিকায়। কিন্তু তখন 'সকল' বলতে বোঝাত শুধু কয়েকজনকে। আজ তা নয়। সে কারণে সে ইচ্ছা আজ শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, রীতিমত ক্ষতিকর।[১] তাতে অযথা শক্তিক্ষয় হয়, মন আসল বিষয়ে প্রবেশ করার বদলে ভাষার পাকে পাকে ঘুরে মরে, শেখেও না আসলে কিছু। তেমনি ইতিহাস ভূগোলের কথা। আমার গ্রাম, শহর, তারপর আমার প্রদেশ, দেশ ও প্রতিবেশী-দেশের খবর না জেনে শুধু ইরান-তুরান ওড়ালে কোনও কাজ হয় না। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অকেজো। এইসব কথা ভেবে পাঠ তালিকার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, অন্ততঃ তৃতীয় স্তরের লোকদের শিক্ষা পুঁথিগত হলেই চলবে না—তাদের সমাজ, জীবন ও কর্মের সঙ্গে সে বিদ্যাকে

১ স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট একটি গল্প শুনেছিলুম। ওকাকুরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার সময় কলকাতায় একটি বিদায়-সভা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনবদ্য ইংরেজীতে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। উত্তর দিতে উঠে ওকাকুরা প্রথমেই বললেন, Me no speak good English ; me no compelled to learn English. স্বাধীন বাস্তবানুগ জাত আর পরাধীন অনুকরণপ্রিয় জাতে তফাৎ এইখানে।

অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের ছেলের পাঠতালিকায় হাইজিন থাকলেই হবে না, কম্পোস্ট তৈরীও থাকবে। বরং উচ্চ বিজ্ঞান শেখানোর অছিলা করে যে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করা হয়, তার বদলে হাতে-কলমে কম্পোস্ট তৈরী শিখিয়ে তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তা অনেক বেশী কার্যকর হবে। স্টেপীর বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা না করে কিভাবে এড়ো বাঁধ দিয়ে আশেপাশের খোয়াই বন্ধ করা যায় ও মাটির তলার জল-সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়, তা জানলে ঢের বেশি ভাল ভূগোল পড়া হবে।

তৃতীয়ঃ বিদ্যালয়ের রূপ। এ বিষয়ে লিখতে গেলে বিস্তর লিখতে হয়। তাই সংক্ষেপে দুই-একটা কথা বলছি। একশো বছর আগে একটা প্রয়োজনের তাগিদে এইসব বিদ্যালয় এক ধরনের রূপ নিয়েছিল। তার পর এন্‌ট্রান্স বদলিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হবার সময় নাকি একটা উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়েছিল, যত সহজে ছেলেরা বেশি পাস করবে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ততই বেশি হবে; ফলে অসন্তোষ, অশান্তি ও আন্দোলন ততই বাড়বে এবং তাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে। জানি না, এরকম একটা উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ছিল কি না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে মোটামুটি সেই ধরনেরই ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে আর যাই হোক্‌, আমাদের জাতির মাথাটা খাওয়া গেছে, এমন কি রাজনীতির মাথাও। যে জাতে মানুষ নেই, সে জাত কি সত্যি-সত্যিই রাজনীতি করতে পারে? বলিষ্ঠ বাস্তব রাজনীতি? তারা একজন দাদাঠাকুরের ইশারায় মেষপালের মত ঝাণ্ডা ঘাড়ে রাস্তায় বেরোতে পারে, ঘরে আগুন দিতে পারে, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ চীৎকার করতেও পারে, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটি মানুষ সজ্ঞানে ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা করবে, রাজনীতির ভালোমন্দ

বিবেচনা করতে পারবে, প্রেমে নিষ্ঠায় কর্মোদ্যমে দেশকে গড়বে—সে প্রয়োজন মেটাবার মানুষ গড়েছে কৈ? যে বিচারবুদ্ধি ও মোহহীন দূরদর্শিতার ফলে ইংরেজ যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিলকে পর্যন্ত সরিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করে নি সেইরকম বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিচারবুদ্ধি না থাকলে তো সত্যকারের রাজনীতি হয় না। কাজেই জাতির স্বার্থে তো বটেই, এমন কি রাজনীতির স্বার্থেই, এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার—বর্তমান ধারার মোড় ফেরা দরকার। কিন্তু সে কথা যাক্। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে খুব দূরদর্শী ও গভীর কথা বলেছেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" নামক গ্রন্থটিতে। সকলেরই সেই বইটি পড়া উচিত—সেজন্য তাঁর কথার পুনরুল্লেখ এখানে করব না। তাঁর বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ হতে অধস্তন কলেজ-ইস্কুলগুলির রূপও খানিকটা বোঝা যায়। পাঠকেরা সে বই পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে বলা যায়—

এক, উপরে উক্ত নতুন আদর্শ ও পাঠতালিকার ভিত্তিতে ইস্কুল চালাতে হবে। তার জন্য ইস্কুলগুলি যথাসম্ভব আবাসিক হলে ভাল হয়, কলেজগুলিও। যে ছেলে বাড়িতে একরকম আবহাওয়া পায়, ইস্কুল থেকেই ছোটে চা, চপ, চিত্রা, চণ্ডীদাসের সন্ধানে, তার জীবনকে ইস্কুল আর কলেজ কতটুকু প্রভাবান্বিত করবে? উইণ্ডসরের অদূরে ইটনের বিদ্যালয়, নিজস্ব ঘেরা মাঠের মধ্যে পুরোনো গম্ভীর চেহারার বাড়িগুলি অটল শান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখেছি। যে ছেলে চব্বিশ ঘণ্টা সেই আবহাওয়ায় থাকবে, সে তো লেখাপড়া শিখবেই, উপরন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার চরিত্র গঠিত হয়ে যায়। জার্মানিতে যেসব ছাত্র টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে পড়ে তাদের সকাল-বিকেলে কাজ করতে হয় ফ্যাক্টরী ল্যাবরেটরীতে, দুপুরে থিওরীর ক্লাস, রাত্রে লাইব্রেরী। গোটা জীবনটাই অধ্যয়ন নামক তপস্যার চারপাশে

আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং তারা স্বভাবতঃই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করছে। আমাদের দেশে মানুষ গড়তে গেলে এইরকম গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও তো রাজারা ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়াতেন না, গুরুর কাছে তপোবনে পাঠিয়ে দিতেন।

দুই, বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা বদলাতে হবে। ছাত্র প্রতিদিন ক্লাসের খাতায় যে নম্বর পায়, পরীক্ষার সঙ্গে তা-ও সমানভাবে বিবেচিত হবে।

তিন, গৃহশিক্ষক-পদ্ধতি সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে। পূর্বেই বলেছি, কিভাবে ইস্কুলেই টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে শিক্ষকদের জীবিকাও কমে না অথচ অন্য সব দিকে উন্নতি হয়।

চার, ছাত্রদের কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করতে হবে। যেমন ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্রেরা আশেপাশের পল্লীর বা গ্রামের বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার জন্য সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা করে ক্লাস নিতে পারে। দুজন আজ ক্লাস নিল, আর দুজন পরের দিন পড়াল—এইভাবে ভাগ করে দিলে এদেরও পড়ার ক্ষতি হবে না।

পাঁচ, যেভাবে ইস্কুল কলেজের পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হন, তা বদলাতে হবে। আগে যেসব রায়বাহাদুরেরা অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থানীয় ইস্কুলের সভাপতি বা সম্পাদক হতেন, তাঁরা বড় জোর একটু মুরুব্বিয়ানা করতে চাইতেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব সুদূরপ্রসারী হয়তো ছিল না, ইস্কুলে হয়তো তাঁরা ভক্তিভরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি টাঙিয়ে রাখতেন, আর চাপকান পরে গিয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়কে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করে আসতেন—কিন্তু তা ছাড়া অন্যদিকে হাল ধরে রাখবার মত বিদ্যাবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও অবসর তাঁদের ছিল। আজ এমন কি সেসব রায়বাহাদুরের দলও অদৃশ্য। তার বদলে কমিটি "ক্যাপচার" করবার

দলই গড়ে উঠছে। গত পনের-কুড়ি বছরের মধ্যে ইস্কুল কলেজ নিয়ে হাইকোর্ট ও বিভিন্ন কোর্টে অজস্র মামলা হয়েছে। আগে তা হত না। সুতরাং এর প্রতিকার দরকার। যাতে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্যাপারীরাই ইস্কুল কলেজের কর্তা হন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনেছি, বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে এবিষয়ে নূতন পন্থা বাতলিয়েছেন। এবিষয়ে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা আগের গ্রাম্য দলাদলির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর দলাদলি। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়ের বাড়িঘর সম্পত্তি যাতে ম্যানেজিং কমিটির হাতে না থেকে ট্রাস্টীর হাতে থাকে। মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালরের কথা মনে পড়ছে। ম্যানেজিং কমিটি একবার কংগ্রেস একবার পি-এস-পি দখল করছে আর আগের দল যে ঘরবাড়ি তৈরী করছে পরের দল সে ঘরবাড়ি ভাঙছে। এটা খুব চরম নিদর্শন হলেও ছোটখাটভাবে এ ধরনের গণ্ডগোল বহু জাগয়ায় হতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং সম্পত্তির ভার এমন কয়েকটি লোকের হাতে দেওয়া উচিত যাঁরা জনসাধারণের কাছে ন্যাসী সম্পত্তির জন্য আইনগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং যাঁরা ম্যানেজিং কমিটির দলাদলির ধুলোর ঝড়ে উড়ে যাবেন না।

ছয়, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলি যেমন পরিকল্পনাবিহীনভাবে ছড়িয়ে আছে তা চলবে না। সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। খুব কাছাকাছি দুটি বিদ্যালয় মারামারি করতে থাকবে, আর তারপর বহুদূর পর্যন্ত কোনও বিদ্যালয় থাকবে না, এ ব্যবস্থা অচল। সেখানে কাছাকাছি একটি বিদ্যালয়কে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষতঃ আবাসিক বিদ্যালয় হলে এ ব্যবস্থা ছাড়া চলতেই পারে না। একে শিক্ষার সংকোচ মনে করবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য এতে কিছু ব্যক্তিস্বার্থ বা দলস্বার্থ বা দলাদলির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, কিন্তু তা গ্রাহ্য করলে চলবে না। কলেজের বেলায়ও সেই কথা। পাঁচহাজারী আর

পঞ্চশতী কলেজে যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েট বিভেদ আছে তা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থ: শিক্ষাবিভাগের সংস্কার। এইসব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সার্থক করতে গেলে শিক্ষা বিভাগের হাতে অনেক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা দেবার আগে শিক্ষাবিভাগের সংস্কার চাই। আজকাল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে রয়েছে। তার এক কর্তা শিক্ষাবিভাগ, আর এক কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক কর্তা মাধ্যমিক বোর্ড। এই সবের মধ্যে একটা সুসমঞ্জস বিধান করতে হবে। বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে আরও সরকারী আওতায় আনতে। তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার আগে প্রয়োজন আছে শিক্ষাবিভাগের সংস্কারের। যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন এবং যাঁরা সরকারী চাকরি করেন তাঁরা সুশিক্ষিত হলেও সকলে শিক্ষাবিদ্ নন। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই প্রগতিশীল দেশে সরকারের মধ্যে বোর্ড ব্যবস্থা আজকাল খুব বেশি হয়ে উঠেছে। আগে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে যা পরিচালনা করতেন এখন তা বিভিন্ন বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাবিভাগের মধ্যে সেইজন্য বিভিন্ন বোর্ড থাকা দরকার। শিক্ষাবিদ্দের নিয়ে এইসব বোর্ড গঠিত হবে —অবশ্য সেখানেও দেখতে হবে তার গঠন এমন যেন না হয় যাতে তা অধুনালুপ্ত বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মত দলাদলির কুরুক্ষেত্রেই পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম: অর্থব্যবস্থা। এই সব করতে গেলেই টাকা চাই। বিনা পয়সায় আর যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থা হয় না। মাছের তেলে মাছ ভাজা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় সম্ভব নয়। বা সম্ভব করতে গেলেই ঐ পাঁচ হাজারী কলেজের বিষবৃত্তে পড়তে হবে। সেইজন্য এইসব সংস্কার কাজে পরিণত করবার জন্য সরকারকে যথোচিত টাকার

বরাদ্দ করতে হবে। টাকা না পাওয়া গেলে শিক্ষার উন্নতি হবে না এটা ভুললে চলবে না। শিক্ষকদের যদি পেট না ভরে, ইস্কুলের যদি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম না থাকে, ছাত্রদের যদি বই কিনবার পয়সা না থাকে, বসে পড়বার জায়গা না থাকে, তাহলে শিক্ষা হবে কি করে? এদিকে কিছু কিছু চেষ্টা শুরু হয়েছে। তা আরও ব্যাপক হওয়া দরকার।

ষষ্ঠ: শিক্ষা ও রাজনীতি। পরিশেষে শিক্ষা ও রাজনীতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলেই শেষ করব। আমরা চলতি রাজনীতির আবর্তে শিক্ষক ও ছাত্রদের বহুদিন থেকে টেনে আসছি। ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সম্প্রতি নেহরুও অনুরূপ দু-চারটি কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে অবস্থা একরকম ছিল, এখন অবস্থা অন্যরকম হয়েছে। আগে দরকার ছিল সকলে মিলে কোনও রকমে ইংরেজকে সাগরপার করে দিয়ে আসা। সেই ব্যাপারটায় সবাই মিলে আমরা কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। যুক্তি ছিল এই যে, আমরা তো আর চিরকালের মত সব জিনিস বন্ধ করছি নে, দু-চার বছরের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করলে ক্ষতি কি। ঘরে আগুন লাগলে তো সবাইকেই কলসী নিয়ে ছুটতে হয়। কথাটার মধ্যে খানিকটা যুক্তি আছে। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাইনে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে যোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্রসচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধা শক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা

স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে।" তখনকার যুগে যা-ই হোক, স্বাধীনতার পর তো আমরা সত্যকারের স্বরাজের সম্মুখীন হয়েছি। সেই বহুধাবিচিত্র বিরাট স্বারাজ্য সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের উপর ভয়ংকরভাবে এসে পড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত নির্বাচিত হচ্ছেন, গ্রামের শাসনভার পঞ্চায়েতের হাতে, ভূমিব্যবস্থা সমবায়মূলক হতে চলেছে। কাজেই আমরা না চাইলেও আমরা কেউই আর পলিটিকস্ এবং দেশ গড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাব না। তার উপরে আমরা সাবালক হয়েছি, আর ইংরেজের অভিভাবকত্বে নেই। সুতরাং সারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেইজন্য রাজনীতিও আর ইংরেজ-বিতাড়নের চক্রে ঘুরে মরছে না—এখন তা ভয়ংকর বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে রাজনীতি করতে হলে আমাদেরও তৈরী হতে হবে। নাবালকের পক্ষে যে হৈ চৈ শোভা পায়, সাবালকের পক্ষে তা সাজে না। সেইজন্য আমরা যদি নিজেদের মানুষ না করে তুলি, তা হলে এ পলিটিকস্ করতে পারব না। সুতরাং ভবিষ্যতে ভাল করে রাজনীতি করব বলেই গোড়ায় চলতি রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে মানুষ গড়ার কাজটা নিশ্চিন্তে ভালভাবে হওয়ার নিদারুণ প্রয়োজন ঘটেছে। যেমন গার্হস্থ্যের আগে বা গার্হস্থ্যের জন্যই ব্রহ্মচর্য। খুব সংকটমুহূর্তে এক-আধবার পদস্খলন হয়তো মার্জনীয়, কিন্তু তা প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হলে শক্তিক্ষয় অনিবার্য। ভবিষ্যতে যে ভয়ংকর দায়িত্ব তাদের উপর এসে পড়ছে তা গ্রহণ করবার মত শক্তি তারা অর্জন করতে পারবে? সেই কারণে, মনে রাখা দরকার মানুষ গড়ার কারখানা মানুষ লড়ার কারখানা হলে দুই-ই নষ্ট হয়। খুব গুরুতর উপলক্ষ্যে ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সেটা দৈনন্দিন ব্যাপার ঘটে ওঠা দেশের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের পক্ষে হিতকর নয়।

আজকের দিনে বাংলার সমাজচিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় সে সমাজ নিতান্তই একমুখীন। সারা ভারতবর্ষে আমাদের কালচার তো 'বাবু'-কাল্‌চার নামে মধ্যে মধ্যে আখ্যাত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ আমাদের গ্রামাঞ্চলের জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি, আর শহরে জীবিকা চাকরি। এই হল বাঙালীর মোটামুটি চেহারা। প্রত্যেক সজীব সমাজে কত রকম ধরনের লোকই থাকে! ছোট ব্যবসায়ী, বড় ব্যবসায়ী, ছোট শিল্পী, সৈন্য, যোদ্ধা—আরও কত কি। আমাদের সমাজ এখন এসব হতে বঞ্চিত। অথচ এমন এক সময় ছিল যে সময় বাংলার এই রকম বহুমুখীনতা ছিল যথেষ্ট। সে সময় বাংলায় যোদ্ধা ছিল, নৌসেনা ছিল, শিল্পী ছিল, বণিক ছিল, শ্রেষ্ঠী ছিল। তাদের বিচিত্র কর্মসমারোহে সমাজ প্রাণবন্ত থাকত। ইংরেজ সাম্রাজ্য যেমন একদিকে আমাদের অর্থনৈতিক ধ্বংস সাধন করেছে, অন্যদিকে এই আঘাতও কম প্রচণ্ড নয়। মোগল সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখানে মোগল শাসকেরাও স্থানীয় যোদ্ধা নৌসেনা ইত্যাদির উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। বস্তুতঃ মোগল সৈন্যের সব চেয়ে বিশিষ্ট সেনাবল ছিল অশ্বারোহী সৈন্য—অন্যান্য সেনা, বিশেষতঃ নৌসেনা, তাদের তেমন ভাল ছিল না। সেইজন্য অন্যান্য সেনাবলের জন্য তাদেরও স্থানীয় সেনার উপরই নির্ভর করতে হত। আর যেসব পাঠান নেতা বা স্থানীয় বড় জমিদার বা ভূঁইয়া ঐসব মোগল সেনাপতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তাঁদের সেনাবল তো সমস্তই স্থানীয় লোক হতে সংগৃহীত। ভারতচন্দ্র, যিনি মোগল সেনাপতি এবং তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট অনুচরদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনিও লিখেছেন যে প্রতাপাদিত্য

নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

তখনকার ঢালীরা সত্য সত্যই ঢাল ধরত, ঢালী কেবলমাত্র এখনকার মত উপাধিতে পর্যবসিত হয় নি। তার সঙ্গে গজসৈন্য ইত্যাদি তো ছিলই। বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় প্রতাপাদিত্য কেদার রায় প্রভৃতির অধীনে যেসব নৌসেনা ছিল তাদের মধ্যে কিছু মগ আরাকান-বাসী ও ফিরিঙ্গি থাকলেও আসল সেনারা ছিল বাঙালী।

কিন্তু অত দূর অতীতে যাবার প্রয়োজন নেই। যখন প্রবল-প্রতাপ ইংরেজের বাহুবলের কাছে বাংলার নবাবের শক্তিও সংকুচিত তখনও বাংলায় অন্ততঃ কয়েক ঘর জমিদার ছিলেন যাঁরা অকুতোভয়ে ইংরেজ-সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করার স্পর্ধা রাখতেন। Long-এর *The Social Condition of Bengal* নামক গ্রন্থ পড়লেও এর কিছু চিত্র পাওয়া যায়। ১৭৬০ সালে প্রথম খবর এল (উক্ত পুস্তক ২৩৮ পৃঃ) বর্ধমানের রাজা বিদ্রোহের চেষ্টা করছেন, তিনি পনর হাজার পাইক সংগ্রহ করছেন এবং বীরভূমের রাজার সঙ্গে এই জন্য সন্ধি করেছেন। নবাব কাশিম আলি খাঁ নিজে তাঁকে দমন করতে না পেরে কোম্পানিতে নির্দেশ দিলেন বর্ধমানের রাজাকে দমন করতে। (ঐ, ২৪১ পৃঃ)। কোম্পানি তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠালেন, কিন্তু রাজা এলেন না, আত্মগোপন করে রইলেন। (ঐ, ২৪৮ পৃঃ) বীরভূমের রাজাও নগর হতে পালিয়ে গেলেন। সুতরাং কোম্পানি সৈন্য পাঠালেন। ১৭৬১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর যুদ্ধ হল। মেজর হোয়াইট সেই যুদ্ধের যে বিবরণী কোম্পানির কাছে পাঠালেন তাতে

দেখা যায়, সে যুদ্ধ ছেলেখেলা হয় নি, বেশ রীতিমতই হয়েছিল। হোয়াইটের মতে তাঁর বিরুদ্ধে অন্ততঃ দশ হাজার লোক ছিল, তা ছাড়া অন্ততঃ দশটি কামানও ছিল। বর্ধমানের রাজা অবশ্য শেষ পর্যন্ত হারলেন। কিন্তু এই হতেই বোঝা যায়, সেকালের বাঙালীসমাজ একালের মত ছিল না।

২

বাংলার এই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, ইংরেজ সাম্রাজ্যের আঘাত দুটি পথ ধরে প্রসারিত হয়েছিল। প্রথমটি হল অর্থনৈতিক। বাংলার যেসব শিল্প ছিল সে সবই জোর করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। অপরটি হল আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে। সমস্ত জীবিকা ধ্বংস করে খোলা রাখা হল মাত্র দুটি পথ—চাকরি ও চাষ। সে চাষও আবার নিজের ইচ্ছামত নয়। চাষ করতে হবে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে—নীলের চাষ করতে হবে, কোম্পানির ইন-ভেস্টমেণ্ট মেটাবার জন্য চাষ করতে হবে, তার জন্য দাদন নিতে হবে, দাবী না মেটাতে পারলে "শ্যামচাঁদের" অত্যাচার তো আছেই। 'নীলদর্পণের' চিত্র কাউকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বস্তুতঃ এ দুটি দিকই অঙ্গাঙ্গী। একই ধারার দুটি দিক মাত্র।

বাংলায় সেই জন্য যেদিন নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন হল সেইদিনই এই দিকেও আঘাত শুরু হল। আজকাল সকলেই জানেন কর্নওয়ালিশী ভূমিব্যবস্থায় প্রজাদের চিরাচরিত স্বত্ব সমস্তই এক কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিয়ে জমিদারদের হাতে সমর্পণ করা হল। আর সেই সঙ্গেই শুরু হল জমি কেড়ে নেবার অভিযান। যেসব শ্রেণী চাষ করত না, পুলিসের কাজ করত বা সৈন্যের কাজ করত, তারা নির্ভর করত তাদের জমির উপরে। তাদের পরিবারের

গ্রাসাচ্ছাদন চলত সেই জমির আয়ে, তারা করত অন্য কাজ। কোম্পানি রাজা হয়েই নিজের পুলিস করলেন, পাইকদের তাড়িয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাদের সমস্ত জমি কেড়ে নিলেন। এই আঘাত প্রথম আসে ১৭৯৩ সালের ১ম রেগুলেশনের ৮ম অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা হতে। তারপর লর্ড হেস্টিংস ১৮১২ সালে এই ব্যবস্থাকে তীব্রতর করে তোলেন, তার জের গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। মোটামুটি বলা যায়, পঞ্চাশ বছর ধরে এই নিপীড়ন চালাতে চালাতে ক্রমে ক্রমে বাংলার জীবনরস নিষ্পেষিত করে দেওয়া হল, বাংলার সমাজজীবনে আর কোনও বৈচিত্র্যও রইল না, প্রাণস্পন্দনও রইল না।

এই অত্যাচারের নির্মমতা এবং তার বিরুদ্ধে বাঙালীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের তীব্রতা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নেই। অথচ আমরা বাংলার সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়ে এই ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে যদি এখনকার 'বাবু-কালচার' ও গ্রাম্যসমাজ কেবল এই দুটি ধারা নিয়েই আলোচনা করি তা হলে সে আলোচনা প্রকৃত আলোচনাই হবে না। বস্তুতঃ দীর্ঘ ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিকায় বাঙালী সংস্কৃতির আলোচনা করলে দেখা যাবে, মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির প্রাধান্য বাঙালীর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিতান্তই আধুনিক, সে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সমকালীন। তার অনেক কারণ ঘটেছিল। বাংলার সমাজবৈচিত্র্য গেল লুপ্ত হয়ে, লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার ধারা হল অবরুদ্ধ, সমাজের অন্য কোনও অংশের মনের দরজা খুলবার সুযোগ হল না, পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত সমাজের একদিকে যেমন আর্থিক সাচ্ছল্য দেখা দিল প্রচুর, অন্যদিকে তেমনি তারা আস্বাদ পেল পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের। ফলে তারা উন্নতির উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে, তাদের ঘটেছে বিস্ময়কর বিকাশ,—যা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথায়ও হয় নি, সম্ভবতঃ আর হবেও না। কিন্তু এই বিস্ময়কর

বিকাশ সত্ত্বেও বলতেই হবে, এ বিকাশ একপেশে। যতদিন এর প্রসার এবং বিবর্তন ঘটছিল ততদিন এর অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে আমরা অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ পাই নি। কিন্তু এখন যখনই সেই ধারাটি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে তখন অন্যদিকের ধারাটিও বুঝতে হবে, তারা কি করে মরল তার ইতিহাস জানতে হবে, তাদের পুনরুজ্জীবন কিভাবে হতে পারে সেকথাও ভাবতে হবে।

পূর্বেই বলেছি, বাংলার এইসব বীর যোদ্ধারা সহজে মরে নি। বহু প্রতিরোধ করে, বহুবার অশান্তি ঘটিয়ে শেষে ক্রমে ক্রমে চেহারা বদলাতে বাধ্য হয়েছে। এই সময় পশ্চিম বাংলার প্রান্তসীমায় কত ঘনঘন অশান্তি ঘটেছে কেবলমাত্র তার তালিকা দেখলেই এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখ করি (১) ১৭৬৯-৭৪ সালে ধলভূম রাজার বিদ্রোহ; (২) ১৭৮৩ সালে রংপুরে বিদ্রোহ; (৩) ১৭৮৯ সালে বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহ; (৪) ১৭৯৯ সাল হতে চোয়াড়-বিদ্রোহ; (৫) ১৮১৭-১৮ সালে কটকে পাইক-বিদ্রোহ; (৬) ১৮৩১-৩২ সালে কোলদের বিদ্রোহ; (৭) ১৮৩২ সালে মানভূমের গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা; (৮) ১৮৩৯ সালে বারাসতে বিদ্রোহ ; (৯) ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ। তালিকা বস্তুতঃ এর চেয়েও দীর্ঘ, মাত্র সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করা হল। এই হতেই বোঝা যায় বারবার কি অশান্ত অস্থিরতায় এইসব শ্রেণী মাথা ঠুকে মরেছে, দুর্ভেদ্য দেওয়াল টলাতে পারে নি, কিন্তু তবু আঘাত করতে ছাড়ে নি।

এইসব বিদ্রোহের মূলে কয়েকটি বড় কথা ছিল, স্থানীয় ও সাময়িক বিশিষ্টতা অনুসারে তার কিছু চেহারা-ভেদ থাকলেও তাদের মূল কাঠামোটি এক। সেইজন্য দু-একটির কথা একটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করি। চোয়াড় বিদ্রোহ অনেকদিন চলেছিল এবং ধলভূম, মেদিনীপুর এবং আশেপাশের কয়েকটি জেলা তাতে কম্পিত হয়ে

উঠেছিল। এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রাইস সাহেব যে ইতিবৃত্ত রচনা করেছিলেন তাতে এর বর্ণনা পাওয়া যায়।[১] সরকার তখন নতুন পুলিস করলেন, জমিদারদের হাত থেকে পুলিসী ব্যবস্থা কেড়ে নিলেন। ফলে পাইকদের বৃত্তি গেল। তারপর সরকার হুকুম করলেন, পাইকেরা যেসব জমি বৃত্তি হিসেবে ভোগ করত সেগুলি কেড়ে নেওয়া হোক্। এই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হতেই বিদ্রোহের সূত্রপাত। সমস্যার বিরাটত্ব বোঝা যায় যখন স্মরণ করা যায় কেবল বর্ধমান রাজ হতেই ১৯০০০ পাইক বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল। এইসব বৃত্তিচ্যুত সৈনিকেরা সুবোধ বালকের মত এক কথায় লাঙল ধরে নি। তারা বিদ্রোহের কঠিন পথই প্রথমে বেছে নিয়েছিল। যারা এই কেড়ে-নেওয়া জমির (Resumed lands) তহশিলদার হয়েছিল তারাই বারবার আক্রমিত ও নিহত হতে লাগল। সরকারের অন্য বিভাগ দোষ ফেলতে চাইলেন বোর্ড অফ্ রেভিনিউ-র উপর—কেন বোর্ড এইসব কথা না বুঝে জমি কেড়ে নেয়। কিন্তু দোষ তো বোর্ডের ছিল না, জমি কাড়া হচ্ছিল ১৭৯৩ সালের ১ম রেগুলেশনের ৮ম অনুচ্ছেদ অনুসারে। আর দায়িত্ব তো সমস্ত সরকারেরই। ভয়ে কোন কোন কলেক্টর পাইকান জমি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাবও করলেন। মেদিনীপুর শহর বারবার বিপন্ন হয়ে উঠল। শেষে দীর্ঘকাল ধরে একদিকে সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্যদিকে জমি সম্বন্ধে নানা প্রলোভন (যে প্রলোভনে চাষীরা প্রথম দিকে একেবারেই পড়ে নি) দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ শান্ত হয়। পাইকান জমি সম্বন্ধে ব্যবস্থা বদল করতে হয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের পিছনেও এই কথা তবে তখন সাক্ষাৎ অত্যাচারী সরকার ছিল না, ছিল মহাজনেরা। বহুদিনের স্বাধীন ও নির্ভীক যোদ্ধা হচ্ছে ধলভূমের অধিবাসীরা। যখন পোড়হাটের রাজাকে কোম্পানির

---

[১] *Burdwan District Handbook*, Census 1951 দ্রষ্টব্য।

অধীন করবার চেষ্টা হল এবং সেই সঙ্গে নবপ্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা সেখানে চালাবার চেষ্টা হল অমনই ঘটল কোল বিদ্রোহ। ভূমিব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টাই এর মূল কারণ। তারপরই মানভূমের ভূমিজ সম্প্রদায় করল বিদ্রোহ। তারই নাম গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা। এ সম্বন্ধে Dent লিখেছেন :

> Dissatisfaction with the administration of Law of debtor and creditor appears to have been ripe at this time in Barabhum and the sale of ancestral holdings for debt was particularly objected to as something entirely opposed to the customs of the aboriginal tenantry.

এইখানেই বিদ্রোহের মূল কারণ নিহিত।

৩

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি গানের আসরেও একদিন শক্তির মদমত্ততার বুলিই তুলেছিল। যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকেই এই বুদ্ধির উদ্ভব। মঙ্গলকাব্যের অবসানে দেখা গেল পাঁচালী। সত্যপীরের পাঁচালী, শেক-শুভোদয়ার কাহিনী। এইভাবে চলতে চলতে আমরা হঠাৎ দেখি রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্য। তার মধ্যে দেখি, পার্বতী শিবকে বলছেন,

চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।

অনেক অনুনয়ে পার্বতী শিবকে চাষবাস করতে রাজী করালেন। শিব শূল ভেঙে লাঙল গড়ালেন, ইন্দ্রের নিকট চাষভূমির পাট্টা নিলেন, কুবেরের কাছে বীজধান কর্জ করলেন, ভীম 'হালুয়া'র

(ছেলে) সঙ্গে জমি চাষ করতে গেলেন। কাহিনীটি অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। এই যুগে লোকেও শূল ভেঙে লাঙল গড়াবার চেষ্টা আরম্ভ করতে বাধ্য হচ্ছিল—তারই প্রতিফলন এই কাহিনীতে। কিন্তু সে যুগে বাংলার সমাজের যে বৈচিত্র্য ও যে স্পন্দন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভিঘাতে তা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

৪

এইসব কথা পুনরায় চিন্তা করবার প্রয়োজন ঘটেছে। তার কারণ, যে গোষ্ঠী ইংরাজোত্তর যুগে আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন সেই গোষ্ঠী আজ ক্ষীয়মাণ। তার শক্তি শেষ হতে চলেছে। পক্ষান্তরে সমাজে নতুন নতুন শ্রেণী মাথা নাড়া দিতে শুরু করেছে, সেইসব শ্রেণীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা সমাজ আর অস্বীকার করতে পারছে না। এককালে দেখা গিয়েছিল, সমাজের সকল স্তরেই সমাজস্পন্দন ছিল, সমাজে বৈচিত্র্য ছিল, আর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটা মোটামুটি সামঞ্জস্য ছিল। এই পরিবেশেই তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের মহৎ বিকাশ ঘটেছিল—বৈষ্ণব কাব্য হতে মঙ্গলকাব্য পর্যন্ত। আজ যদি আবার আমাদের সংস্কৃতিতে নব বিকাশের ধারা সৃষ্টি করতে হয়, তা হলে সমাজে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য এবং বহুমুখীনতা আনতে হবে, সংঘর্ষের বদলে সমন্বয় ঘটাতে হবে, নতুন নতুন শ্রেণীকে নব নব দিকে আত্মবিকাশের সুযোগ করতে দিতে হবে। আমাদের ঐতিহ্য সেইদিকেই ছিল। আজ সেই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। প্রাচীনের পুনঃ সংস্থাপনে তা অবশ্যই হবে না, ইতিহাসের চাকাকে কখনই উল্‌টে দেওয়া যায় না, কিন্তু এই ঐতিহ্য মনে রাখলে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির সহায়তা হতে পারে।

খাপছাড়া বাঙালী

বাঙালীর মনে প্রায় একটা অভিযোগ ঘনিয়ে উঠতে দেখা যায়ঃ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সে কোণঠাসা, সেখানে তার আর কোনও স্থান নেই। আগে বাঙালী অন্ততঃ উত্তর ভারতের সর্বত্র দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে এসেছে। শুধু সরকারের বড় চাকুরিয়া হিসেবে নয়, বড় ডাক্তার উকিল হিসেবেও সর্বত্র তার অগ্রাধিকার ছিল। তার উপর সবচেয়ে বড় কথা, অখিল-ভারতীয় রাজনীতিতে তার স্থান ছিল সর্বপ্রথম। সারা ভারতের চেতনাসঞ্চার ও রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে বাঙালীই প্রথম স্থান অধিকার করে ছিল, তার নেতৃত্ব ছিল অবিসম্বাদিত। আজ বাঙালী সেই আসন হতে চ্যুত হয়েছে। তার এমন কোনও নেতা নেই যাঁর কম্বুকণ্ঠ সারা ভারতের আকাশময় গমগম করে বাজে, যাঁর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। বেশী দূরের কথা কি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তেমন-ভাবে আসন নেবার উপযুক্ত বাঙালীই আজ বেশী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ভারতীয় জনগণের নেতৃত্ব তো দূরের কথা। অন্যান্য প্রদেশেও এখন শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হয়েছে, সেখানে আর উকিল ডাক্তারের অভাব নেই। সুতরাং সেখানেও বাঙালীর স্থান স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত হয়ে এসেছে। তার উপর শুধু বাইরের মার নয়, ঘরেও বাঙালী মার খেয়েছে প্রচণ্ড। বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফল সকলেই উপলব্ধি করছেন। বাঙালী তার সভ্যতা সংস্কৃতি ও বিশিষ্টতা নিয়ে যে অখণ্ড সত্তায় বর্ত্তমান ও বর্ধমান ছিল, আজ তার মূলে আঘাত লেগেছে। একদিকে ছিন্নমূল পথাশ্রয়ী বাস্তুহারার দল, অন্যদিকে জনভার-প্রপীড়িত সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। এতে সংস্কৃতি বাঁচবে কী করে? জাতের মধ্যে ক্ষমতাবান শক্তিশালী নেতার উদ্ভবই বা হবে কেমন করে? প্রচণ্ড আঘাতে যে-জাত মুহ্যমান, কোনরকমে

জীবনরক্ষা করতেই ব্যতিব্যস্ত, যারা ভিক্ষাপাত্র হাতে ভারতের প্রান্তেবাসী হয়ে আছে, তারা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব করবে কেমন করে ?

বস্তুতঃ গত শতাব্দীর তুলনায় এ-শতাব্দী বাঙালীর হটে আসার যুগ—সেকথা প্রমাণ করবার জন্য কোনও বিস্তারিত তর্কের আবশ্যক করে না। বাঙালীর মনে একটা অভিমান আছে—সারা ভারত বুঝি তার উপর অকরুণ, সকলেই বুঝি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, তাই তার ভাষা নির্যাতিত হচ্ছে, রাজনীতিতে সে উপযুক্ত মর্যাদা পাচ্ছে না, ব্যবসার ক্ষেত্রে তার স্থান নেই, অন্য প্রদেশ থেকে সে বিতাড়িত হচ্ছে। এরকম দুঃসময়ে এই ধরনের অভিমান হওয়া বিচিত্র নয়, দু-এক ক্ষেত্রে এরকম অভিমানের হয়ত কিছুটা সংগত কারণও থাকতে পারে। কিন্তু আজ এই কঠিন সংকটের মধ্যে শুধু অভিমান করে সারা ভারতের উপর দোষারোপ করে বসে থাকা কোনও কাজের কথা নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায়, সারা ভারতই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তই করছে, তখনই ভাবতে হবে, শুধু বিহার নয়, উত্তর প্রদেশ নয় বা শুধু উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতও আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে কেন ? সারা ভারত আর কারও বিরুদ্ধেই বা চক্রান্ত করছে না কেন ? সকলেই বেছে বেছে কেবল বাঙালীরই বিরুদ্ধে লাগবে, তারই বা হেতু কী ? শুধু কি এটা নিছক চক্রান্ত ? এসব কথা গভীরভাবে না ভেবে বাঙালী যদি অভিমানভরে অপরকে দোষ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে এবং সকল দায়িত্ব সেইখানেই শেষ করে দেয়, তা হলে বাঙালীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। সুতরাং এই প্রশ্ন খুব গভীরভাবে বিবেচনার সময় এসেছে।

এই প্রসঙ্গ খুব বড় প্রসঙ্গ, স্বল্প পরিসরের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ শেষ হবার নয়। কিন্তু একটা মৌলিক কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল, সবাই বাংলার বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে,

ইতিহাসের গভীর কারণ না থাকলে এরকম হতে পারে না, হলেও সফল হয় না। একটা জাত ওঠে একটা জাত পড়ে—এ কি শুধু চক্রান্তের ফল? ইংরেজের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সময় হতে হিটলারের সময় পর্যন্ত কত চক্রান্তই তো হয়েছে, কিন্তু সেইসব অত্যন্ত শক্তিশালী চক্রান্তও সফল হয় নি কেন? টয়েনবী তাঁর সুবিখ্যাত আলোচনায় সভ্যতার উত্থানপতনের যেসব মৌলিক কারণ নির্দেশ করেছেন এবং উদাহরণ দেখিয়েছেন তা হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এই উত্থান-পতনের পিছনে কতকগুলি গভীর কারণ আছে। সেইসব কারণ না থাকলে শুধু চক্রান্ত বা শুধু সাহায্যের জোরে পতন-অভ্যুদয় ঘটে না। যেটা বাহ্য সেইটাকেই আন্তর বলে মনে করলে আমরা আসল কারণে পৌঁছতে পারব না এবং উদ্ধারেরও পথ খুঁজে পাব না। সুতরাং একটু গভীরে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

এই গভীর কারণগুলি কী? বর্তমান প্রবন্ধে তার বিস্তারিত আলোচনা না করে মাত্র দুটি তিনটি কথার উল্লেখ করব। প্রথমেই অবশ্য বলা যায় যে, সমাজের গতি সাধারণতঃ চংক্রমণ-গতি; ঘুরে ঘুরে সে চলে, কিছুটা অগ্রসর হবার পর আবার সাময়িকভাবে তাকে পিছু হটতে হয়, আবার সে কালে এক ধাপ এগিয়ে উপরে ওঠে। অবিচ্ছিন্ন ঊর্ধ্বরেখায় অগ্রগমন সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ চেহারা নয়। নতুন অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হবার আগে তাকে কিছুকাল মাটির গভীরে লুকিয়ে থাকতেই হয়। সে হিসেবে উনিশ শতকের আশ্চর্য বিকাশের পর বাঙালীসমাজ যদি কিছুকালের জন্য সবদিকে স্তব্ধ হয়ে থাকে, সেটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়। বাঙালীচিত্ত এতকাল ধরে এত আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছে যে, কিছুদিনের জন্য চিত্তক্ষেত্রের বিশ্রাম

প্রয়োজন হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি আবার সেরকম ফসল সে ফলাতে পারবে না। নতুন সৃষ্টির শক্তি সঞ্চিত হবার জন্য কিছু সময় চাই। সে হিসেবে হয়ত বলা চলে, বাংলার এই পশ্চাদপসরণ সাময়িক, কালে আবার নতুন ফসল ফলবে।

এ-কথাটার মধ্যে সত্য নেই তা নয়, অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু এই কথাটাই যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে হয়ত চিন্তার কিছু ছিল না। আশ্বাস থাকত কিছুকাল পরে বাঙালীচিত্তে আবার অজস্র ফসল ফলতে থাকবে এবং তার ফলে সে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ আস্থা রাখা কোনও কাজের কথা মনে হয় না। যুগে যুগে দেশে দেশে এমন উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখা গিয়েছে, যাকে সাময়িক বিরতি বলে মনে হয়েছিল তা আসলে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব। এক-একটি সভ্যতাও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যায়। বিশেষতঃ ইতিহাস দাঁড়িয়ে থাকে না, তার গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র। একটি সভ্যতা সাময়িকভাবে ফসল ফলাতে পারছে না বলে তার উপর কৃপা করে অন্য সকলে চুপ করে বসে থাকবে না, তারা চলতে থাকবে। আর এই নতুন সভ্যতা যদি পূর্বের সভ্যতার চেয়ে উচ্চতর সভ্যতা হয়, তা হলে জগতের চেহারাই যাবে পালটে, নতুন সভ্যতাই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে এবং পুরনো সভ্যতা আর কোনকালেই মাথা তুলতে পারবে না। সুতরাং বাঙালীচিত্তের সাময়িক কর্মবিরতি বলে এখন চুপ করে বসে থাকা অনায়াসেই চলত যদি ইতিহাস সচল বস্তু না হত। কিন্তু যদি চার-পাশের ভারতবর্ষ চলতে থাকে, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে এবং তার ফলে ভারতবর্ষের ধারাটাই যায় পালটিয়ে অথচ সে-সময়ে নতুন যুগে বাঙালী যদি আবার নতুন তেজে অগ্রসর না হতে থাকে, তা হলে আশঙ্কার কারণ ঘটে বৈকি।

সেইজন্য বাঙালীর বর্তমান অবস্থা এবং বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

ভাবতে গেলে ইতিহাসের এই গভীর গতির সঙ্গে মিলিয়েই ভাবতে হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে ইতিহাসের দুটি কথার মাত্র অবতারণা করতে চাই।

৩

তার মধ্যে প্রথম কথা হল বাঙালী চিরকালই খাপছাড়া। শুধু একালে নয়, প্রাচীনকালেও অনেক সময়ই দেখা যাবে সারা ভারতবর্ষ যা ভাবছে বাঙালী তা ভাবছে না, বরং আলাদা কিছু ভাবছে। আর্যাবর্তের বাইরে এই বাংলা দেশ, এখানে এলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল, উত্তর ভারতের সভ্যতার সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল কম। তার উপর বাংলা ছিল শবর চণ্ডালদের দেশ—এমনই দেশ যে, ইতিহাসের সুদূর কাল দূরে থাক, অপেক্ষাকৃত একালেও বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য আচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদিশূরকে পশ্চিম হতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল। নানা জাতির সংমিশ্রণে এই দেশ; এখানকার সমাজ আলাদা, কৌমপ্রথা আলাদা, আচার ব্যবহার আলাদা। অনার্য জাতি, পীতমঙ্গোল জাতির সঙ্গে অবিরত সংযোগ ঘটেছে এদেশে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ-কাঠামোর সঙ্গে অবিরত যুক্ত হচ্ছে আদিম সমাজের কাঠামো। সুতরাং আশ্চর্যের কথা কি, এই প্রাচ্য প্রত্যন্ত থেকেই যত প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের উদয় হবে—বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম। এ-ও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পরে এই দেশেই বৌদ্ধ ধর্মের এক ধারা শেষ পর্যন্ত তান্ত্রিকতার সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান স্রোত হয়ে দাঁড়াল; (যখন সারা ভারতে শংকরের নেতৃত্বে বৌদ্ধ বিতাড়নের পর বেদান্ত ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, তখন বাংলায় কিন্তু তা হল না, বাংলায় আরও বহুকাল বৌদ্ধ ধর্মের জের রয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত অভ্যুত্থান হল বৈষ্ণব ধর্মের।) অথবা

এখানে যখন বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান হবে সে ধর্ম ভাসিয়ে দেবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর বর্ণ-শাসনকে, টেনে নেবে শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিকে। এ-ও বা আশ্চর্যের কথা কি যে অন্যত্র চলে প্রাচীন ন্যায়, কিন্তু এখানে চলবে নব্যন্যায়—অন্যত্র চলে অন্য স্মৃতি কিন্তু এখানে চলবে রঘুনন্দনের স্মৃতি; অন্য জায়গায় বেশী চলবে বেদ-বেদান্তের চর্চা, এখানে চলবে কাব্য ব্যাকরণের; অন্য জায়গার প্রধান উৎসব হবে গণেশ বা রামচন্দ্রকে নিয়ে, অথচ এখানে হবে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, যার প্রচলন উত্তর ভারতের অন্যত্র কোথায়ও বিশেষ নেই। এই বিশেষভাবে স্বতন্ত্রভাবে ভারতের প্রধান ধারা হতে বিযুক্ত হয়ে নিজের মতো চিন্তা করা বাংলার বহুকালের অভ্যাস। বস্তুতঃ এটা শুধু অভ্যাস নয়, বাংলার সমাজ-গঠন ও তার উপাদানগুলির সংমিশ্রণ, তার সাংস্কৃতিক পটভূমিকা, তার আবহাওয়া—সবই তার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যের কারণ ও কার্য হয়ে এসেছে। সেইজন্য এখানে সব সময়েই দেখা যাবে, সারা ভারত যে পথে চলছে, বাংলা প্রায়ই সে পথে চলছে না। আর বিদ্রোহের যা চিরাচরিত লক্ষণ তা হল, গোড়ায় তা অত্যন্ত ব্রিলিয়াণ্ট হয় (হতেই হবে, তা না হলে প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে কী করে?), কিন্তু সব সময় বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

এই পটভূমিকায় উনিশ শতকের বাঙালীর কথা ভাবা যাক। ঐরকম অভ্যাস তার মজ্জাগত ছিলই। তার উপর বাংলার তটভূমিতেই আছড়ে পড়ল পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউ। আনল নতুন চিন্তার ধারা, সন্ধান দিল নতুন জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজত্বের—প্রতিষ্ঠিত করল যুক্তির রাজত্ব, আস্বাদ আনল চিন্তার স্বারাজ্যের। ভট্টাচার্যের বিধান কেবল ভট্টাচার্যের বিধান বলেই মেনে নেব না, তাকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নেব। দি এজ অব রীজ্‌ন-এর সূত্রপাত হল—যে এজ অব রীজ্‌ন দেখা না দিলে আধুনিক যুগের সূচনা হয় না কোনও দেশেই।

এই নূতন ভাবধারা আমাদের চিন্তাজগতে যে আলোড়ন তুলল, তা বাংলায় শুধু প্রথম বলেই প্রবল তাই নয়, বাংলার চিত্তও তার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবহাওয়া অনুকূল ছিল।

এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে, বেশি কথা বিস্তারিত বলবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, যখন সারা ভারতবর্ষ পুরনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল, ইংরেজরা তাতে আঘাত করলে ধর্ম নষ্ট হল বলে আহত হচ্ছিল, সে সময় বাংলা দেশ সেইসব সংস্কারকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে নতুনকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে উন্মুখ হয়েছিল। এক হিসেবে বলা যায়, গোটা উনিশ শতক যদি বা না হয়, উনিশ শতকের প্রথম তিন পাদ তো নিশ্চয়ই, বাংলার একাগ্র সাধনাই ছিল কী করে নতুনকে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজে ও জীবনে গ্রথিত করা যায়। কোনও সময় সে নতুনের আগ্রহে আত্মহারা হয়ে পুরনোকে সবলে অস্বীকার করেছে, তার মধ্যে কিছুই ভাল দেখতে পায় নি, সম্পূর্ণ ভেসে গিয়েছে নতুনের টানে। সমাজে এর উদাহরণ ইয়ংবেঙ্গল দল। সাহিত্যে এর কিছুটা প্রতিফলন মাইকেল মধুসূদনের কাব্য। নায়ক রাম নয়, রাবণ। সে বিদ্রোহীদের নেতা। তাঁর ছন্দ বাঁধন ভেঙে প্রবল কল্লোলে প্রবাহিত হল। এমন ব্যাকরণ ব্যবহার করলেন যাতে পণ্ডিতেরা বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। পণ্ডিতদের উপর মাইকেলের কটাক্ষের অন্ত ছিল না। আবার কোন সময় দেখি দুয়ের সমন্বয়সাধনার প্রাণপণ প্রয়াস। পুরনোকে কুসংস্কার বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে নয়, পুরনোকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করে তার মধ্য দিয়েই নতুনকে প্রতিষ্ঠিত করে। এর চরম উদাহরণ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বললেন না স্মৃতি কিছু নয়, কিন্তু সেই স্মৃতি থেকেই এক বিধান বার করে বিধবা-বিবাহ চালু করে দিলেন। শাস্ত্রে হয়ত চিরকালই আছে কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ, কিন্তু সে বচন মানত কে? মেয়েরা চিরকালই তো অজ্ঞানের অন্ধকারে

কুসংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতেন। কিন্তু পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর আবার সেই শাস্ত্রবচনের উদ্ধার করলেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করলেন। আসলে তখন সামাজিক প্রয়োজন ঘটেছিল স্ত্রীশিক্ষার—সেটা চালু করতেই হবে। ইয়ংবেঙ্গলের দল হলে খোঁজ করবার দরকারও মনে করতেন না শাস্ত্রে কী আছে। বিদ্যাসাগর সেই প্রবল সামাজিক প্রয়োজনকে অনুভব করেছিলেন বলেই এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্র-বচন খুঁজে বার করতেও ভোলেন নি। আর এক সমন্বয় বঙ্কিমচন্দ্র। কোঁত মিল এবং কৃষ্ণচরিত্র, এ-সবেরই তিনি পুনর্বিচার করেছেন সে যুগের সামাজিক প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে। বস্তুতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি এতদূর অগ্রসর ছিলেন বলেই যখন মার্কস যুবা, তাঁর লেখা কেউ পড়ে নি, সে সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের হাত দিয়ে "সাম্য" ও "বঙ্গদেশের কৃষক" বেরিয়েছিল।

বস্তুত বাংলাদেশের উনিশ শতকের ইতিহাসই তাই। নতুন যুগের প্রথম প্রশ্ন তোলেন রাজা রামমোহন। হিন্দুধর্মটা কী? সে কি শুধু ভট্টাচার্যের বিধানের পাতাতেই আবদ্ধ? শুধুই প্রচলিত সংস্কারের বেড়াজাল? না, তার পিছনে কোনও শাস্ত্র আছে? থাকলে সেই শাস্ত্রেরই পুনর্বিচার করি না কেন? এই হতেই বৈদান্তিক সূত্রের প্রতিষ্ঠায় তিনি তৎপর হলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাহিনীই বা কী? অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাঁর যেমন বিশিষ্ট স্থান আছে (সে-কথা পরে বলছি) তেমনি চিন্তার রাজ্যেও তাঁর স্থান আছে। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন এদেশের লোক। প্রেসিডেন্সী কলেজ হয়েছিল বাঙালীর আগ্রহে। ইংরেজী সংস্কৃতের ঝগড়ায় ইংরেজীর পক্ষে প্রথম ওকালতি করেছিলেন কোনও ইংরেজ নয়, তাঁরা বরং সংস্কৃত পঠন-পাঠন ও টোল-পাঠশালার বদলে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করতে ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু কারা বারবার ইংরেজীর জন্য ইংরেজকে তাগিদ দিচ্ছিলেন? সে বাংলারই চিন্তা-

নায়কেরা। সতীদাহ বন্ধ করতে ইংরেজ প্রথমে সাহসী হয় নি, কিন্তু সতীদাহ বন্ধ করার আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে দাঁড়ান রামমোহন ও দ্বারকানাথ।

এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মোদ্দা কথাটা হল, ভারতবর্ষের মুখ যখন একদিকে ফেরান ছিল, যখন সে অতীতকেই আঁকড়ে ধরে বসে ছিল এবং কালের ধাক্কায় সেই অতীতের এক-একটা অংশ খসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে 'গেল গেল' 'সব গেল' বলে আর্তনাদ করছিল, তখনই বাংলা-দেশের চিত্তক্ষেত্রে নতুন যুগের নতুন চিন্তাধারার গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে প্রবল হতে প্রবলতর আকার ধারণ করেছে। আমি অন্যত্র[১] বলবার চেষ্টা করেছি যে, সিপাহীবিদ্রোহে উত্তর ভারত সাড়া দিলেও বাঙালীমন বিশেষ সাড়া দেয় নি। অথচ বাঙালী তার আগে বহুদিন হতেই সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল, যে সংগ্রাম পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় ফিউড্যাল নয়, যার মধ্যে বর্তমান-কালের চেহারার আভাস পাওয়া যায়। যথা পাইক বিদ্রোহ (১৭৯৯), বিষ্ণুপুরের বিদ্রোহ (১৭৮৯), সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রংপুরের বিদ্রোহ (১৭৮৩ সন) ইত্যাদি। তা ছাড়া গত শতকে বাংলার কৃষকদের সব চেয়ে বড় আন্দোলন নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেই প্রবলপরাক্রান্ত এবং শাসকশক্তিসমর্থিত নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক রুখে দাঁড়িয়েছিল, যার খবর ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় লেখা হয়ে রয়েছে। শুধু কি তাই? কর্মের ক্ষেত্র বাদ দিয়ে যদি চিন্তার ক্ষেত্র আলোচনা করা যায়, তা হলেও দেখা যাবে, সেখানেও নতুন যুগের চিন্তাধারা দেখা যাচ্ছে। ১৮৬৬ সনের হিন্দু মেলা ; রাজনারায়ণ বসুর রচনাবলী ; বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের

---

১ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবস-সংখ্যা, "বাঙালী-মন ও সিপাহীবিদ্রোহ" প্রবন্ধ।

উদ্দীপ্ত ইঙ্গিত ; বিদ্যাসাগর কর্তৃক বেদান্তপাঠের পরিবর্তে ইংরেজী পড়ানোর আগ্রহ ; সুরেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা—এইসব উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়, বাংলার চিন্তাধারা ও কর্মধারা যে পথে চলেছিল সে পথ পিছন দিকে ফিরে যাবার নয়, সে-পথ সামনের দিকে। তা না হলে ভারতের অন্য কোথায়ও এমনটি ঘটেছে কি যে, স্বামীজীর মত একজন বৈদান্তিক পর্যন্ত মায়া-প্রপঞ্চ আর সোঽহংতত্ত্বে ডুবে না থেকে বললেন দরিদ্রনারায়ণের কথা চিন্তা করো ?

সুতরাং আধুনিক চিন্তাধারা ও কর্মধারা বাংলাদেশেই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, যে সময় ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে তার বিশেষ কোনও চিহ্ন তো ছিলই না, অতীত যুগের মোহই খুব বেশী পরিমাণে তাদের মন ভুলিয়ে রেখেছিল। কাজেই পূর্বেও যেমন ভারতবাসী হতে অনেকখানি স্বতন্ত্র হয়ে বাঙালী চিন্তা করে এসেছে, এবারও তেমনি স্বতন্ত্রভাবেই বাঙালী চিন্তা করতে শুরু করল। কিন্তু এবার একটি তফাত ছিল—এবং সেই তফাত ছিল বলেই বাঙালী তখন সর্বভারতের নেতা হয়ে উঠেছিল।

সে তফাতটা কী ? সে তফাতটা হচ্ছে এই যে, পূর্বে পূর্বে বাঙালী যখন প্রোটেস্টান্ট হয়েছে তখন সে তা হয়েছে নিজের সামাজিক প্রয়োজনে, ভারতবর্ষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়। কিন্তু এবার সে যে পথে চলছিল কালক্রমে তাতে সে ভারতবর্ষের—সারা ভারতবর্ষের—সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার একমাত্র নেতা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। কারণটা অত্যন্ত সহজ। অতীতের দিক্ থেকে ভারতের মুখ যেমন যেমন ভবিষ্যতের দিকে ফিরতে লাগল, তেমনি তেমনি সে আধুনিক চিন্তাধারায় ও কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ হতে লাগল। সে সময় বাংলার পক্ষে নেতৃত্ব পাওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ সেই পথে বাংলাই অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। তাই যখন স্বদেশী

আন্দোলন শুরু হল, তখনও অখিলভারতীয় কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পালা কাটিয়ে ওঠে নি, কিন্তু বাংলাদেশেই শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে বিপ্লবের বহ্নি প্রথম জ্বলে উঠেছিল। এই পটভূমিকা মনে রাখলে সেই বহ্নি যে ব্যাপকভাবে বাংলাতেই প্রথম জ্বলল, সেটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়।

এ পর্যন্ত তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, তার নিজস্ব সামাজিক ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে বাঙালী বেশিরভাগ সময়ই স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে এসেছে। কখনও কখনও সে সারা ভারতের নেতৃত্ব হয়ত পায় নি, কিন্তু সারা ভারতের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সে নিজের চিন্তা-ধারাকে রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠিতও করতে পেরেছে। আবার যখন ইতিহাসের ঘটনাচক্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সারা ভারত পরে যে পথে চলবে, যে চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হবে, বাংলা অনেক পূর্ব হতেই তার অনুশীলন করে আসছিল তখন বাংলা স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। সে ভারতের চিন্তা-ধারায় আত্মবিলোপ করে নি, সারা ভারতই তার চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে।

এখন তা হলে শেষ কথায় আসা যাক। তাই যদি হবে, তা হলে বাঙালী আজ পিছিয়ে পড়ছে কেন? এখনকার অবস্থার কারণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আর একটি কথা বুঝতে হবে। সে-কথাটি হল অর্থনীতির কথা। সে-কথাটি না বুঝলে বিশেষ করে এ যুগের কোনও প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে আগের যুগে সারা ভারতের অর্থনীতির একটা মোটামুটি সর্বজনীন প্যাটার্ন ছিল। এক এলাকার সঙ্গে অন্য এলাকার বিশেষ কোনও তফাত ছিল না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে ভারতবর্ষ যখন সংযুক্ত হয়ে পড়ল, দেশে রেলগাড়ি চলতে লাগল, এক জায়গার জিনিস বহুদূরের বাজারে গিয়ে বিক্রি হতে লাগল, সাগরপারের সঙ্গে

বাণিজ্য চলতে শুরু হল, এ-দেশের টাকা বিদেশে চলে যেতে শুরু হল, দেশে কিছু কলকারখানাও স্থাপিত হতে লাগল তখন দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন অর্থনৈতিক চেহারা দেখা দিতে শুরু হল। পূর্বে সব জায়গাতেই অর্থনৈতিক চেহারা ও তাগিদ প্রায় একই রকম ছিল বলে হয়ত সেটাকে সমান ধরে নিয়ে কেবল সামাজিক-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলেই সে এলাকার বিশিষ্টতার সন্ধান মিলত। কিন্তু এখন আর তা রইল না, কেননা এই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড ধাক্কায় এক এক জায়গার চেহারা এক একরকম হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং এ-কালের কোনও আলোচনায় সামাজিক-ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার সঙ্গে অর্থ-নৈতিক কাঠামো এবং তার ইঙ্গিতও আলোচনা না করলে বর্তমানের কোনও অবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝতে পারা যাবে না।

উনিশ শতক বাংলার পক্ষে সত্যসত্যই সুবর্ণযুগ। পূর্বেই আলোচনা করেছি, সে-সময় চিন্তারাজত্বে বাংলা নায়কত্ব করছিলই। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনাবিন্যাসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রও তার চরম সহায় হয়েছিল। এই দুয়ের আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছিল বলেই উনিশ শতকে বাংলা এত বড় হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছুটা সুফল বাঙালীও প্রথম দিকে পেয়েছিল, কারণ তখন কিছু বাঙালী স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসাও করত। রামদুলাল সরকারের জাহাজ অতলান্তিক সমুদ্রেও পাড়ি দিত বলে জনশ্রুতি আছে। প্রিন্স দ্বারকানাথের ইতিহাস কী? দ্বারকানাথ নিজে একজন ব্যারিস্টারের কাছে আইন পড়েছিলেন। অনেক রাজা-মহারাজার ল-এজেণ্ট ছিলেন। কিছুকাল নিমকীর দেওয়ানি করলেন সরকারের অধীনে; তার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেন। সে ব্যবসা কিন্তু সেকালের প্রচলিত মুৎসুদ্দিগিরি নয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র দ্বারকানাথের জীবনীতে লিখেছেন, Before his

(i.e. Dwarkanath's) time the *ne plus ultra* of opulent natives in the mercantile line was to serve as Banians to European firms. Their commercial aspiration went no further than to supply funds to *Belati kooties*, obey their behests as *moochhuddes*, and pocket the *dustoree*. It never entered into their heads to launch into speculation or make shipments on their own account. The idea of "no venture, no gain" was considered by them as frought with imminent danger ; safety and slavery were their motto........ Dwarknath established the firm of Messrs. Carr, Tagore and Co....Hence no small credit was due to Dwarkanath for thus setting up as an independent merchant. এই ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করলেন। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা যুক্তভাবে চালাতে লাগলেন। তার সঙ্গে তাঁর নীলের কারখানা ছিল বিভিন্ন জায়গায়, বহরমপুরে ছিল রেশমের কারবার, রামনগরে চিনিকল ছিল। তা ছাড়া জমিদারি তো ছিলই। নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় ভারতবর্ষের ভাগ্যে যদি কিছুটা সুযোগ মিলেছিল, সে সুযোগ তখনকার বাঙালীরা যথেষ্ট গ্রহণ করেছিল। সুতরাং তখন চিন্তার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অর্থনীতির—নব অর্থনীতির—ক্ষেত্রেও বাঙালীর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যের আক্রমণ এ-দেশে কঠিন হতে কঠিনতর হবার সঙ্গে সঙ্গে এসব সুযোগ বাঙালীর ক্রমে কমে গিয়েছিল এ-কথা সত্য, কিন্তু কমতে কমতেও কিছুটা সুযোগ বাঙালী অনেকদিন পেয়ে এসেছে যা ভারতবর্ষের অন্যত্র ঘটে নি। মোটামুটি বলা যায়, এইরকম স্বাধীন ব্যবসায়ের পর্যায় ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে এলে

তখনও বাঙালী অনেকদিন বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিগিরি করে এসেছে। তৃতীয় পর্বে অভ্যুদয় হল চাকরির। বড় চাকরি ছোট চাকরি। ডেপুটিগিরি হতে কেরানীগিরি। তার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর নানান পেশা। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার। অন্য প্রদেশে তো তখনও ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহই দেখা যায় নি, স্যার সৈয়দ আহমেদ হয়ত মুসলমানদের কিছুটা উপদেশ দিতে শুরু করেছেন ইংরেজীর জন্য। কাজেই যখন কবরেজি হাকিমির উপর বিশ্বাস চলে গেল, ফারসীদুরস্ত উকিলেরা অচল হয়ে গেল, ইংরেজী আইনের নীতিতে এখানকার আইন গড়ে উঠল, তখন এই ইংরেজীনবিশদেরই ডাক পড়ল। সুতরাং সেকালে এ-ক্ষেত্রেও বাঙালী যে অন্ততঃ সারা উত্তরভারতে নেতৃত্ব করবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক।

৫

আজ বাঙালী মার খাচ্ছে তার দুটো বড় কারণ আছে। অন্যান্য ছোট কারণগুলি আপাততঃ বাদ দিচ্ছি। তার প্রথম বড় কারণ হচ্ছে, চিন্তাজগতে বাঙালীর মনের ধারা একটা মোড়ের মাথায় থমকে এসে দাঁড়িয়েছে। জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি সময়ে যেমন জল স্থির হয়, মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিও খায়, বাঙালীর মনের ধারারও এখন খানিকটা সেই রকম অবস্থা। উনিশ শতকে যে কয়েকটা বড় জিনিসকে ভিত্তি করে তার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, এবং যে সামাজিক পরিবেশ সেই বিকাশের পথে সহায় হয়েছিল, এখন সে-সমস্তই নিঃশেষিত ও রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে আর অগ্রসর হওয়া চলছে না। এখন নতুন সমাজ-কাঠামোর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ না হলে পরবর্তী যুগ আরম্ভ হবে না। এবং বলা বাহুল্য, সে উন্মেষ হতে দেরি হবে, কেননা এখন আর মধ্যবিত্তের সে অবস্থা

নেই। ম্যান্‌হাইম প্রমাণিত করেছেন, মধ্যবিত্তই চিন্তাধারার পথিকৃৎ এবং মধ্যবিত্ত না থাকলে নব নব চিন্তাধারার উন্মেষের দেরি হয়। বাংলায় আজ মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তাদের পক্ষে এখনই চিরাচরিত চিন্তানায়কত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্য বাংলা ও বাঙালী কিছুকাল ধরে চিন্তাধারায় ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে, সামনে এগোচ্ছে না। অন্যান্য প্রদেশে এখন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ছে এতকাল বাদে গড়ছে, যা বাংলায় গত শতকে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং সারা ভারতে সেই মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে, কারণ সারা ভারতে সামাজিক কাঠামোর যে-ভাবে বিকাশ হচ্ছে তার সঙ্গে তাদের বিরোধ তো নেই-ই, বরং তারা সেই বিকাশেরই সৃষ্টি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। ভবিষ্যৎবাণী কখনই নিরাপদ নয়, ভুল হতে পারে। তবুও চারপাশের অবস্থা দেখে একটা কথা মনে হয়। বাংলায় মধ্যবিত্ত এককালে খুব সুস্পষ্ট এবং প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল, কালের অমোঘ নিয়মে তা এখন সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে যাচ্ছে। অন্যান্য প্রদেশে সে-সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি, এখন হচ্ছে। কিন্তু এখন যে মধ্যবিত্তশ্রেণী অন্যত্র দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর কিছুটা পার্থক্য আছে। বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীর দল, সেজন্য তাদের নেতৃত্ব তাদের বিত্তের উপর নির্ভর করত না। বিত্ত যে কিছু ছিল না তা নয়, কিন্তু বুদ্ধির কথাটাই ছিল বড়। কিছুকাল আগের বাংলার কথাই ধরা যাক না কেন। বৈকুণ্ঠ সেন, অম্বিকা মজুমদার, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি এক এক দিকপাল বাংলার এক এক প্রান্তে বসে ছিলেন যাঁদের কথায় সেইসব প্রান্ত উঠত বসত। এখন হয়ত তাঁদের চেয়ে বিত্তশালী উকিল বা শিক্ষকের অভাব হবে না, এখন হয়ত ধনী ব্যবসায়ী বাঙালীও খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের মত প্রভাব কি এঁদের আছে? অন্য প্রদেশে যে মধ্যবিত্তের উদয় হচ্ছে দেখছি তাতে বুদ্ধির

স্থানও আছে, কিন্তু বিত্তের উপর ঝোঁকও প্রচুর। প্রধানতঃ বুদ্ধির নেতৃত্ব না থাকলে বিত্তের নেতৃত্ব কিছুকাল চলতে পারে বটে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তা ছাড়া একথাও ঠিক যে, অনুন্নত দেশ ভারতবর্ষে যে অর্থ-নৈতিক সংঘাত আরম্ভ হয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত, বিশেষতঃ বিত্তাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের রাজত্ব শেষ পর্যন্ত হয়তো ভেঙে যেতে বাধ্য। বাংলায় আগে গিয়েছে, অন্যত্রও পরে যাবে। তলার শ্রেণীগুলিরও চেতনা জাগরিত হচ্ছে, তারাও বাবুমশায়দের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই অবস্থা হলে কে নেতৃত্ব করবে, কোন পথে ভারতবর্ষের বিকাশ হবে সে-কথা ভাবতে হবে। সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা ঠিক নয় কিন্তু হয়তো বলা যায় যে, সেই অবস্থার জন্য আগে থেকে যদি কেউ মহড়া দিতে আরম্ভ করে থাকে—সে এই বাংলাদেশই, কারণ যা ভারতবর্ষে দুদিন পরে ঘটবে এখন থেকেই বাংলায় তা ঘটেছে। বাঙালী যদি আত্মহারা ও দিক্‌ভ্রান্ত না হয়ে সেই ভবিষ্যৎ কালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে, নতুন সমাজের সম্বন্ধে চিন্তাধারা সুস্পষ্ট ও কার্য-ক্রম স্থির করতে পারে তা হলে সারা ভারতে যেদিন সেই অবস্থা ঘটবে তার নেতৃত্বের জন্য আহ্বান বাঙালীর কাছে এসে পৌঁছবেই।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। সেটা অর্থনীতির কথা। পূর্বেই বলেছি, গত শতকে যখন বাঙালীর বিকাশ হয়েছিল তখন চিন্তাধারা এবং অর্থনীতি উভয়েই তার বিকাশের সহায় হয়েছিল। এখন অবস্থাটা কি? চিন্তাধারার বিপর্যয়ের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাও বাঙালীর বিকাশের সহায়ক নয়।

গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষ নিজস্ব ধনতান্ত্রিকতার পথে যাত্রা করে নি। তখন এ-দেশে বৈদেশিক ধনতান্ত্রিকতার একচ্ছত্র আধিপত্য, তারই উচ্ছিষ্ট খুদকুঁড়ো পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। তার উপর বাঙালীর

ব্যবসা-পর্যায় শেষ হয়ে গিয়ে সে যখন চাকরির পর্যায়ে প্রবেশ করল তখন থেকে সে ভারতীয় ধনতান্ত্রিকতার পথ হতে সম্পূর্ণ সরে গেল। একদিকে কিছু বুদ্ধিজীবীর পেশা, অন্যদিকে কৃষি—বিদেশী ধনতান্ত্রিকতার এই চরম ফল এদেশে ফলল। কাজেই কালচক্রে যখন স্বদেশী ধনতন্ত্রের সঙ্গে বিদেশী ধনতন্ত্রের রফা করবার দরকার হল তখন তার আসন প্রতিষ্ঠিত হল বোম্বাইয়ে—কলকাতায় নয়।

ভারতবর্ষে ধনতন্ত্র জন্ম হতেই বিকলাঙ্গ। মার্ক্স যে বলেছিলেন ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যে-সময় ধনতন্ত্রও একটা বৈপ্লবিক অংশ গ্রহণ করে, সে চেহারা তার এদেশে কোনকালেই দেখা যায় নি। অন্য দেশের মত সে এদেশে তীক্ষ্ণ আঘাতে সামন্ততান্ত্রিকতাকে উৎখাত করতে পারে নি, সারা দেশের উৎপাদনকে ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত (commercialised) করতে পারে নি। কিন্তু তবু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এদেশে বিকলাঙ্গ হলেও ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়েছে অনেককাল হতেই এবং সে পথে ভারতবর্ষ অনেকদূর অগ্রসরও হয়েছে। আজ সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর প্রয়োজন খুব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে, আজও ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিকতার খরনখরস্পর্শ তীব্র হয়ে আছে।

যখন ভারতবর্ষ পুরো সমাজতন্ত্রবাদের অনুগামী হয়ে যাবে তখন অন্য কথা। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে অর্থাৎ ধনতন্ত্রের রাজত্ব মোটামুটি বজায় থাকছে, ততক্ষণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ভারতবর্ষ শাসিত হবে ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক রাজধানী হতে। এবং সে রাজধানী বোম্বাইয়ে থাকতে পারে, রাজস্থানে থাকতে পারে, আজকাল উত্তর-প্রদেশেও গড়ে উঠেছে, কিন্তু সে রাজধানী কলকাতায় নেই। সুতরাং এদিক দিয়েও সারা ভারতে বাঙালীর প্রতিষ্ঠা নেই।

এ অবস্থার প্রতিকার এ নয় যে, বাংলায় ভারতীয় নব্য ধন-তান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা হোক। কারণ আজকের জগতে ধনতন্ত্রের কোনও

ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং যদি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বাঙালী প্রাধান্য চায়, তাহলে সেক্ষেত্রেও তাকে ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফেরাতে হবে। যা আসছে তারই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তার প্রস্তুতি প্রয়োজন। সুতরাং সুষ্ঠু বেগবান গতিশীল কার্যকরী সমাজতান্ত্রিকতা কী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই মহড়াই বাঙালীকে দিতে আরম্ভ করতে হবে।

ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তের চেয়ে এগিয়ে এগিয়ে চলাই বাঙালীর অভ্যাস। বরাবরই সে তা করে এসেছে। হয়ত এই কারণেই সময়ে সময়ে সবাই খাপছাড়া বাঙালীর উপর বিরক্ত হয়েছে। রাজাজীর উক্তি এখনও অনেকের মনে আছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে বাংলা ও পাঞ্জাব যদি বাধা হয় তা হলে ও দুটিকে বাদ দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা হোক। কিন্তু তাতে বাঙালী দমে নি, কারণ তাকে যদি অগ্র-গমনের জন্যই খাপছাড়া হতে হয় তা হলে তাকে তা হতেই হবে, কারণ পুরোগামীদের যাত্রা সবসময়ই নিঃসঙ্গ। আজ বাঙালী মার খাচ্ছে বটে, কিন্তু যদি মননে ও কার্যে, চিন্তায় ও সমাজগঠনে নতুন সমাজ-তান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ চেহারা সে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা হলে তার নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষকে আবার ফিরে আসতেই হবে।

আমাদের উপেনদা (স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রায়ই বলতেন, যে-লোক পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ দেখে নি সে-লোক ভারতবর্ষকে চেনে নি, সে দেশের কাজও করতে পারবে না। শুনেছি, শংকরাচার্যের অনুগামী সন্ন্যাসী-দল বা অপর কোনও কোনও সন্ন্যাসী-দলের মধ্যে নাকি নিয়ম আছে, চার ধাম পরিক্রমা না করলে সন্ন্যাসের অধিকার হয় না। ভারতবর্ষের কথা জানিনে, কিন্তু বাংলাদেশের নানা প্রান্ত-প্রত্যন্তে ঘুরে ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, একথাটা সম্পূর্ণ সত্য। বস্তুতঃ আমরা বাঙালীরা বাংলাদেশকে জানিনে। বীরবলী ঢঙের শোনালেও কিন্তু কথাটা একেবারে ভূতার্থব্যাহৃতি। তার প্রধান কারণ আমরা তো বাংলাদেশের বাসিন্দা, পর্যটক তো নই। অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়াইনে। কাজের খাতিরে বড় জোর জেলা-শহরের আদালতের বটতলা অবধি যাই, মহকুমা শহরে বন্দুকের লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যাই। যাঁরা সমাজের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বাসিন্দা, তাঁরা দার্জিলিং কালিম্পং যান বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে শিলং সিমলাও কম যান না। আর গেলেও দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং যান,—রানীবাঁধেও বেড়াতে যান না, শুশুনিয়া পাহাড়েও পিকনিক করেন না, এমন কি নেহাত শিকারের বাতিক না থাকলে জলপাইগুড়ির জঙ্গলেও যান না। আর মধ্যবিত্তদের তো কথাই নেই। যতদিন একটু আর্থিক সংগতি ছিল, ততদিন ছুটি হলেই দল বেঁধে বাঙালী মধ্যবিত্ত রাঁচি, হাজারিবাগ, দেওঘর, মধুপুর, কাশী, পুরী ছুটেছে। এমন কি বহরমপুরের লোক মালদহ বেড়াতে যায় নি, মালদহের লোক বীরভূম বেড়াতে আসে নি। অথচ যাঁরা বাংলাদেশে ভাল করে ঘুরবার সুযোগ অর্জন করেছেন তাঁরা নিষ্কুণ্ঠকণ্ঠে কবির উক্তি সমর্থন করবেন—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী।

বাস্তবিকই সে রূপের তুলনা নেই। আমরা সত্যি সত্যি কত ব্যয় করে কত দেশ ঘুরে কত পর্বতমালা ও সিন্ধু দেখতে গিয়েছি, অথচ দু চোখ মেলে ঘরের দরজা হতে দু পা ফেলে স্বদেশের রূপটি দেখি নি।

এ শুধু কাব্যিক উচ্ছ্বাসের কথা নয়। অনেকে বক্র-হাস্যে বলবেন, বাংলাদেশের কী আর রূপ! গ্রামে এঁদো পুকুর, মশার ঐকতান, ম্যালেরিয়ার ডিপো, আর যুগ-যুগ-সঞ্চিত অনাচারের আবর্জনা—এই তো হল বাংলাদেশের সত্যকারের রূপ! আর শহর অঞ্চলে চিমনি-কণ্টকিত বস্তি-জর্জরিত মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, কয়লা-খনি ও কলমজুরদের স্বেদাক্ত, ক্লেদাক্ত জীবন টেনে টেনে কোনরকমে কাল কাটানো— এই তো সেখানে বাংলাদেশের রূপ! অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করিনে। কিন্তু স্বীকারও করিনে। স্বীকার করিনে এই জন্য যে, এই লাঞ্ছনা, মনুষ্যত্বের এই অপমান তো মানুষ ডেকে এনেছে, এতো প্রকৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেন নি! সুতরাং যে অন্যায় অনাচার মানুষ করেছে, মানুষ তার প্রতিবিধানও করতে পারে। সে চেষ্টা চলুক, সে সংগ্রাম চলুক। কিন্তু আমার আজকের কথা তা নয়। আমার আজকের কথা হল, প্রকৃতি যে অপূর্ব বিচিত্র এবং অকৃপণ দানে বাংলাদেশকে সাজিয়েছেন, কত বিচিত্র উপাদানে বাংলার মানুষ গড়েছেন, কত বিভিন্ন প্রবাহ মিশে মিশে তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে এ সত্যই অপূর্ব এবং বোধ হয় অনন্য।

মনে পড়ে, কয়েক বন্ধু মিলে একবার উত্তরস্যাং দিশি নগাধিরাজ দর্শন করতে গিয়েছিলুম। দার্জিলিং থেকে সীমানা-বস্তি পার হয়ে মানেভঞ্জনে এসে মোটর পরিত্যাগ করে ঘোড়ায় চড়া গেল। প্রথম

দিন সাড়ে-দশ হাজার ফুট চড়ে টংলু বাংলোয় বিশ্রাম। পরের দিন সকাল সকাল খেয়ে সারাদিন ঘোড়ায় চলেছি। নেপাল আর বাংলার একেবারে সীমানা দিয়ে রাস্তা, সীমানা-স্তম্ভগুলি সরু পথের ধারে ঘোড়ার গায়ে ঠেকে ঠেকে যাচ্ছে। দু পাশে রডোডেনড্রনের বন, লোকে হাঁটাপথে পিঠে চিরতার বস্তা নিয়ে চলেছে দার্জিলিঙের বাজারে, আধপথে পাওয়া গেল গভীর কালো টলটলে জলের একটি ছোট পুকুর, তার ধারে কালীপোখ্‌রি বস্তি। বিকেলে পৌঁছলাম সন্দক্‌ফু'র সরকারী বাংলোয়, সাড়ে-বার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায়। বাংলোর বারান্দায় উঠে উত্তরদিকে চোখ ফেরাতেই স্তব্ধ হয়ে গেলুম। চোখ আর ফেরে না। সমস্ত দিগ্‌বলয় তুষাররেখায় ঝকঝক করছে। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি শৃঙ্গরাজ এভারেস্ট মেঘ-লেশহীন রৌদ্রে ঝকঝক করছে, তার আশেপাশে মাকালু ও অন্যান্য পারিষদবর্গ। আরও দূরে দূরে চলে গেছে তুহিনরেখা উত্তরপ্রদেশের দিকে। ডান দিকে যতই চোখ ফেরাই, দেখি বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা রৌদ্রে স্বর্ণবিকিরণ করছে, তার মাথায় উড়ছে তুষারকেতন। এমনি পর পর চলেছে ঢেউ-খেলানো বরফের সারি। দূরে বহুদূরে ভুটানের মধ্যে যেন চুমলহরি শৃঙ্গ দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশের কিনারা হতে আসাম পর্যন্ত গোটা দিগন্তরেখায় চিরতুষারের ঢেউ পড়ন্ত রৌদ্রে ঝলমল করছে। সে কি দৃশ্য! এই দৃশ্য ছেড়ে আমরা ছুটি আল্পসের দৃশ্য দেখতে, য়ুংফ্রাউজচ্‌ উপভোগ করতে! দিন শেষ হয়ে গেল; দুর্লভ সৌভাগ্যক্রমে রাত্রি ছিল চাঁদনী, মেঘ ছিল না মোটে। চাঁদের আলোয় সেই অদ্ভুত তুষারসৌন্দর্য কি সুদূর কমনীয় মোহময় মায়া-বোলানো রূপে দেখা যেতে লাগল সারা রাত্তির। ভোর হয়ে এল। হঠাৎ দেখা গেল, এভারেস্টের শিখরে কে যেন তুলি দিয়ে কমলালেবু রঙের একটা পোঁচ টেনে দিল, তারপরই কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারপর মাকালু, তারপর অন্য সব। কোন পাহাড় কত উঁচু, তা বুঝবার

জন্য ভূগোল দরকার হয় না, পর পর রোদ পড়া দেখলেই তা বোঝা যায়।

তেমনি আবার দক্ষিণ প্রান্তের কথা ভাবি। ওধারে মহাপর্বত, এধারে মহাসমুদ্র। ওধারে কঠিন পাথর, এধারে নরম পলি। ওধারে পাদপহীন তুষারমরু, এধারে দিনের-আলো-বর্জিত ঘন অরণ্য। ওধারে তুষারের মধ্যে প্রাণীর সন্ধানই নেই (হয়তো ইয়েতি ছাড়া), এধারে গহন অরণ্যের কোণে কোণে বাঘের চোখের পিঙ্গল রক্তিমা, আর নদীর গভীরে কুমীর-কামটের আক্রমণ। ওধারে বরফের নীচে বড় জোর ঝুম চাষ, এধারে বনের বাইরে বিরাট বিরাট কৃষিক্ষেত্র। একবার আমাদের লঞ্চ কাকদ্বীপ নামখানা পার হয়ে ফ্রেজারগঞ্জে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট বসতি। সামনেই সমুদ্র। নতুন একটা দ্বীপ উঠছে—ভাটার সময় দেখা যায়। অজস্র পাখি। একবার একটা বাচ্চা তিমি এসে পড়েছিল এই দ্বীপে। তার হাড় বহুদিন রাখা ছিল ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা শাসকের বাংলোর মাঠে। অতিকষ্টে জন্মানো কিছু নারকেল গাছ। অগভীর পুকুর—বেশী কাটলে জল নোনা হয়। অথচ গ্রীষ্মকালে জল শুকিয়ে আসে—তখন কাদা ছেঁচে জল খেতে হয়। গ্রামের হাওয়ায় নোনা স্বাদ, গ্রামের বাইরে সমুদ্রের ঢেউ। অতি চমৎকার শহর হতে পারে,—যা হলে আমাদের পুরী যাবার দরকার হবে না। ফিরে এসে নামখানার খাল দিয়ে প্রবেশ করলুম বড়তলার গাঙে। কত নদী এসে মাঝে মাঝে মিশেছে। তিন-চারটে নদী যেখানে মিশেছে সেখানে অকূল জলরাশি থৈ থৈ করছে, পার দেখা যায় না। নদীর একেবারে কিনার ছুঁয়ে আছে গভীর বন। ভাটায় জল নেমে গেলে চিকচিক করতে থাকে, সরস কালো পলিমাটি। কত অজস্র ছোট ছোট খাল এসে পড়েছে। জেলেডিঙিতে জেলেরা মাছ ধরছে খালে খালে। দুর্ঘটনাও হয়। আমরা একটা মোহানায়

পৌঁছেছি, শুনলুম একজন জেলেকে তখনই বাঘে ধরেছে। ছোট খালে নৌকো ছিল বাঁধা এপারে-ওপারে গোঁজ দিয়ে। গোঁজ খুলতে বনের কিনারে গিয়েছে, আর অমনই নিয়েছে। আমাদের সঙ্গী ছিলেন বন-বিভাগের বড়কর্তা মিঃ চৌধুরী। তিনি বন্দুক, ছোরা নিয়ে নেমে গেলেন, ঘণ্টাখানেক পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। বুকে বুড়ো আঙুলের মত মোটা দুটি গর্ত, তার তলায় কড়ে আঙুলের মত আরও দুটি গর্ত। গলাটা মোচড়ানো, চামড়া ফুটে ছোট ছোট হাড় বেরিয়ে গিয়েছে। উরুর খানিকটা মাংস খাওয়া। জলেই সে মৃতদেহ কবর দিল তার সঙ্গীরা। সন্ধ্যে নাগাদ পাথারপ্রতিমা হয়ে এসে পড়লুম রায়মঙ্গলের মোহানার দিকটায়। কি গভীর গম্ভীর বন, সমস্ত যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। আবার উত্তরমুখো হয়ে সন্দেশখালি বা ক্যানিং পৌঁছলেই দেখা যাবে সীমাহীন মাঠ, মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় নদী, সেই নদীর আড়ালে গ্রামবাসীর শঙ্কিত জীবনযাপন। বাস্তবিক কি জীবন! তিনটে নদী পার হয়ে বারো মাইল দূর হতে মিঠে জল আনতে হয় এমন এলাকাও সুন্দরবনে আছে। সরকারী রিপোর্টেও একথা স্বীকৃত হয়েছে। টেলিগ্রাফ নেই, পোস্টাপিসও নেই, এমন কি অনেক জায়গায় বাইসাইকেলও নেই, ধারেকাছে প্রবল-প্রতাপান্বিত পুলিশ-দারোগা পর্যন্ত নেই। আছে কেবল ধুধু মাঠ, দুরন্ত প্রকৃতি, অদূরে বাঘ আর কুমীর, আর মাঝে মাঝে বাঁধভাঙা প্রলয় প্লাবন।

বাস্তবিকই বাংলাদেশের বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। শুনেছি, জলপাইগুড়ির গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি জায়গা আছে, সেখানে পাহাড় হঠাৎ গভীর খাদে নেমে গিয়েছে, খাদের তলায় নদী। পাহাড়ের উপরে খাদের ঠিক মাথায় একটি বাংলো আছে, সেই বাংলোর বারান্দায় বসে নাকি সন্ধ্যাবেলার মুখে দেখা যায় নানা অরণ্যচারী জন্তু এসে তলায় জল খাচ্ছে। শ্বাপদও দেখা যায়।

যিনি আসাম-বাংলার সীমান্তে সঙ্কোষ নদীর প্রান্তে বনে বনে ঘুরেছেন তাঁর মনেই হবে না যে বাংলাদেশে আছেন। আর কি সব নাম ওধারের নদীগুলোর! ব্যাকরণসম্মত নাম নয়, লীষ ঘীষ চেল মেল তুড়তুড় তোরসা। এ কি বাংলাদেশ বলে মনে হয়? বর্ষার সময় উন্মাদিনী কূলপ্লাবিনী—হড় হড় করে গাছ পাথর ভাসিয়ে নিয়ে আসছে, উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেতু। অন্য সময় তার জলধারাই নেই। এর সঙ্গে রাঢ় দেশের কোনও সাদৃশ্যই নেই। দীর্ঘ দীর্ঘ মাঠ, দূরদূরান্তরে গ্রাম, পুকুর, বিল, সাদা বক, সবুজ ধানের ক্ষেত। কিন্তু আবার বীরভুমের রাঢ় স্বতন্ত্র। তরঙ্গায়িত ভূমি, লাল কাঁকর, ছড়ানো ছড়ানো গ্রাম, বাঁধ। ময়ূরাক্ষী আর অজয়, কোপাই আর বক্রেশ্বর। দামোদর আর বরাকর। এর চেহারা অন্য। আবার এর সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় কলকাতার শহর ও শিল্পাঞ্চল, তখনই মনে হবে কি নিদারুণ তফাত। কোথায় রাঢ় দেশের তরঙ্গায়িত মাঠ আর কোথায় এই বিরাট শিল্প-নগরী। দুয়ে কি কোনও মিল আছে? এমন কি, মিল আছে ভাগীরথীর সঙ্গে দামোদরের? মিল আছে গঙ্গার স্টীমার-গাধাবোটের সঙ্গে দামোদরের ডিঙি-নৌকোর?

কিন্তু শুধু কি প্রকৃতির বৈচিত্র্য? মানুষের বৈচিত্র্য নেই? উত্তরে তো মহাচীন ফেলেছে ছায়া, সেখানকার মানুষের মধ্যে মঙ্গোল ছাপ সুস্পষ্ট। তাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসও তেমনি আলাদা। এখনও বহু জায়গায় আছে ঝুম চাষ, এখনও সেখানে চলে মণ্ডল বা প্রধানদের শাসন। কালিম্পং-এ মণ্ডলেরা সরকারীভাবে স্বীকৃত। তার সঙ্গে সুদূর দক্ষিণের চাষীদের কত তফাত, কত তফাত তাদের বর্গা চাষের পদ্ধতির। রাজবংশী ও কোচদের ইতিহাস কত বিচিত্র। কত জাতির সমন্বয় ও সমাবেশ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। সাঁওতালেরা ক্রমে পশ্চিম থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় বসবাস করছে ক্রমবর্ধমান

সংখ্যায়। তাদের আচার-ব্যবহার, সমাজবিন্যাস, ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক সংগঠনের সঙ্গে কত তফাত অন্যের। কোথায় মেছি নদীর ধারে ধারে লুকিয়ে আছে মেচসম্প্রদায় তরাইয়ের গভীর অরণ্যে। বাংলাদেশে ছ-সাত হাজার কোটাল আছে, তার খবর কেউ রাখেন কি? কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার লালবেগিরা কি করে? কত ঘর টোটো এখনও জলপাইগুড়িতে আছে? অথবা রাভা? বাংলাদেশে অসুর এখনও কিছু আছে কি? ধোকড় জাতি কোথায় থাকে? আগে বাংলায় ৪১৯ জন কীচক ছিল, তার খবর কি কেউ রাখেন? ১৯৩১ সালের সেন্‌সাস অনুসারে বাংলাদেশে ৩৩৩ জন সাগির্দপেশা ছিল, তাদের কথা কেউ শুনেছেন? ১৯০১ সালে যে ৫৯৮ জন শিয়ালগির ছিল, তারা কি এখনও আছে? কৃষ্ণনগরে কি এখনও মুরি বলে কোনও জাত আছে, যারা এককালে উড়িষ্যা হতে এসেছিল বলে প্রসিদ্ধি? কে জানেন যাদের নাম কাপুড়িয়া তাদের পেশা কিন্তু ঘোড়া বেচা? শিডিউল্ড ট্রাইবের কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু ক'জন জানেন যে, বাংলাদেশের সাতটি তপশীলী ট্রাইবের মধ্যে অন্যতম ট্রাইব হল ম্রু, যারা বেশির ভাগ মেদিনীপুর (১৫৬৫ জন) ও হুগলীতে (১১০৮ জন) থাকে?

বাঙালীর বাংলাদেশকে সত্যি সত্যি চিনুন; ভাল করে বঙ্গদর্শন করুন, এইটেই আমার মোদ্দা কথা।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ তার আদিম জৈব জীবনকে পিছনে ফেলে যত দূরে এগিয়ে আসে ততই সমাজ গড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে নানাবিধ দৃশ্য ও অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়ে। তা না হলে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। দুজন লোক একত্র থাকতে গেলেও উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়, পরস্পরকে বুঝে চলতে হয়। সমাজের বেলায় এ রকম লিখিত ও অলিখিত নিয়মের বাঁধন আরও বেশি, রাষ্ট্রের বেলায় তো আরও বেশি। কারণ, সমাজে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য, রাষ্ট্রে লিখিত নিয়মের। সমাজের নিয়ম-কানুন পারস্পারিক সম্মতির উপর অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভর করে, রাষ্ট্রের বেলায় পলিটিক্সের শাস্ত্রতত্ত্বে সম্মতির কথা যতই বলি না কেন কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় তার অনুশাসন শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অল্পবিস্তর পরিমাণে শক্তি-প্রয়োগের উপর। কিন্তু এসব নিয়ম সম্মতি বা শক্তি যারই উপর নির্ভরশীল হোক না কেন, এগুলি হল সভ্যতার বিকাশের অনিবার্য উপকরণ। জৈবধর্মের সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যত এগিয়েছে তার জীবনধারা ততই এইসব বিধিনিষেধের খাত বয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসে একথাও দেখা যায় যে, এই নিয়মের বাঁধন না গড়ে উঠলে যেমন সমাজ গড়ে উঠতে পারে না এবং সভ্যতার অগ্রগতিও হয় না তেমনই যখন সমাজের চলবার পথে ঐসব নিয়ম-কানুন অর্থহীন বাঁধন হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বাঁধনকে ভাঙবার চেষ্টায়, অন্ততঃ সে বাঁধনকে মেজে ঘষে নেবার চেষ্টায়, যে শক্তির জন্ম হয় সেই শক্তিই অগ্রগতির কারণ ও বাহন হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে অবস্থার তারতম্যে এই শক্তির রূপ বিভিন্ন। টয়েনবী দেখিয়েছেন যে, এথেন্সের রাষ্ট্রনায়কেরা সমাজে বিপ্লব বাঁচিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে। আবার এ যুগে মোটামুটি ১৮৭৫

সাল পর্যন্ত শিল্পশক্তি ও জাতীয়তাবাদ একযোগে চলে বড় বড় শক্তিমান রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু তার পর শিল্পশক্তি জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল, অথচ জাতীয়তাবাদ বহু ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংস্থার মধ্যে এমন চেতনা জাগিয়ে তুলল যে জাতীয় রাষ্ট্রগুলির অখণ্ড সত্তাই উঠল বিপন্ন হয়ে। যে দুটি শক্তি এককালে একদিকে কাজ করেছিল কালক্রমে তারা বিভিন্ন ও বিপরীত দিকে কাজ করতে লাগল। যে যুগে এইসব বিভিন্ন শক্তি পারস্পরিক অভিঘাতেই নিঃশেষ না হয়ে একযোগে কাজ করে সে যুগে ঐ নিয়ম সৃষ্টির সহায় হয়। কিন্তু যখন সে পরিবেশের বদল হয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে নতুন শক্তি সঞ্জাত হতে থাকে অথচ বাইরের নিয়মটা খোলস-মাত্র হয়ে থাকে, তখন বাইরের ঠাটটা বজায় থাকলেও প্রাণপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেজন্য তখন তার চতুঃসীমার মধ্যে সৃজনধর্মিতা আর বজায় থাকে না, ভিতরে ভাঙনের ধারা প্রবল হয়ে ওঠে।

যখনই সমাজে, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক জীবনে এ রকম দুর্লক্ষণ দেখা দেয় তখনই প্রায় জৈবিক নিয়মেই সেই দুর্লক্ষণ প্রতিরোধ বা অপসারণের শক্তি জন্মাতে থাকে। হয়তো এই সংঘর্ষে এক এক সময় ভাঙনটাই খুব বড় হয়ে ওঠে, চারদিকে অবিশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে। যেমন একালের সাহিত্যে বইছে, অনেক সময় সমাজেও। কিন্তু ইতিহাসের বিস্তৃতকাল আলোচনা করে দেখলে দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙাচোরা ক্ষয়ক্ষতি লোকসানের মধ্য দিয়ে আর-একটা নতুন ভূসংস্থান জেগে ওঠে। একথা যদি সত্য না হত তা হলে মানবসমাজ এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ইংরেজী সাহিত্যে যেমন অবিশ্বাসী কবিদের ব্যঙ্গ ও বৈহাসিকতার পর রোমান্টিক কবিরা উদ্দীপন আশার সঞ্জীবনমন্ত্র আগুনের ফুল্‌কির মত ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন ; বা এদেশে সমাজের বন্ধনজর্জরতার শেষ সীমায় রবীন্দ্রনাথ অবুদ্ধির উৎপীড়ন হতে মুক্ত চিত্তের স্বারাজ্য ও প্রাণ-

প্রাচুর্যের নতুন ধারায় দেশকে প্লাবিত করতে পেরেছিলেন। যুগে যুগে এ রকম ঘটছে—সময় সময় নতুন-জেগে-ওঠা শক্তি খুব বৃহৎ এবং গভীর হয়, তার চিহ্ন মহাকালের খাতায় স্থায়ী হয়, আবার সময় সময় সে শক্তি কেবল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়।

প্রাচীন যুগের তুলনায় কিন্তু এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। সেকথা আলোচনা করতে গিয়ে টয়েনবী বলেছেন, আগের যুগে বিভিন্ন সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তারা নিজের জগতের মধ্যেই মশগুল হয়ে থাকত, বাইরের দিকে বড় একটা তাকাত না। কিন্তু এ যুগের বিশেষত্ব হচ্ছে শুধু যে বস্তুজগতেই পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ঘনসংশ্লিষ্ট তাই নয়, মনোজগতেও তারা ঘনিষ্ঠ ও পরস্পরের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে।[১] শুধু দূরদূরান্তরে সহজে যাতায়াত ও লেনদেন ব্যবসাবাণিজ্যের ফলেই এটা ঘটে নি; মানসিক হাওয়া-বদলও ঘটেছে, চেতনা নতুন পথে সঞ্চারিত হচ্ছে। পশ্চিম দেশে যখন লিবরলিজ্‌মের স্রোত শুরু হয়, মানবিক অধিকারের প্রসার চেষ্টার আরম্ভ, তখন তা য়ুরোপের লোকদের চিন্তা করেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু জগতের বিভিন্ন দেশ, বিশেষতঃ প্রাচ্যভূখণ্ড হতে রস আহরণ করে তাঁদের সমৃদ্ধি, এবং মানবিক অধিকারের দাবী

১ "In the new age, the dominant note in the corporate consciousness of communities is a sense of being parts of some larger universe, whereas, in the age which is now over, the dominant note in their consciousness was an aspiration to be universes in themselves. This change indicates an unmistakable turn in a tide, which, when it reached high-water mark about the year 1875, had been flowing steadily in one direction for four centuries."—Toynbee, *Study of History* Vol I. p. 15.

সেই কারণে যে তাদেরই সর্বাগ্রে—একথা তাঁদের কারও স্মরণ হয় নি। কবির ভাষায়, ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। এই কথাটা য়ুরোপ মর্মান্তিক বেদনায় সঙ্গে প্রাচ্য ভূখণ্ডকে অনুভব করিয়েছে। আজ সেজন্যই অবস্থা বদলেছে। একালের বিধ্বস্ত সমাজে পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব ওদেশে রচনা করতে হলেও খালি য়ুরোপের কথা ভাবলে চলে না, গোটা জগতের কথা ভাবতে হয়। এসব দেশকে বাদ দিয়ে কোনো তত্ত্ব-কথাই ভাবা চলে না। আগে যা স্থানীয় শক্তি হলে চলত এখন তা বিশ্বশক্তি, অন্তত: ব্যাপক শক্তি হবার প্রয়োজন ঘটেছে।

এই রকম পরিবর্তনের আসল কারণ হল, সারা বিশ্ব এখন মনোজগতে বা বস্তুজগতে এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত যে কোনও জায়গায় সংকট দেখা দিলে সে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বসংকটে পরিণত হয়। অবশ্য, মৌলিক সংকট হলে। আর, একথা তো সকলেই অনুভব করেন যে আমরা বর্তমানে এ রকম একটি গভীর মৌলিক সংকটে এসে পৌঁছেছি। ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে, গত দু শো বছর ধরে সমাজ যে মানসিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পড়োপড়ো হয়েও কোনো রকমে এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল আজ সে ভিত্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস—নতুন করে ভিত্তিরচনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগতের অন্যান্য দেশেও এ রকম অবস্থা দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় নতুন শক্তি কি রূপ নেবে ?

২

উপরি-উক্ত প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাবই সম্ভব নয়, কেননা তা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে গত

শতাব্দীর নিরাকার চিন্তাধারা এই শতাব্দীতে সাকার সাম্যবাদে পরিণত হবার সঙ্গে-সঙ্গে সে জিনিসটা জগতের মনকে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তার কর্মপদ্ধতি বা ক্রিয়াকৌশল সব জায়গায় সমান নয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি রুশিয়ায় যে ভূমিব্যবস্থা করা হয়েছে চীনে তা থেকে কিছু পৃথক ভূমিব্যবস্থা করা হচ্ছে। পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশগুলিতেও স্থানীয় অবস্থা অনুসারে এ রকম কিছু কিছু তফাত আছে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির কথা বলছি না। এই রকম ছোটোখাটো পার্থক্য ছেড়ে দিলেও দেখা যাবে, তাঁদের কতকগুলি মূল কথা আছে যা সর্বত্রই এক। একথাও অস্বীকার করতে পারি নে যে ইতিহাসের গতিনির্ণয়ে তাঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অর্থনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্লেষণ অত্যন্ত বাস্তব ও সুনিপুণ, দশ বছরের পথ এক বছরে হাঁটতে তাঁরা সক্ষম। শুধু যে নিজেরাই সক্ষম তাই নয়; এই আদর্শের নামে কিছু লোকের মধ্যে প্রায় ধর্মোন্মাদের মত উৎসাহ সৃষ্টি করে, আর কিছু লোকের উপর অসংকোচে বলপ্রয়োগ করে তাঁরা দেশটাকেও অনেকখানি দ্রুত হাঁটাতে সক্ষম। এ ছাড়া আরও নানা তর্কের বিষয় আছে, যা এখানে অবান্তর। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হল, মানুষ নয়, রাষ্ট্র। সেইজন্য সাম্যবাদীর কর্মকাণ্ডের প্রথম লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল করা; শুধু দখল করা নয়, শোষকদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে সবলে চূর্ণবিচূর্ণ করে তার চিহ্নমাত্র না রেখে একেবারে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র স্থাপনা করা। স্টালিন একথা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন যে, সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র প্রচলিত অর্থে ডিমোক্রেসি নয়, সেখানে সত্যকারের মেজরিটি রাজত্ব করবে মাইনরিটির উপর। মাইনরিটি হল শোষকসমাজ, তাদের বলপ্রয়োগে চূর্ণ করতেই হবে। পারী কমিউনের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স বলেছেন, তার প্রধানতম কারণ হল সেখানে কর্তারা পুরোপুরি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র

প্রতিষ্ঠা না করে কিছু কিছু পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র রেখে তার সঙ্গে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের খানিকটা ভেজাল দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য এই তত্ত্ব অনুসারে যে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে একেবারে সর্বগ্রাসী, তার বাঁধা ছকে সারা দেশটার সকল মানুষের জীবন বাঁধা। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে রাষ্ট্রকে দৃঢ় ও পুষ্ট করবার চেষ্টায় মানুষকে ছককাটা পথে পরিচালিত করা। এ পথে হয়তো শোষকশ্রেণী আর থাকবে না, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও হয়তো হতে থাকবে, কিন্তু সেসবই হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকায়। ব্যক্তিমানুষ তাতে পিষ্ট। সেই চাকা চালানোতেই তার একমাত্র সার্থকতা, তার বাইরে তার প্রয়োজন নেই। উৎকর্ষের মানদণ্ড হল সেই চাকা কে কত ভালো ভাবে চালাতে পারছে। রাষ্ট্রনায়কদের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগ্রহ এত বেশি যে দেশের প্রত্যেকটি লোক সেটি বোঝা ও সে সম্বন্ধে উৎসাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর যাঁরা তাতে সায় দেবেন না তাঁদের উচ্ছেদই হল সেই স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার সিধে পথ। ও বলিদান পাপ তো নয়ই, বরং ধর্ম। যাঁরা ও বলিদানে ভীত তাঁরা এই শক্তিপূজার তন্ত্রধারক হবার অযোগ্য।

এ পথ ভালো কি মন্দ সেসব তর্ক এখানে অবান্তর। একথা সত্য যে, এখন এ পথ জগতে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নিয়েছে। বাস্তবিকই, যে সময় মানুষের দুঃখকষ্ট সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সে সময় সে ক্রূর কঠোর ভয়াল হয়ে ওঠে। তখন এই রকম রুক্ষ অবিমিশ্র কেজো কথাই তার মন সম্পূর্ণ দখল করে নেওয়া স্বাভাবিক। হিতবচনের চেয়ে কর্মোদ্যমই তার প্রিয়। আর যদি সহজে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় তা হলে তার অনিবার্য উপায়স্বরূপে সে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরাট চাকার মধ্যে স্বেচ্ছায় অঙ্গীভূত হতে আপত্তি করে না, বরং বিশ্বাস করে এই পথেই তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি, এমন কি উৎসাহেরও অভাব বোধ করে না।

৩

আজকের দিনে আমাদের দেশে স্বরাজসাধনার উপায় স্বরূপে এই পথ ভালো কি মন্দ সে কথা আলোচনা না করলেও মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে আমরা একটা নতুন পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করেছি। তার প্রবর্ত্তক হলেন গান্ধীজি। সাধারণ পলিটিশ্যনদের লক্ষ্য গোটা মানুষ নয়। মানুষের জীবনের যেটুকু রাজনীতির আওতায় পড়ে সেইটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার। যে লোকটা তাঁদের ভোট দিয়ে গেল সে লোকটার জীবনাদর্শ কি, ব্যক্তিগত চালচলন কেমন, এসব অবান্তর কথা নিয়ে তাঁদের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ স্বরাজসাধনা আর জীবনসাধনা এঁদের তত্ত্বে সমীকৃত হবার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র রাজনীতি নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত, তার বাইরে যাবার দরকার তাঁরা অনুভব করেন না। সাম্যবাদ বোধ হয় তার প্রথম ব্যতিক্রম, কেননা তারা শুধু ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, মানুষের সারা জীবনটাকে একটা যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে দেবার চেষ্টাও করে। কিন্তু গান্ধীজি হলেন এ দুয়েরই ব্যতিক্রম। তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল মানুষ। রাজনীতির আপাত লাভক্ষতি তিনি এই মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছেন। স্বরাজলাভের চেয়েও স্বরাজলাভের উপযুক্ত মানুষ তাঁর চোখে বড়। চৌরীচৌরার পর আন্দোলন বন্ধ করা হতে এই ধরনের বহু সিদ্ধান্তের মূল এইখানে। তিনি জানতেন এ দেশের মানুষকে স্বরাজলাভের উপযুক্ত করে তুলতে পারলেই আপনি-আপনি শৃঙ্খল খসে যেতে বাধ্য। আর তা না হলে যদি কেউ এসে একবার তার শৃঙ্খল খুলেও দেন, পরক্ষণেই সে আবার কারও কাছে শৃঙ্খল পরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে। আর যে দেশে অগণিত মানুষ এ রকম শক্ত বুনিয়াদে নিজেদের গড়ে তুলেছে সে দেশে স্বরাজের ভিত হবে পাকা। মুক্তধারার ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক সাড়া দিয়েছিল, কিন্তু ধনঞ্জয়ের

সে লজ্জা রাখবার স্থান ছিল না। সে বলেছিল "আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তা হলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।" একজন লোক যদি মহা শৌর্যে-বীর্যে সারা দেশের জন্য স্বরাজ এনে দেয় তা হলে তার কৃতিত্ব অপরিসীম হল বটে, কিন্তু সে স্বরাজ দেশের লোকের জন্য হল না, সে হয়ে রইল একজনের উপর নির্ভরশীল, পঙ্গু। এতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না। একজন মানুষ, তিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, দেশকে চিরকাল কখনও রক্ষা করতে পারেন না। আর পারলেও সে অবস্থায় দেশের লোকের কোনো স্বরাজই হল না, তারা ইংরেজের বদলে আর-একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল, চিন্তায় কর্মে মনে। সেই জন্য গান্ধীজির লক্ষ্য ছিল মানুষ, যে মানুষের জীবনে স্বরাজসাধনা ও জীবনসাধনার সমীকরণ হবে। ধর্মযাজকেরা যুগে যুগে এ রকম চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা সমাজ বা রাজনীতির ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করে। গান্ধীজিই হলেন প্রথম পুরুষ যিনি গুহাহিত তপস্যার জন্য নয়, দৈনন্দিন রাজনীতির সক্রিয় উপায় হিসাবেই এই মানুষের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাজনীতির চাতুরিভরা ছলনাময় রঙ্গমঞ্চে এ রকম অদ্ভুত চেষ্টা এর আগে হয় নি। এইখানে তিনি সাধারণ পলিটিশ্যনের ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে তিনি কেজো লোক হলেও মুক্তিসাধনার শর্টকাট হিসেবে মানুষকে যান্ত্রিক চেষ্টার অঙ্গীকৃত হতে দিতে চান নি। যেখানে মানুষকে সজ্ঞান কর্মপ্রচেষ্টায় সম্মিলিত করতে পারা যায় না সেখানেই তাকে অজ্ঞান বাধ্যতায় জোর করে জুড়তে হয়। মানবচরিত্রের ওরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়, অথবা ওরকম পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যে সময় ও যে চেষ্টা প্রয়োজন তাতে মজুরি পোষানো সম্ভব নয়—এ বিশ্বাস থাকলে কর্তৃপক্ষ অজ্ঞান বাধ্যতার পথই বেছে নিতে বাধ্য। কিন্তু তা হতে প্রমাণিত হয় না যে যদি সজ্ঞান কর্মচেষ্টার সম্মিলন ঘটানো সম্ভব হত তা হলে তাতে আরো ভালো

ফল ফলত না। মুক্তধারার যন্ত্ররাজ বলেছিল, তাঁর বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আল্‌গা করতে পারে এমন পথ খোলা নেই। উত্তরে দূত বলেছিল, ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না, তাঁর জন্য যেসব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না। সুবৃহৎ যন্ত্রের বিপদই এই ; একবার ফাটল ধরলে তাকে আর ঠেকানো যায় না। সেইজন্য সন্দেহ বা অবিশ্বাসের এতটুকু চিহ্ন দেখা গেলেই তাকে তখনই সবলে অপসারণ করতে হয়। তা ছাড়া সমাজ মুক্তির স্বর্গরাজ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছেছে একথা বিশ্বাস করলে সেখানেই সমাজের গতি রুদ্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ, সামাজিক জৈবধর্মে যে নতুন নতুন শক্তির সৃষ্টি হতে থাকে সে শক্তির উৎসমুখ যদি খোলা থাকে তা হলে সমাজের ফের বদল ঘটবেই। কিন্তু সমাজ তার বিকাশের চরমতায় পৌঁছেছে যদি একথা বিশ্বাস করা হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সেখানেই তাকে আটকে রাখে তা হলে আবার নতুন শক্তির জন্ম বা নতুন পরিবর্তনের সূচনা অনভিপ্রেত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক যে সমাজে আর নতুন শক্তি যেন না জন্মায়। সমাজে নতুন শক্তি না জন্মালে রাষ্ট্রেরও আর কোনো বদল ঘটতে পারে না, সেইজন্য সে অবস্থায় রাষ্ট্রের শুকিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তরই নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে একজায়গায় এনে সেখানেই চিরকালের মত স্তব্ধ করে রাখবার চেষ্টা বোধ হয় সম্ভব নয়—সম্ভব হলেও, স্বাভাবিক নয়। অথচ যদি যান্ত্রিক ভিত্তির বদলে সচেতন সজ্ঞান খাঁটি মানুষের জোড় মেলাতে পারা যায় তা হলে সে বুনিয়াদে শুধু যে ফাটল ধরবার আশঙ্কাই কম তাই নয়, তাতে ফল আরও ব্যাপক আরও গভীর এবং আরও স্থায়ী হবে। গান্ধীজি জানতেন যে, এভাবে মানুষকে গড়ে তোলা সহজ নয়। কিন্তু অন্য সহজ পন্থা ত্যাগ করে তিনি এই মহাযানের পথিক হতে দ্বিধা করেন নি, কারণ মানুষের প্রতি

তাঁর বিশ্বাস ছিল দুর্মর। এইখানে তিনি সাম্যবাদের চলিত পন্থারও দারুণ ব্যতিক্রম। আর তাঁর শেষ বৈশিষ্ট্য হল, তিনি এসব কথা অবাস্তব ধর্মোপদেশ হিসেবে বলেন নি, কাজের পদ্ধতি হিসেবেই বলেছিলেন এবং সে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ফললাভও করেছেন।

৪

আজ যখন স্বরাজসাধনা আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু হয়ে উঠেছে তখন ভাবতে হবে এই স্বরাজসাধনার সফলতার জন্য কি রূপ দরকার। স্বরাজ-লাভের সাধনার সময় আমাদের পারস্পরিক বন্ধন ছিল প্রধানতঃ পরবশ্যতার হাত হতে মুক্তির চেষ্টা। সারা ভারতবর্ষ ক্রমশঃ এই সূত্রে বাঁধা হয়েছিল। এক হিসেবে মুক্তিপ্রচেষ্টার এই রূপও ইংরেজ সাম্রাজ্যের ফল। ভারতবর্ষে বহু সাম্রাজ্য হয়েছে এবং গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড সত্তার ধারা চলে এসেছে। কারণ, এইসব সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে পোলিটিক্যাল সংহতির মধ্যেই সংহত করতে চায় নি, করতে চাইলেও পারে নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে মিল ছিল পোলিটিক্যাল সূত্রে নয়, সমাজের স্তরে। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে বলেছিলেন। আমাদের যেখানে যেখানে মিল ছিল সে মিল পোলিটিক্যাল বন্ধনের ফলে সৃষ্টি হয় নি। সমাজের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল বলেই সে মিল এইসব সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের মধ্যেও টিকে থাকতে পেরেছিল। সেইজন্যই একসময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের গুরুত্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত, কবিরই ভাষায়, এক বিচিত্র ব্যাপার। এক হিসেবে অনন্যও। শুধু যে তারা আমাদের চিত্তের ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এনেছিল তাই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের

সমাজের ধারাটিও দিল বদলিয়ে। এতদিন ধরে আমাদের সমাজ যে সূত্রটি ক্ষীণভাবে ধরে রেখেছিল সে সূত্রটি এই নতুনতর সভ্যতার সংঘাতে ছিন্ন হয়ে গেল। সেইজন্য একদিকে যেমন সাম্রাজ্যিক কাঠামোর চাপে আমাদের দেশে এবং সমাজে মোটের উপর দেখা দিল ভাঙন, তেমনই অন্যদিকে আমাদের চিন্তাভাবনা সমাজের স্তর হতে চলে গেল পলিটিক্সের প্রস্থানভূমিতে। একথা সত্য যে, ইংরেজী সভ্যতার সংঘাত আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকশনে যেমন সাহায্য করেছে তেমনি কোনো কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সমাজসংস্থানেও জাগিয়েছে নতুন শক্তি। এইরকম শক্তির ফলেই বাংলায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু এইসব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলে গত দু শো বছরের ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভাঙনের ধারাই মোটের উপর ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই ধারার প্রসার নিবারণ করে সমাজের শক্তিকে নতুন রূপে জাগরিত করবার কোনো চেষ্টাই তার মধ্যে ছিল না। ইংরেজ রাজত্ব আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনে বেঁধেছিল, ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির চেষ্টাতেও আমরা তেমনই প্যোলিটিক্যাল মঞ্চেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু এ বাঁধন যে কত ঠুন্‌কো তা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আমলেও হিন্দুমুসলমানের মনকষাকষি উপলক্ষ্যে বারবার বলেছিলেন। শুধু হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধে নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধেই একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলে এসেছেন। "কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সাড়া যখন পাই না তখন রাগ হয়। মনে হয় এই যে, কোনোদিন যাহা-দিগকে গ্রাহ্য মাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও

বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।"[২] কিন্তু এই দুর্বলতা পরের যুগেও সংশোধিত হয় নি। উপরন্তু এই মূলগত দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা না করে আমরা সেটা চাপা দিতে চেয়েছি প্রলোভন দেখিয়ে। তাতে নিজেদেরও হিত হয় নি, অপর পক্ষেরও নয়। বরং আসল ব্যবধান আরও দুস্তর হয়েছে। খিলাফৎ-প্রসঙ্গে এইজন্যই কবি লিখেছিলেন, "অসহকার-আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গীকরণের দুঃখটা তাদের বাস্তব। এমনতরো মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলি নি; আমরা একদল পূর্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপটেছি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে সবেগে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করছেন, আবার কী দিয়ে এদের চঞ্চুদুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েছে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে ভাঙা যাবে না।" কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এদিকে কেউ নজর দেন নি। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসও এ কাজ মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নি। কারণ, গান্ধীজির পক্ষে মানুষের সাধনা ছিল নীতি, কংগ্রেসের পক্ষে তা কৌশলমাত্র। সেইজন্য আমাদের স্বরাজলাভের সাধনার ধারা গড়িয়ে চলেছিল কেবলমাত্র পলিটিক্সের পথ ধরে। অসফলও হয় নি, তার কারণ ইংরেজ সাম্রাজ্যের বাঁধনটাও ছিল পোলিটিক্যাল সূত্র ধরেই।

স্বরাজলাভের সাধনা স্বরাজসাধনায় পরিবর্তিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মূল প্রশ্নটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র পলিটিক্সের পথ ধরে আমরা স্বরাজসাধনার পথে অগ্রসর হতে পারব কি না।

২ সমূহ

বিশেষতঃ এই চার-পাঁচ বছরেই আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজবিতাড়নের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁধনের জোড় আলগা হয়ে পড়ছে। ভাষাগত বিরোধ, প্রদেশগত বিরোধ—এসব তো আছেই। সেইসঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে যে অনৈক্যের মূল পরিব্যাপ্ত হয়ে ছিল তা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অনৈক্যের প্রধানতম অবশ্য অর্থনৈতিক অনৈক্য। আর্থিক প্রসারের যুগে এটা তত পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু এযুগের মত আর্থিক সংকোচনের সময় তা আরও প্রবল হয়ে ওঠে, ক্ষীয়মাণ রসধারার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি হতে থাকে। তবুও ঐ অনৈক্য একেবারে পুরোপুরি অর্থনৈতিক নয়। এই কাঞ্চনকৌলীন্যের যুগেও অন্য ধরনের অনৈক্য একেবারে মরে নি; বিশেষতঃ যেসব দেশে অবুদ্ধি অবিদ্যা অনেকদিন ধরে রাজত্ব করে এসেছে সে দেশে তার জড় মরে সম্পূর্ণ কাঞ্চনকৌলীন্যের প্রতিষ্ঠা হতে সময় লাগে। সমাজ এবং ধর্মের নাম দিয়ে দুঃখ এবং অপমানের বেদনা অর্থনৈতিক বেদনার চেয়ে আমাদের দেশে আজও কম দুঃসহ নয়। এই ধরনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনৈক্যের মূল রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে। এই বাস্তব সত্যকে চাপা দিয়ে কেবল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে মিলন ঘটাতে গেলে সে মিলন সত্যও হতে পারে না, স্থায়ীও নয়। বিশেষতঃ য়ুরোপের মত এদেশে অন্য চিন্তাভাবনা দূরে সরিয়ে রেখে কেবল পলিটিক্সের স্তরে চিন্তা করার অভ্যাস আমাদের বেশি দিনের নয়। এ অবস্থায় কেবলমাত্র পোলিটিক্যাল স্তরে দেশটাকে বেঁধে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাস্তববুদ্ধির বা কর্মকৌশলের পরিচয় নয়।

তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাববার আছে। য়ুরোপের দেশগুলির মত ভারতবর্ষ ছোট দেশ নয়। সেখানে কেন্দ্রস্থ শাসন-ব্যবস্থার উৎসমুখ থেকে যে ধারা উৎসারিত হয় তা সীমানা পর্যন্ত

পৌঁছতে পারে সহজেই। আমাদের দেশের পক্ষে সে কথা সত্য নয়। এই বিরাট দেশে শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে যে ধারা বইয়ে দেওয়া হয় তা পরিধি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায়ই শুকিয়ে যায়, সীমানায় শেষ পর্যন্ত তার আর কোনও চিহ্নও বহুসময়ে থাকে না। এ রকম বৃহৎ দেশ যান্ত্রিক ছন্দে বাঁধা থাকলে কেন্দ্র হতে পরিধি পর্যন্ত ধারা-স্রোতের যাত্রাপথে নানা জায়গায় পাম্প বসিয়ে তাকে জোর করে চালাবার চেষ্টা বরং সম্ভব। কিন্তু সে যান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে নির্ভর করতেই হবে মানুষের উপরে। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় উপযুক্ত খাত কেটে সেই ভাগীরথীর ধারাকে বইয়ে নিয়ে যায় তা হলে যন্ত্রের অভাবে কোনো ক্ষতি হয় না। বরং আরো ভালো ফল হয়।

আজ স্বরাজসাধনার মূল প্রশ্ন এইখানেই। আমরা প্রথমতঃ দেশটাকে যতই পলিটিক্‌সের বজ্রবাঁধনে বাঁধতে চাচ্ছি, সর্বত্র প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র স্থাপনার চেষ্টা করছি, আমাদের সেই সৎ ও মহৎ প্রচেষ্টা আশানুরূপ ফল লাভ তো করছেই না, বরং দিন দিন নানারকম অনৈক্য জোর হয়ে উঠছে। আসল গলদ ঐখানে; সেগুলিকে না সরিয়ে জোড়াতালি দিয়ে শুধু পোলিটিক্যাল ঐক্যের বন্ধন এ অবস্থায় কখনোই সফল হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতালাভের পর থেকে নানা জনহিতকর প্রচেষ্টাও আশানুরূপ ফললাভ করছে না, তারও কারণ কেন্দ্র থেকে পরিধিতে পৌঁছতে পৌঁছতেই সে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—মাটি উর্বর করতে পারছে না, ফসলও ফলাতে পারছে না। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায় মাত্র দুটি। প্রথমতঃ, সারা দেশটাকে অনড় কঠিন যান্ত্রিক ছন্দে বেঁধে এ হতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হতে পারে; যে যন্ত্র আমাদের নানারকম অনৈক্য স্টীম-রোলারের মত গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সবলে এক নতুন বাঁধনে আমাদের দেশকে বেঁধে রেখে সজোরে সামনের দিকে চালাবার চেষ্টা করবে এবং সেইসঙ্গে কেন্দ্র

হতে উৎসারিত ধারাকে যান্ত্রিক শক্তিতে সীমানা অবধি পৌঁছে দেবে। কিন্তু আমরা যদি সেই পদ্ধতি লাভক্ষতির বিচারে শ্রেষ্ঠতম, অর্থাৎ পরিণাম সব চেয়ে লাভজনক বলে মনে না করি তা হলে মানুষের দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

গান্ধীজি আগে থেকেই এই অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর সমস্ত তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কেবল মানুষের কথাটাই বড় করে বলতে চেয়েছেন। হাতেকলমে স্বরাজসাধনা করবার আগে আমাদের কাছে এই সমস্যাটা স্পষ্ট হয় নি, সেইজন্য গান্ধীজির কথাও অনেক সময় আমাদের কাছে অবাস্তব ঠেকেছে। কিন্তু হাতেকলমে স্বরাজ-সাধনা করতে গিয়ে আমরা ক্রমেই এই সমস্যার গভীর গহনে প্রবেশ করছি। তথাকথিত গান্ধীবাদীরা গান্ধীজির কথাবার্তাকে একেবারে অনড় শাস্ত্র বানিয়ে তার সূত্র ভাষ্য নিয়ে নৈয়ায়িকদের মত যেসব তর্ক করেন সেসব তর্ক একেবারেই অবান্তর। এমন কি বিশেষ কোনো অবস্থায় গান্ধীজি যেসব পথ নির্দেশ করেছেন সেসব পথই যে চিরকাল পরিবর্তনহীন ভাবে চালাতে হবে, এমন চিন্তাও বাস্তব নয়। যেমন চরখার কথা, খাদির কথা। কিন্তু এইসব তর্কে আসল কথাটা ভুললে চলবে না। উপায় নিয়ে যতই তর্ক হোক উদ্দেশ্যটা মনে রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যটা হল, আজ ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যদি সজীব প্রাণবান এবং শোষণবর্জিত সমাজ গড়ে ওঠে তা হলে তার সমবায়ে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, শুধু কেন্দ্রীভূত বিরাট ক্ষমতার অধিকারী যান্ত্রিক রাষ্ট্র উপর থেকে বলপ্রয়োগ করে তেমন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রটা গড়ে তুলতে হবে পিরামিডের মত তলা থেকে উপর পর্যন্ত। উল্‌টো পিরামিডের মত উপর থেকে শুরু করে তলা পর্যন্ত নয়, কারণ তাহলে সেটা আসলে ঊর্ধ্বমূল অবাঙ্‌শাখ বৃক্ষের মতই ঝুলতে থাকবে, বাইরে তার শক্তির আড়ম্বর ও মত্ততা যতই থাক্ না কেন।

আমাদের স্বরাজসাধনায় এই সমস্যাটি ভালো করে উপলব্ধি করলে চিন্তা করতে হবে, সেই নতুন সমাজ কি ভাবে গড়ে তোলা যায়, কি-ই বা তার আদর্শ। এবিষয়ে গান্ধীজি তাঁর গঠনকর্মপদ্ধতিতে এবং অন্যান্য রচনায় বহু নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন মানুষ গড়বার আগ্রহ তাঁর সর্বত্র, সেই মানুষের ভিত্তিতেই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। আর, সে সমাজ হবে বিকেন্দ্রীকৃত, কারণ কেন্দ্রীকরণ হলেই তার জীবনছন্দ বিচিত্র মিলে মিলিত না হয়ে যান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এই হল তাঁর মূল কথাটা, তাঁর সূত্রকারেরা হিংসা-অহিংসা শিল্প-কুটিরশিল্প প্রভৃতি নিয়ে যতই তর্ক করুন না কেন। এবং আজকের দিনে এবিষয়ে চিন্তা করতে হলে আমাদের সেই মূল কথাটাই ভাবতে হবে, সূত্রভাষ্যটীকার গহন অরণ্যে হারিয়ে গেলে চলবে না।

সেইজন্য এই কথাটা ভাবতে গেলে আরও একটা কথা না ভেবে উপায় নেই। টীকাকার-ভাষ্যকারেরা তাঁদের কলহ-কোলাহলে আসল কথাটাকে ঘুলিয়ে তুলুন বা নাই তুলুন, গান্ধীজি মানুষের নবজন্ম চেয়েছিলেন বটে, ভাস্বর শুদ্ধাচারে তার জীবনসাধনা ও স্বরূপসাধনা সমীকৃত করতে চেয়েছিলেন একথাও সত্য, তবু তাঁর কল্পনার মানুষও মানুষের মহত্তম বিকশনের আদর্শ স্বীকার করে নি। তার সত্তাও বহু জায়গায় খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত। সেকথা সবচেয়ে ভালো করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সত্যের আহ্বান' এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রবন্ধে। আমরা যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষ চাই তা হলে তার পূর্ণ বিকাশ চাই। সে অবস্থায় তার মন যদি ইংরেজের শিকলে বাঁধা না পড়ে চরকার শিকলে বাঁধা পড়ে, সে যদি মনে করে যে যন্ত্রের মত চরকা ঘুরিয়ে গেলেই একদিন আপনা-আপনি স্বরাজ এসে উপস্থিত হবে তা হলে বুঝতে হবে তার মনটা তেমনই অনড় আছে, কেবল তার বশ্যতা একজনের কাছ থেকে

আর একজনের কাছে বদল হয়েছে মাত্র। কবির ভাষায় এ ঢেঁকির মনিব-বদল মাত্র, যেই তাকে চালাক না কেন, সে পাড় দিতেই থাকবে। আসলে তার ঢেঁকিজন্ম থেকে মুক্তি চাই। সুতরাং আজ যখন মানুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের ধর্ম তখন সে মানুষ শুধু উজ্জ্বল ভাস্বর ক্লেদলেশহীন হলেই হবে না; শুধু জীবনটিকে সে তপস্যার মত ধারণ করে জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনাকে একীকৃত করলেই হবে না; তার সঙ্গে দেখতে হবে তার আদর্শে কোনো খাদ নেই, তার মন হতে জড়তা দূরীভূত। অন্ধ বাধ্যতা কারও কাছেই ভালো নয়—ইংরেজ মহিমার কাছেও নয়, এদেশের অতীতযুগের বিচারহীন গুণগানেও নয়, কোনো স্বদেশী ফরমূলার কাছেও নয়, কারণ ও হল যান্ত্রিকতারই বিভিন্ন রূপ। যে মানুষ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরের সঙ্গে নতুন সমাজরচনার চেষ্টায় সাগ্রহে মিলিত হয় সেই সজ্ঞান ও সাগ্রহ মিলন ও কর্মচেষ্টার চেয়ে ফলবান আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দেশের কল্যাণ বলতে যে কতখানি বোঝায় তার ধারণা আমাদের সুস্পষ্ট হওয়া চাই। এই ধারণাকে অত্যন্ত বাহ্যিক ও অত্যন্ত সংকীর্ণ করার দ্বারা আমাদের শক্তিকে ছোটো করে দেওয়া হয়। আমাদের মনের উপর দাবি কমিয়ে দিলে অলস মন নির্জীব হয়ে পড়ে।···দেশের কল্যাণের একটা বিশ্বরূপ মনের সম্মুখে উজ্জ্বল করে রাখলে দেশের লোকের শক্তির বিচিত্র ধারা সেই অভিমুখে চলবার পথ সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা খনন করতে পারে। সেই রূপটিকে যদি ছোটো করি আমাদের সাধনাকে ছোটো করা হবে।···স্বদেশের দায়িত্বকে কেবল সুতো কাটায় নয়, সম্যক্‌ভাবে গ্রহণ করবার সাধনা ছোটো ছোটো আকারে দেশের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। সাধারণের মঙ্গল জিনিসটা অনেকগুলি ব্যাপারের সমবায়। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে

নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে। স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকে আমরা চোখে দেখতে চাই।"[৩] কি উপায়ে সেই রূপটির প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেছেন, আমাদের অবিদ্যা অবুদ্ধি দূর করে চিত্তের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে—যে চিত্ত পাঁজি মনসা ওলাবিবির কাছে বিক্রীত নয়, যে চিত্ত মুসলমানকে শুধু রাজনীতির বেলা ভাই বলে আহ্বান করে মানবিক অধিকারের বেলা দূরে ঠেলে রাখে না, রাজনৈতিক সভায় চাষীদের জন্য বক্তৃতা দিয়ে ঘরে এসে তাদের 'চাষা বেটা' বলে না। সেই সঙ্গে আমাদের সাধনা করতে হবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাধনা—যা মানবসত্তাকে খণ্ডিত ও সীমাচিহ্নিত আদর্শের দিকে টেনে না গিয়ে পরিপূর্ণ ভালোর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। আর, সেই সঙ্গে আরও চেষ্টা করতে হবে, "জীবিকার ভিতের উপর একটা বড়ো মিলের পত্তন করবার"। "জীবিকার ক্ষেত্র সব চেয়ে প্রশস্ত, এখানে ছোটো-বড়ো জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলেরই আহ্বান আছে—মরণের ডাকের মতই এ বিশ্বব্যাপী। এই ক্ষেত্র যদি রণক্ষেত্র না হয় —যদি প্রমাণ করতে পারি, এখানেও প্রতিযোগিতাই মানবশক্তির প্রধান সত্য নয়, সহযোগিতাই প্রধান সত্য, তা হলে রিপুর হাত থেকে, অশান্তির হাত থেকে মস্ত একটা রাজ্য আমরা অধিকার করে নিতে পারব। তা ছাড়া একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের গ্রামসমাজে এই ক্ষেত্রে মেলবার চর্চা আমরা করেছি। সেই মিলনের সূত্র যদি বা ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, তবু তাকে সহজে জোড়া দেওয়া চলে। কেননা আমাদের মনের স্বভাব অনেকটা তৈরি হয়ে আছে।" এইভাবে চলতে পারলে একদিন-না-একদিন ব্যক্তিমানুষের এই ধর্ম রাষ্ট্রেও প্রতিফলিত হবে। কারণ, "ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা,

৩ কালান্তর : স্বরাজসাধনা।

তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি। দেশের লোকেরা বা দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিষয়বুদ্ধি এই রাষ্ট্রনীতিতে আত্ম-প্রকাশ করে। বিষয়বুদ্ধি হচ্ছে ভেদবুদ্ধি। এ পর্যন্ত এমনই চলছে।...
...যেদিন মানুষ স্পষ্ট করে বুঝবে যে, সর্বজাতীয় রাষ্ট্রিক সমবায়েই প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বার্থসাধন, কেননা পরস্পর-নির্ভরতাই মানুষের ধর্ম, সেইদিনই রাষ্ট্রনীতিও বৃহৎভাবে মানুষের সত্যসাধনার ক্ষেত্র হবে। সেইদিনই সামাজিক মানুষ যেসকল ধর্মনীতিকে সত্য বলে স্বীকার করে, রাষ্ট্রিক মানুষও তাকে স্বীকার করবে। অর্থাৎ, পরকে ঠকানো, পরের ধন চুরি, আত্মশ্লাঘার নিরবচ্ছিন্ন চর্চা, এগুলোকে কেবল পরমার্থের নয়, ঐক্যবদ্ধ মানুষের স্বার্থেরও অন্তরায় বলে জানবে।"[৪]
এইজন্যই জীবনসাধনা ও স্বরাজসাধনার সমীকরণ চাই, ব্যক্তিক জীবনেও, রাষ্ট্রের জীবনেও। তারই পূর্ণতম আদর্শের মহত্তম সাধনাই স্বরাজসাধনা। এই পথেই আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে সত্যসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। তা না হলে সত্যের আবির্ভাবের যে অন্য পথ তা কুটিল, ভয়াল এবং রক্তপিচ্ছিল।

৪ কালান্তর : চরকা।

দুই বছর আগে বিলেতে থাকার সময় লণ্ডন হতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটি কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলুম। ম্যানেজারটি খুব চতুর, তিরিশ বছর ফার্ম চালিয়ে আসছে। ফার্মটি একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের। তার ঘরে গিয়ে যখন বসলুম, দেখলুম দু'চারটি ডিটেক্‌টিভ বই ও সস্তা গল্প ছাড়া সাহিত্যের আর বেশী কোনও নিদর্শন নেই, কিন্তু ভূবিদ্যা, soil chemistry, rotation of crops ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ইংলণ্ডে জার্মানিতে এবং অন্যত্র যেসব গবেষণা হচ্ছে সেসবের উপরই ইংরেজী বই বা অনুবাদ রয়েছে। সে জ্ঞানের কোনও অভাব হয় নি। এর উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন।

আসলে আমাদের শিক্ষাটা বড় একপেশে। এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের জন্য আমরা ইংরেজী শিক্ষার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। রামমোহনই প্রথম সেই দরজার সন্ধান দিয়েছিলেন। তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু সেইসময় থেকে বঙ্গসংস্কৃতি একটা নতুন মোড় ঘুরে গেল সে কথাটা বোধ হয় কেউ ততটা লক্ষ্য করেন নি।

সেটা হল সংস্কৃতির দিক্‌ থেকে বাংলার সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের পার্থক্য-ভবন। পুর্বে সংস্কৃত কাব্য শাস্ত্র ইত্যাদির ধারার পাশে পাশে একটি বিরাট্‌ ও বিপুল লোকসংস্কৃতির ধারা চলে আসছিল। তা ছাড়া সামাজিক পরিবেশটা প্রায় একই ছিল। তার উপর অর্থনৈতিক কাঠামোটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। মোটামুটি সকলেই এর অঙ্গীভূত ছিলেন। কাজেই মোটামুটি সকলেরই ধ্যান-ধারণা উদ্দেশ্য-লক্ষ্য আশা-আনন্দ একই ধরণের ছিল। অন্ততঃ এখন যতখানি পৃথক্‌ হয়ে গিয়েছে ততখানি ছিল না। সে পরিবেশে থাকা সম্ভবও ছিল না।

কিন্তু বাংলাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের আঘাতের পর সবই গেল বদলে। এই প্রসঙ্গে তিনটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

প্রথম, ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভিঘাত : অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্থার উপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আঘাত।

দ্বিতীয়, আমাদের সমাজের খণ্ডীভবন ; শহর ও গ্রামের ক্রমবর্ধমান পার্থক্য।

তৃতীয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের উদয় ; নীচের স্তরের বিলোপ।

এর ফলে আমাদের সংস্কৃতির দারুণ রূপান্তর ঘটে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুই-একটি কথা আলোচনা করি।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত

গ্রামীণ সভ্যতার উপর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত সংক্ষিপ্ত-ভাবে আলোচনার বিষয় নয়। তবু সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলি। আমাদের গ্রাম ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইজন্য গ্রামের সমাজও ছিল ঘনপিনদ্ধ। হয়তো আমাদের শ্রেষ্ঠীকুল বন্দরে বন্দরে নৌকো বাঁধতেন, হয়তো আমাদের সার্থবাহ চলত এশিয়ার বিভিন্ন মরুপ্রান্তরে। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক্ থেকে দেখলে এদের সংখ্যা বেশি নয়। অর্থাৎ social mode বা pattern-এর দিক্ থেকে বলা যায়, গ্রাম ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমাজ সে হিসেবে ঘনপিনদ্ধ। দূর-দূরান্তরে লোকের গমনাগমন খুব কম ছিল, সুদূর দেশের বাজারের জন্য পল্লীতে কেউ জিনিস উৎপাদন করত না—যা-ও বা করত (যথা মসলিন) তা-ও ইদানীং লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তেমনই, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে চাদরটা কাঁধে ফেলে চটিটা পরে (বা না পরেও) একবার এপাড়া ওপাড়া সকলের দ্বারস্থ হলেই চলত—এখনকার মত আত্মীয়-স্বজন হিল্লী দিল্লী বোম্বাইতে ছড়িয়ে ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যে

দেখা হত পরস্পরের সঙ্গে, হাজাশুকো হলে সকলেই সমান উদ্বিগ্ন; বান ডাকলে সকলেরই সমান সর্বনাশ, দোল-দুর্গোৎসবে সকলেরই সমান আনন্দ। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আক্রমণে আমাদের এই mode বা patternটাই গেল ভেঙে। অথচ তার জায়গায় নতুন বলশালী ধনতান্ত্রিক সভ্যতারও উদয় হল না, জন্ম নিল এক পঙ্গু বিকলাঙ্গ কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। এক শতাব্দী আগেও মার্ক্স বুঝতে ভুল করেন নি যে রেলপথ বিস্তার করে ইংরেজ ভারতবর্ষে এক সুদূর-প্রসারী বিপ্লব ঘটাচ্ছে। গ্রামগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সেইসঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ বাঁধন, গেল ভেঙে।

সেইসঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করবার। গ্রামের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হতে আরম্ভ হল। যা কিছু কুটীরশিল্প ছিল তা সব নষ্ট হয়ে সমস্ত লোক কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ল। অন্ততঃ ১৮২৫ সাল হতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ পড়তে লাগল অত্যধিক। জমির সন্ধানে গ্রাম বা এমন কি জেলা ছেড়ে বাইরে যাওয়া কিছুকালের মধ্যে আরম্ভ তো হলই (১৮৫০ সাল নাগাদ সুন্দরবন হাসিল আরম্ভ হয়েছে), সেইসঙ্গে বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে যাওয়াও যে শুরু হয় নি তাই নয়। হাণ্টার সাহেব লিখেছেন, ১৮৭০ সালেও বাঁকুড়া থেকে আসামে কুলি চালান হচ্ছিল।

সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাস অন্যরকম হয়ে গেল। মুসলমান আমলে সরকারী তহবিলের একমাত্র সম্বল ছিল ভূমিরাজস্বই, অন্য রাজস্ব থাকলেও তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কাজেই যতই অত্যাচার অবিচার থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী মুরগীটা কোনরকমে বেঁচে থাকে সে চেষ্টাটুকু না করলে চলত না। এর একটা পরিচয় পাওয়া যায় তকশীম আর হস্তবুদের তফাতে। মুসলমান আমলের প্রথম দিকে ছিল তকশীম, অর্থাৎ চাষী কর্তৃক উৎপন্ন ফসলের উপর রাজস্বের নিরিখ নির্দেশ।

ফসল না হলে বা কম হলে চাষীর গায়ে লাগত না। তারপর ব্যবস্থা বদলে গেল। স্থাপিত হল হস্তবুদ, অর্থাৎ চাষীর মোটামুটি আয়ের উপর নিরিখ। কাজের ক্ষেত্রে লাভ হোক আর নাই হোক দিতেই হবে। ইংরেজ এই হস্তবুদ ব্যবস্থা তো প্রচলন করলেনই, সেইসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং বিভিন্ন প্রজাস্বত্ব আইন এমনভাবে জুড়ে দিলেন যে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত চেহারাই গেল বদলে। পূর্বে জমির উপর শোষণকারী বহু শ্রেণী ছিল না—দু-একটি মাত্র ছিল। এখন বহু শ্রেণী গড়ে উঠল। দ্বিতীয়তঃ চাষী খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার পরও যদি কোথায়ও সামান্য একটু লাভবান হত সেটুকুও কেড়ে নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল ১৮৫৯ সালের রেন্ট-অ্যাক্টে।

এসবের মোদ্দা ফলটা হল এই যে, গ্রামে যেসব নতুন নতুন শ্রেণী জেগে উঠল তাদের আর কোনক্রমেই একটা বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যেও এক করা গেল না। খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে পড়ল ক্ষুরধার শান। উদ্দেশ্য উপায় লক্ষ্য আশা আনন্দ আর একমুখীন রইল না। চোরের আনন্দ রাত্রিকালে, মহাজনদের ও খাজনাপ্রাপকদের আনন্দ অনাবৃষ্টি-অজন্মায়, তা হলেই বাকী খাজনার দায়ে জমি ছাড়িয়ে অন্য লোককে চড়া সেলামিতে বন্দোবস্ত করা যাবে। গ্রামীণ সমাজ ভেঙে গেল। দোল দুর্গোৎসব আনন্দও ক্রমশঃ গেল মরে। প্রাণের আনন্দ না থাকলে তা মরবেই।

শহরের অভ্যুত্থান

পূর্বে তো শহরের তেমন প্রাদুর্ভাব ছিল না। যেসব শহর ছিলও তার সামাজিক অভিঘাত ছিল না, কেননা সমাজতাত্ত্বিকের ভাষায় তা ছিল কেন্দ্রীভূত ও বিবর্ধিত গ্রাম মাত্র। শহর বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তার যা বিচিত্র সভ্যতা, তার আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা চালচলন, আলাদা সমাজব্যবস্থা, আলাদা অর্থ নৈতিক

কাঠামো—এসব কিছুই ছিল না। আর সে শহর থেকে ঐসব বিশেষ-লক্ষণান্বিত চিন্তাধারাও গ্রামে প্রবেশ করে তার সমাজ ও জীবনকে পর্যুদস্ত করে নি। এক কথায় urban centres হয়তো ছিল, কিন্তু urban civilization-এর চিহ্নমাত্র ছিল না।

ইংরেজ আমলে সবই গেল বদলে। কাল্‌চারের কেন্দ্র নবদ্বীপ হতে সরতে সরতে ভাটপাড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হল শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণের ছত্রচ্ছায়ায়। অধিষ্ঠিত হল বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতা। তারপর ক্রমে ক্রমে হিন্দুকলেজ ও বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় তার চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। কালে কালে তা বর্তমান চেহারায় পৌঁছেছে।

সেইসঙ্গে দেখা গেল, কতকগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যাদের কোনও যোগই নেই গ্রামের সঙ্গে বা গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে। যেমন ইয়ংবেঙ্গল দল বা পরেকার ইঙ্গবঙ্গ বিলেতফেরৎ সম্প্রদায়। এঁরা বঙ্গসংস্কৃতির শহুরে শাখার শাখাচারী। কিন্তু এঁদের নয়ন-লোভন চাকচিক্য তো বটেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এঁদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারা ও নতুন সজীব সভ্যতার স্পর্শপ্রবাহকে আমাদের জীর্ণ আচারের ঠুন্‌কো বেড়া ঠেকাতে পারল না। তা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

ভাসিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। এইখানেই বঙ্গসংস্কৃতির অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড একটা বিভেদ দেখা গেল,—যা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। সেই কথাটিই পরের অনুচ্ছেদে আলোচ্য।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের উদ্ভব

পশ্চিমী সভ্যতা ও আর্থিক ব্যবস্থার আলোড়নে এদেশে যে সমুদ্রমন্থন হতে লাগল তার আর কিছু উঠুক আর নাই উঠুক,

সকলের চোখ ঝলসিয়ে দিয়ে উঠল বাংলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রত্যেক দেশেই বুদ্ধিজীবীর দল সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হতেই উদ্ভূত,—সমাজনেতৃত্ব, অর্থাৎ চিন্তাজগতের নেতৃত্বও—বেশির ভাগ সময়েই তাদেরই হাতে থাকে। এ হল প্রায় সর্বজাগতিক সত্য। সে হিসেবে এখানেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হবে তা কিছু আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু এখানকার বিশেষত্ব এই যে, এখানে মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য ছিল না, গড়লও না। অন্যত্র অন্যান্য শ্রেণীও থাকে, যারা সংস্কৃতির অগ্রগামী না হোক্, তার ধারক ও পোষকও অন্ততঃ বটে। কিন্তু এখানে তার চিহ্নমাত্রও রইল না। ফলে উপর ও নীচে অনেকখানি সংস্পর্শবর্জিত হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ আকাশ-আলো-করা ফুলের মত ফুটে রইল—কিন্তু যেদিন সে ফুলের আয়ু ফুরোবে সেদিন দেখা যাবে তার নূতন প্রাণরস আহরণ করার মত শিকড় নেই।

বস্তুতঃ ঘটেছে তাই। ইংরেজী শিক্ষার মারফৎ নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পেয়ে দীপ্ত চিত্তের মুক্ত বাণীর আস্বাদলাভ করে এই বাঙালী মধ্যবিত্ত মনের ক্ষেত্রে যে অপরূপ সোনার ফসল ফলিয়েছে তার তুলনা নেই। এত স্বল্প সময়ে এত অত্যুজ্জ্বল কাব্য সাহিত্য দর্শন ভাষা সৃষ্টি করা অন্যত্র কোথায়ও সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সেইজন্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অনন্য, তার জুড়ি মেলা সহজ নয়।

কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই অপূর্ব এবং অত্যুজ্জ্বল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রসবেত্তা এবং উপভোক্তা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, তার সমগ্র সমাজে রসাস্বাদনের প্রবেশ ব্যাপৃত নেই। পূর্বে এইটি ছিল না। তখনকার সাহিত্য এত উঁচু দরের ছিল না নিশ্চয়ই, কিন্তু সে সাহিত্যের রস আস্বাদন করত সমাজের এক সুবিপুল অংশ—তখন পাঠকদের মধ্যে এমন শ্রেণীবিন্যাস হয় নি।

কীর্তিবাসের রামায়ণ যেমন বড়লোকের বাড়িতেও পড়া হত, পণ্ডিতেরাও উল্‌টেপাল্‌টে দেখতেন, আবার মুদীর দোকানেও তা পড়ার কমতি ছিল না, সাধারণ চাষীমজুরও তা শুনে উপভোগ করত। তেমনি কীর্তন বা রামায়ণ গান। অর্থাৎ এসবের ব্যাপ্তি ছিল বিভিন্ন স্তরে,—আর তখন স্তরবিন্যাসও এত কঠিন হয় নি, শ্রেণী হতে শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানও এত দুস্তর এবং দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না।

অথচ কালক্রমে আজ তাই ঘটেছে। মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির এই অত্যদ্ভুত বিকাশ যেমন একদিকে ঘটে চলেছিল অন্যদিকে, আমরা লক্ষ্য করি নি, আমাদের সমাজের নীচের দিক্ গেছে ক্রমশঃ অন্ধকারে তলিয়ে—অন্ধকার হতে আরও অন্ধকারে। পূর্বে সংস্কৃতির ব্যাপকতা ছিল বেশি, তার উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পাশে পাশে একটি বিরাট ও বিপুল লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজের সকল স্তরকে সজীব এবং সরস রাখছিল। এখন এসবের অন্ত ঘটল। তেমনি সামাজিক গঠনের দিক্ দিয়েও দেখা যায়, পূর্বে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাপে সকলে মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন, একই ধরণের অনুভবের স্পন্দন অনুভব করতেন এখন তা-ও আর রইল না। বস্তি-নিবাসী চটকলের কুলির জীবনের অনুভূতি বা স্পন্দনের সঙ্গে গ্রামের চাষীর জীবনের অনুভূতি বা স্পন্দনের মিল নেই—পরস্পরের মধ্যে অনুভবসামান্যের অভাব ক্রমশঃই সুপরিস্ফুট। তেমনি যারা আজীবন দক্ষিণ কলকাতার ঝক্‌মকে ফিটফাট বাড়িতে টেলিফোন-রেডিও-রেফ্রিজিরেটর পরিবৃত হয়ে কাটিয়েছে এবং শেয়ারবাজারে ব্যবসা করে দিন চালিয়েছে তাদের পক্ষে আর যাই হোক্ ধানগাছের তক্তা হয় বলা কিছুই বিচিত্র নয়। আসল কথা, অনুভূতির খণ্ডীভবন এবং সেইসঙ্গে সংস্কৃতিরও খণ্ডীভবন হচ্ছে। এর উপর যদি এই-সব খণ্ডিত সমাজশ্রেণীর প্রসরণের বদলে সংকোচন দেখা দেয় তা হলে সংস্কৃতির খুব গভীর সংকট দেখা দেওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। আজ

সেইজন্ত মনে হয় বাংলা সংস্কৃতি যখন গত শতাব্দীতে মোড় ঘুরেছিল তখন যদি সে কেবল মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি না হয়ে ব্যাপকতর প্রসারলাভ করত তা হলে কি হতে পারত! কিন্তু যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে শোক করা বৃথা—এখন, বিশেষতঃ যখন মধ্যবিত্ত সমাজ ক্ষীয়মান, তখন ভাবতে হবে আমাদের কি কর্তব্য।

সংস্কৃতির ছন্দ

সংস্কৃতির ছন্দ আছে। সে কখনও ওঠে কখনও পড়ে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিবর্তনের ফলে তার চেহারাও বদলে যায়। এই বদলের নানাবিধ কারণ আছে, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ সমাজ-বিন্যাস। আদিম যুগে যে সংস্কৃতি ছিল আজকের উদজানবোমা-এরোপ্লেনের যুগে সে সংস্কৃতি থাকতেই পারে না। মানুষের জীবন ও মননই সংস্কৃতির প্রাণ, সেই জীবন ও মননের ধারার বদল হলে ভিতরে বাইরে সর্বত্র তার প্রতিফলন হবেই।

পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই এ পর্যন্ত অগ্রণী হয়ে এসেছে। ঐতিহাসিক পোলার্ড বলেছেন, শহুরে সভ্যতা ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় না থাকলে মধ্যযুগীয় অন্ধকার হতে আমরা মুক্ত হতেই পারতাম না। Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history....where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation. বিদেশেও এই হয়েছে, এদেশেও এই হয়েছে। অবশ্য পার্থক্যের মধ্যে এই যে সেখানে সংস্কৃতিরসিক হবার উপকরণ (যথা শিক্ষা) জনসাধারণের মধ্যে ছিল, এখানে তা ছিল না।

কিন্তু আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা জগতেই মধ্যবিত্তের অন্তিম দিন মোটামুটি ঘনিয়ে এসেছে। এই ইতিহাস পূর্ব হতেই মার্ক্স

বুঝতে পেরেছিলেন। সাম্যবাদীর ঘোষণাপত্রিকায় তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ক্রমে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী মজুরশ্রেণীতে পরিণত হবে—The lower strata of the middle class—the small trades-people, shopkeepers and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat. আজ বাংলার সমাজবিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না। শুধু বাংলায় কেন, অন্যান্য দেশেও এসব বদল অল্পবিস্তর ঘটছে, তবে অন্যভাবে ঘটছে। সেকথা এখানে আলোচ্য নয়।

এই ধারা চলতে থাকলে কেবল আত্মরক্ষার্থেও মধ্যবিত্তসমাজের জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত-সংস্কৃতিকে প্রকৃত জনসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই জনসংস্কৃতি তথাকথিত folk-culture নয়, যেখানে আমরা কিছু ছেঁড়া কাঁথা আর অচল পট সাজিয়ে রেখে আনন্দ অনুভব করি। কথাটা mass cultureও নয়, কারণ mass বস্তুটি হল অবৈশেষিক, ব্যক্তিত্বের চিহ্নবর্জিত, তাদের আবার সংস্কৃতি কি? জনসংস্কৃতি অন্য জিনিস। আর অর্থ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপকরণ কয়েকটি লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না, সকলেরই আয়ত্তাধীন হবে। ফলে সংস্কৃতি আরও ব্যাপক এবং গভীর হবে।

কিন্তু জনসংস্কৃতির এই যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজন বা তাগিদ শুধু যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দিক্ থেকেই আছে তাই নয়, উল্‌টো দিক্ থেকেও আছে। অর্থাৎ সমাজের দিক্ থেকেও আছে। শুধু মধ্যবিত্তের সুস্থ রূপান্তর ঘটাবার জন্যই যে আমাদের সেদিকে অগ্রসর হতে হবে তাই নয়, সমাজকে বাঁচাতে হলেও আমাদের সেদিকে অগ্রসর হতে হবে। কথাটা একটু ব্যাপকভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

এককাল ছিল যেকালে আমরা সমাজের তথাকথিত অভিজাত-

শ্রেণীর মুখ তাকিয়েই থাকতাম। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এ ইতিহাস অনেক কালের ইতিহাস—যুগ যুগ ধরে এই ইতিহাস চলে এসেছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর এবং উদারতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার প্রথম যুগে ব্যক্তির জয়গান উন্মুখর হয়ে উঠবার পর এ আদর্শ গেল ধীরে ধীরে বদলে—তখন ক্রমে ক্রমে শুরু হল মনুষ্যত্বের জয়গান, মানবতার মহিমাকীর্তন। মানবমহিমার এই অভ্যুদয় এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের ফলে শুধু যে আদর্শের বদল হয়েছে তাই নয়, বিদ্যার কুলগত অধিষ্ঠান বা গোষ্ঠীগত অধিষ্ঠানেরও অবসান ঘটেছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া পণ্ডিত হতে পারবে না, জমিদার ছাড়া বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক হতে পারবে না, এইসব বাধা আজ দূরীভূত।[১] তার বদলে বরং শ্রেণীগত বাধা বড় হয়ে উঠছে। আজও আমাদের দেশে শতকরা আশীজন লোক অশিক্ষিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আস্বাদন হতে তারা বঞ্চিত। মানবতার যে জয়গানে আজ কাব্য সাহিত্য মুখর সেই জয়ধ্বনির ক্ষীণ রেশও তাদের অন্তরে উপলব্ধি করবার সুযোগ ঘটছে না। অথচ যখন আমাদের আদর্শ মনুষ্যত্বের মহিমা বিস্তার তখন মুখে সেই আদর্শের কথা বলব অথচ কাজে সেই মহিমা অহরহ খর্ব হতে থাকবে—এই দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যে আর যাই হোক্ আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার ঘটতে পারে না। তার মূলে প্রাণরসের সঞ্চয় এ অবস্থায় দুদিনেই ফুরিয়ে যাবে।

সমাজের সাধারণ অবস্থাই তো এই, কিন্তু যাদের ভাগ্যে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ ঘটেছেও তারাও আজ নানা কারণে বিপর্যস্ত। অধ্যাপক ম্যানহাইম খুব সুন্দর করে এই কথাটা বলেছেন—

১ এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত বিনয় ঘোষ লিখিত "বাংলার বিদ্বৎসমাজ" (চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ, ১৩৬২) দ্রষ্টব্য।

'The fact that in a functionally rationalized society the thinking out of a complex series of actions is confined to a few organizers, assures these men of a key position in society. A few people can see things more and more clearly over an ever-widening field, while the average man's capacity for rational judgment steadily declines once he has turned over to the organizer the responsibility for making decisions. In modern society not only is the ownership of the means of production concentrated in fewer hands, but as we have just shown, there are far fewer positions from which the major structural connections between different activities can be perceived, and fewer men can reach these vantage points.

This is the state of affairs which has led to the growing distance between the elite and the masses, and to the "appeal to the leader" which has recently become so widespread. The average person surrenders part of his own cultural individuality with every new act of integration into a functionally rationalized complex of activities. He becomes increasingly accustomed to being led by others and gradually gives up his own interpretation of events for those which others give him.

When the rationalized mechanism of social life collapses in times of crisis, the individual cannot repair it by his own insight. Instead his own impotence reduces him to a state of terrified

helplessness. In the social crisis he allows the exertion and the energy needed for intelligent decision to run to waste. Just as nature was unintelligible to primitive men, and his deepest feelings of anxiety arose from the incalculability of the forces of nature, so for modern industrialized man the incalculability of the forces at work in the social system under which he lives; with its economic crises, inflation, and so on, has become a source of equally pervading fears.

(Mannheim : *Man & Society*, pp. 58-59)

আমাদের দেশের অশিক্ষিতদের তো কথাই নেই, ওদের দেশে সুশিক্ষিতদের মধ্যেও এইরকম দিশাহারা অবস্থা! এই অর্থনৈতিক গঠনে তারা নিজের বিচার-বিবেচনা করার বদলে অপরের উপর নির্ভর করে থাকাই শ্রেয় মনে করে। আমরা তো সব বিষয়েই অপরের মুখ তাকিয়ে থাকি। আমাদের দেশে গুরুবাদ বা অবতার-বাদের শিকড় তো আরও গভীর—তা কোনোকালে উৎপাটিতই হয় নি। তবুও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যেও আবার এই গুরুবাদ বা অবতারবাদের পলায়নী মনোবৃত্তি আবার খুব প্রবল হয়ে উঠছে। এ শুধু যে complex economic organisationএর ফল তাই নয়, সামাজিক সংঘর্ষেরও ফল। যে সমস্যা আমাদের সামনে উপস্থিত তাকে এড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা। নিজের স্বাধীন বুদ্ধির যুক্তিনিষ্ঠ যে পরিচালনার জন্য উনিশ শতকের সমস্ত বাঙালী মহাপুরুষ উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, যে যুক্তিনিষ্ঠতার ফলে আচারের বেড়াজাল ভেদ করে রামমোহনের নব ধর্ম আবিষ্কার, যে দীপ্তবুদ্ধি ও উজ্জ্বল যুক্তির চরম উদাহরণ বিদ্যাসাগর, সংস্কারমুক্ত চিত্তের যে স্বারাজ্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক—আজ আমরা সে সবই ত্যাগ করে

জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজের যুক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহস না করে অপরের নির্দেশের আওতায় এবং পরনির্ভরতায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিপূজা বাড়ে। গুরুবাদ ও অবতারবাদের সাম্প্রতিক প্রসার তারই লক্ষণ। এটা সমাজের পিছু হটবার লক্ষণ, অগ্রসর হবার নয়। ম্যানহাইম স্পষ্টই বলেছেন, এই অবস্থায় মানুষ তার সাংস্কৃতিক বিকাশ বন্ধ রেখে পরনির্ভর হয়ে পড়ে। সংস্কৃতির বিকাশের পরিবেশ এ নয়।

প্রতিকারের উপায় : সামাজিক মুক্তি

ম্যানহাইম বলেছেন—

The social sphere consists of two completely different parts each of which affects the cultural process in its own way.

(a) First, we have the free, unregulated part of social life, which, in its spontaneous forms, moulds intellectual and cultural life.

(b) Secondly, we have those social organizations which, in the cultural sphere take the shape of institutions. We are thinking here of the influence which churches, schools, universities, research institutes, press, radio and all types of organized propaganda exert upon intellectual and cultural life.

Cultural life in modern, liberal mass-society is ruled mainly by the laws peculiar to an unregulated social order, whereas in a dictatorially governed mass-society it is the institutions which have the greatest influence on social life.

(Mannheim : *Ibid*, p. 81)

অবশ্য ম্যানহাইম নিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত সমাজের যে ভাগ করেছেন আজ সে বিভাগ ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং 'উদার-নৈতিক গণতান্ত্রিক' দেশগুলিতেও শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। আমাদের মত পশ্চাৎপদ দেশে সজ্ঞান চেষ্টা তো চলতে বাধ্য। কিন্তু তা হলেও মোটামুটি ঐ একটা ভেদরেখা থাকেই। কাজেই সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির সহায়তা করতে গেলে দেখতে হবে উভয় দিক্ হতেই সে বিষয়ে সাহায্য হয়। সুস্থ সামাজিক পরিবেশ না হলেও সে অগ্রগতি হয় না, সেইসঙ্গে শিক্ষার প্রকৃত বিকিরণ না হলেও সে অগ্রগতি হয় না।

সেইজন্য প্রথমে চাই সামাজিক মুক্তি। অর্থাৎ সর্বদা বাইরের পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবার অস্বস্তিকর অবস্থা হতে পরিত্রাণ। যে সময় এই সংঘর্ষ চলতে থাকে সে সময় মানুষের মন হয় বিরক্ত, সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ তা নয়। তাছাড়া একটা যুদ্ধকালীন পরিবেশ থাকলে লোকে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়, চিন্তা করে না। বস্তুতঃ আজকাল অনেক সময় কাব্যে সাহিত্যে এবং শিল্পে দুর্বোধ্যতার এত ছড়াছড়ি, obscurantismকে প্রায় একটা আদর্শ হিসেবে পূজো করা হচ্ছে তার পিছনে এই সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই নেই। বাইরের পরিবেশ যখন অস্বস্তিকর, সংঘর্ষ যখন পদে পদে, সে সময় মন বহির্মুখী হতে চায় না, ভিতরে লুকিয়ে পড়ে, বড় জোর সৃষ্টি করে আমিময় কাব্য, আনন্দ পায় দুরূহতায়। সৃষ্টির প্রধান কার্যই হল একের কথা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা, তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হল প্রকাশিত হওয়া। কিন্তু এখানে পাঠক-সমাজকে আনন্দের অংশীদার করবার জন্য কাব্য রচনা করা হয় না, সৃষ্টির প্রধান কার্যকেই অস্বীকার করবার চেষ্টা চলতে থাকে পদে পদে। আমি যা ভেবেছি যা লিখেছি আমার জন্য তাই যথেষ্ট, অন্য লোকে সে আনন্দ অনুভব করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে

যায় না। অ্যাবস্ট্রাকশন খুব ভাল জিনিস, যতক্ষণ তা ইঙ্গিতের ভরে দর্শক-পাঠকের মনকে নানা রসে উদ্রিক্ত করতে পারে। কিন্তু সেটা পারা চাই। কাব্য-সাহিত্যে বক্রোক্তি জীবিত তো নিশ্চয়ই, কিন্তু সে বক্রোক্তি ততক্ষণই গুণ যতক্ষণ সে ধ্বনির সহায়ক, ব্যঙ্গার্থের উদ্দীপক। কিন্তু যদি সেই বক্রোক্তি দুরূহতার এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে সময় কবির ইশারা পাঠক ধরতেই পারেন না, গবেষণা করতে করতেই সময় কেটে যায়, পাঠকের সঙ্গে লেখকের উদ্রিক্ত রসের ভূমিতে একাত্মতা হবার উপায় থাকে না সেখানে আর যাই হোক্ রস সৃষ্ট হয় না—মহৎ সাহিত্য তো নয়ই। মহৎ সাহিত্য তো এইজন্যই চিরকাল কমবেশি elemental. কেবল সূক্ষ্ম বিচার দিয়ে কখনও মহৎ সভ্যতা বা সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয় নি—তার জন্য সজীব বলিষ্ঠ মন ও প্রসরণশীল সমাজ চাই। এইজন্যই সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারের জন্য চাই সামাজিক মুক্তি। তার উপায় এবং পদ্ধতি সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক, সেইজন্য তার বিশদ আলোচনা এখানে অবান্তর হবে। তবে এইটুকু বলতে পারা যায়, বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তা হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যখন এদেশে ধনতন্ত্র কোনকালে ঠিকমত জন্মালোই না, তার দোষগুলিই পেল গুণগুলি নয়। অবস্থাবিশেষে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি যে অত্যুজ্জ্বল রূপ বাংলাদেশে লাভ করেছিল সে আর ফিরে আসবে না, কালক্রমে ক্ষয়েই যাবে। কাজেই ভবিষ্যতে সংস্কৃতির বিকাশের পথ আর এই বিশিষ্ট শ্রেণীর সংকীর্ণ গলিপথে নয়, তা সবাইকে নিয়ে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে এবং নতুন পথে। তাতেই নতুন প্রাণরসের সন্ধান পাওয়া যাবে, নতুন ছন্দের সন্ধান মিলবে। বস্তুতঃ এ মধ্যবিত্তও ফিরবে না, এমন কি সেই প্রাচীনকালের গ্রামসমাজও নয়। কাজেই আমাদের দৃষ্টি অতীতে না নিবদ্ধ রেখে ভবিষ্যতে ফেরাতে হবে। অর্থাৎ এমন সমাজ চাই

যার ভবিষ্যৎ আছে। জীবনে আনন্দ আছে, কাজে সজীবতা আছে, ভবিষ্যতের আশা আছে। এই পরিবেশেই বলিষ্ঠ মানুষ তৈরী হয়, জীবনে গান আসে ছন্দ আসে, নতুন সংস্কৃতি রচিত হতে থাকে, সমাজ এগোতে পারে।

প্রতিকারের উপায় : শিক্ষা

ম্যানহাইম-কথিত দুটি দিকের মধ্যে প্রথম দিক্‌টা হল অনির্দিষ্ট, যেটা হল সামাজিক দিক্। সে কথা উপরে আলোচনা করেছি। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটি দিক্ আছে সে হল প্রতিষ্ঠানগত দিক্, যথা বিশ্ববিদ্যালয় ইস্কুল কলেজ, যার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচিত হতে থাকে। প্রথমটির যোগাযোগ পরোক্ষ, শেষেরটির প্রত্যক্ষ। যেখানে যোগাযোগ পরোক্ষ সেখানে উপকরণ এবং উদ্যমও অনেক বেশি চাই, অনেক দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই। তা নিয়ে রাষ্ট্রনীতিক ও সমাজসংস্কারকেরা চেষ্টা করতে থাকুন। কিন্তু যেখানে যোগাযোগ প্রত্যক্ষ সেখানে কাজের উপকরণ সহজ এবং সংস্কারের প্রয়োজনও বোধ হয় দ্রুত।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই নে, কারণ এ নিয়েও বিস্তর পুঁথি লেখা হয়েছে এবং হওয়া দরকারও। সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করব।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এই নিয়ে তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। সে তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান্ উক্তি উদ্ধৃত করি—

> "ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই; বিদ্যারই কী আর বিষয়েরই কী, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে, তখনই

সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে—নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে।”

(রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা)

শিক্ষার সর্বকালীন আদর্শ তো এই-ই, পূর্ণ মানুষ গড়া। স্বাধীনতার পর তো এর আরও বেশি দরকার। কবির ভাষায়, “আজ হইতে ‘ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ’—হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি; ‘ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা’ —হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি—পরের বচন দিয়া না দেখি।” বিদ্যার কোনও সার্থকতাই নেই যদি না মানুষের চোখ কান না খোলে—তার মনন ও চিন্তন যদি পূর্ণভাবে বৃদ্ধি না হয়। আসল কথা, গোটা মানুষ চাই।

কিন্তু গোটা মানুষ গড়ব কি করে? আমাদের শিক্ষার প্রধানতম দোষ হচ্ছে আমরা কিছু বিদ্যা গিলিয়ে দিতে চেষ্টা করি, কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত বিশিষ্টতাকে বিকশিত করে এমন মানুষ গড়বার চেষ্টা করি নে যে মানুষ সম্পদে বিপদে তার পথ রচনা করে নিতে পারে। এক কাল অবশ্য ছিল যে সময় বার্ক-শেক্‌সপীয়র পড়লে জ্ঞানলাভও হত, চাকরিও হত। বি. এ. পরীক্ষার সিংহদরজা পার হতে পারলেই সরস্বতী এবং লক্ষ্মী উভয়েরই কৃপা লাভ করা কঠিন ছিল না। আজ অবস্থা একেবারে বদলে গিয়েছে, লক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছেন, তবু আমরা সেই শিক্ষার খাঁচার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে কসুর করছি নে। অথচ একথা সকলেই অনুভব করে থাকেন, ছাত্র ও অভিভাবক সমাজ তো সর্বদাই নালিশ করেন, যে এই বিদ্যার চর্চা করতে গিয়ে হতাশ্বাস ছাত্রসমাজ সরস্বতীর চর্চাটুকুও ভাল করে করে না। অর্থ না হয় না-ই হল, যেটুকু বিদ্যা শিখছ সেটুকু অন্ততঃ ভাল করে অর্জন কর—

সে অবস্থাও বর্তমানে নেই। না আছে লক্ষ্মীর উপাসনা, না আছে সরস্বতীর সেবা—একেবারে ইতো নষ্টস্ততঃভ্রষ্টঃ। এই অবস্থায় আমাদের সংস্কৃতি যে চূর্ণবিচূর্ণ হবে, কোনও বৃহৎ ও মহতের আহ্বানই আমাদের কানে বাজবে না, আমরা আমাদের বিকাশের চেষ্টায় ব্যস্ত না থেকে ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণুতার অতল গহ্বরে ডুবে যাব সে কথা বলবার জন্য কোনও দৈবজ্ঞের প্রয়োজন করে না।

এর জন্যও প্রয়োজন সামাজিক কাঠামো বদলাবার। শিক্ষা দেবার কি উদ্দেশ্য? সমাজের চাহিদা আর বিদ্যায়তনের সরবরাহের মধ্যে একটা মোটামুটি মিল থাকা চাই। বর্তমান কাঠামোতে দরকার এতজন স্থপতি বা এতজন শিক্ষক, অথচ ছাত্র পাস করছে একদিকে অনেক কম অন্যদিকে অনেক বেশি, এই গরমিল যত কম হয় ততই ভাল। এমন মানুষের সুপ্ত শক্তিকে চিনে নেবার এবং বিকশিত করবার কোনও ব্যবস্থাই নেই, সে ধরনের শিক্ষক বা শিক্ষায়তনও বেশি নেই—কাজেই রাজ্যসুদ্ধ লোক সেই চিরাচরিত পথে বি-এল্-এ রে হতে শুরু করে পর পর পরীক্ষার চৌকাঠে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে এগোতে কেউ বা মাঝপথে ভঙ্গ দেয় কেউ বা কোনরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হয়ে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশ ও পূর্ণতা হবে না।

সেইসঙ্গে একথাও আর একবার স্মরণ করবার দরকার হয়েছে, এই শিক্ষার অধিকাংশই হবে আমাদের মাতৃভাষায়। জনসাধারণকে যদি পেতে হয় তা হলে তাদের মাতৃভাষাতেই তাদের কাছে চিৎ-প্রকর্ষের ইতিহাস পৌঁছে দিতে হবে। আর জনসাধারণকে না পেলে সংস্কৃতি বাঁচবে না। এই অবিসংবাদিত নীতিকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে এই কারণে যে মুখে আমরা এই নীতির যত স্তুতিগান করি কাজের বেলায় ঠিক ততটাই অবহেলা করে চলেছি। সবচেয়ে

আশ্চর্যের কথা, এখনও চলেছি। দেশময় উত্তাল তর্ক চলেছে আমাদের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, কোন স্তর থেকে হিন্দী পড়ানো হবে, কোন স্তর থেকে ইংরেজী। মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গিমার এমন শোচনীয় ভয়াবহতা আর কখনও লক্ষ্য করা যায় নি। রাষ্ট্রভাষা হল তো রাজ্য-চালনার ভাষা, তা মানুষের বিকাশের প্রধান উপকরণ নয়। দেশসমেত লোক নিশ্চয়ই সরকারি চাকরি করবে না বা আন্তঃরাজ্য কারবারে লিপ্ত থাকবে না। যে যে শ্রেণীর সে প্রয়োজন আছে তাঁরা হিন্দী শিখুন ইংরেজী শিখুন জার্মান শিখুন রাশিয়ান শিখুন, চাই কি কামস্‌কাটকার স্থানীয় ভাষা শিখুন—তাতে কারও আপত্তি নেই। তাঁদের সেই ভাষা শেখার নির্বাধ সুযোগ হোক্ একথাও সকল শিক্ষাবিদ্‌ই কামনা করবেন। কিন্তু যদি কেউ বলে বসেন এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীই সমস্ত ভারতবর্ষ তা হলে তার চেয়ে একচক্ষুতা আর কিছুই হতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের কি রাষ্ট্রনৈতিক কি অর্থনৈতিক কি সাংস্কৃতিক বিকাশ আর মধ্যবিত্তের চৌহদ্দির মধ্যে হবে না—এমন কি বাংলাদেশেও নয়। সুতরাং সেই চৌহদ্দির বাইরে যারা রইল তাদের বিকাশকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের বিকাশই ব্যাহত হবে। আর সে বিকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমেই হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।······মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির একভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেদিন য়ুরোপের বড়দিন······বিশেষ

কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে—সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার জন্যে নয়, আত্মপ্রকাশের জন্যে।”

—বাংলাভাষা পরিচয়, ৮ম অধ্যায়

অতএব সেই গোড়ার কথায় ফিরে আসি। ইংলণ্ডের সেই কৃষিক্ষেত্রের ম্যানেজারের মত, আমাদের বলতে পারার অধিকার চাই যে আমাদের মাতৃভাষায় আমাদের মনের দরজায় দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার পরিচয় পৌঁছে দিতে হবে। আমরা সে পরিচয় পাবার জন্য আগে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করবার দুরূহ সাধনা করব, তার পর তার কিছু কিছু আস্বাদ লাভ করব,—এটা কোনো কাজের কথা নয়। ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রের ম্যানেজারকে জার্মান শিখতে হয় না ভূমি-রসায়নের সব খবর জানবার জন্য, ইংরেজীতেই সে তা পায়। তেমনি আমাদেরও পল্লীগ্রামের চাষী ঘরে বসেই মাতৃভাষায় জানতে পারবে ভূমি-রসায়নের মোদ্দা কথা, ব্যবহার করতে পারবে তাকে কাজের ক্ষেত্রে, পল্লীগ্রামের শিক্ষককেও দেশবিদেশের বিভিন্ন চিন্তাধারা শিল্পধারা আর্টের ধারা জানবার জন্য অন্য ভাষার দ্বারস্থ হতে হবে না। এতেই আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তির প্রসার, এতেই আমাদের বর্তমান সংকটের উত্তরণ, এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির পথরচনা।

সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কি, তা এক কথায় বলা যায় না। এলিয়ট বলেছেন, শিল্প সাহিত্য অভিনয় হতে শুরু করে বেশবিন্যাস, এমনকি স্যালাড সাজাবার ধরনটি পর্যন্ত, সংস্কৃতির পরিচায়ক। ফুলের গন্ধ যেমন হাওয়ায় ভাসে, তাকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় না, সংস্কৃতির ব্যাপার খানিকটা তেমনি। তার নানাভাবে বাহ্যপ্রকাশ আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন্‌টা ভালো এবং কেন ভালো, আর কোন্‌টি রুচির মানদণ্ডে ওৎরালো না তার লক্ষণ মিলিয়ে বিধান রচনা করা যায় না।

সংস্কৃতির সত্তা এইরকম খানিকটা অনির্বচনীয় হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির বিচার অসম্ভব নয়। তার অনেকগুলি বাহ্যপ্রকাশ আছে। যেমন, গান অভিনয় কবিতা, এমন কি, বেশভূষা ও চালচলন। কালে কালে, দেশে দেশে, অথবা গোষ্ঠীবিভেদ অনুসারে এগুলির চেহারাবদল হয়ে থাকে। বোঝা যায়, পৃথক মন বা পৃথক জীবনদর্শন তাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিক বা বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল অবলম্বন করে তা প্রকাশ হতে চাইছে। এর মধ্যে যেগুলিতে মানুষের হৃদয় আনন্দ পায়, বলে ওঠে—আহা, শেষপর্যন্ত তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। কেননা, শেষপর্যন্ত, এইসব বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই নেই যে, সচেত-সামনুভবঃ প্রমাণস্তত্র কেবলম্‌। সচেতস্‌দের অনুভবই সেখানে একমাত্র প্রমাণ।

সংস্কৃতির এইসব লক্ষণ ও উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত আলোচনা করলে দেখা যাবে, সংস্কৃতির বিকাশের মোটামুটি কয়েকটি নিয়ম আছে, যাকে সাধারণ নিয়ম বলা যেতে পারে। আজকাল এই কথাই স্বীকৃত যে, সংস্কৃতির বিকাশ সরলরেখার

উর্ধ্বগতি নয়, তার বিকাশরেখার অলাতচক্রের চংক্রমণ গতি। ঘুরে ঘুরে সে চলে, কিন্তু ঘুরে সে আর পূর্বের বিন্দুতে আসে না, হয় পূর্ববিন্দুর উপরে অথবা নীচে গিয়ে হাজির হয়। সমাজ জটিল ব্যাপার, মানুষের মন আরও জটিল, এই দুয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে সেই জটিলতা আরও বাড়ে। কাজেই সেই জটিলতার মধ্যে সংস্কৃতির রেখা ঘুরে ঘুরে চলবে না, একেবারে টানা লাইনে উপরের দিকে উঠে যাবে—এমন কথা হতেই পারে না। বস্তুতঃ টানা লাইনের সমর্থন করা মানে এইসব জটিলতার দিকে চোখ বুজে থাকা। যার কোনো অর্থই হয় না, বিশেষতঃ আজকালকার যুগে।

কথাটির আর-একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত সোরোকিন বলেছেন, জৈবসত্তায় বা বস্তুতে শুধু বস্তু আছে, প্রাণসত্তার মধ্যে বস্তুও আছে প্রাণও আছে। কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে শুধু এ দুটি থাকলেই চলবে না, আরও কিছু চাই। তার মধ্যে একটি 'অ'-বাস্তব পদার্থও চাই, যা বস্তুর অতীত, এক হিসেবে (শুধু জীবনধারণের অর্থে) প্রাণেরও অতীত, যার নাম অর্থ। উদাহরণ দিতে গিয়ে সোরোকিন বলেছেন, বই হিসেবে প্লেটোর গ্রন্থাবলীর কিছু রাসায়নিক মূল্য আছে (যেমন কাগজ); কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণ কেবলমাত্র ইঁদুর ও পোকাদের, অন্য কারও নয়। তেমনি শুধু অর্থবোধ করে পড়লেও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না, কেননা, বলা যায়, একটা এক শো টাকার নোট হাতবদলের অর্থ ঋণশোধ হতে শুরু করে চুরি পর্যন্ত সবই হতে পারে। আসল কথা, তাৎপর্য বোঝা চাই। সেইখানেই চিন্তা আরম্ভ হয়, এবং সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। শুধু চিন্তা নয়, সেই অনুসারে কাজও। শুধু বসে বসে ভাবনা নয়, সেই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আচরণও। এ রকম বেশি লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁরাই

সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা এবং ধারক।[১] তা না হলে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় না। আমি বৌদ্ধধর্ম ও আচরণ সম্বন্ধে পুঁথি পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু এই শুষ্ক জ্ঞানই আমায় বৌদ্ধ শীল ও সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ করবে না, যদি না আমার জ্ঞানের সঙ্গে অনুশীলনও থাকে।

সংস্কৃতির এই ক্রিয়া স্বীকার করলে আরও কয়েকটি কথা স্বীকার করতেই হয়। প্রথম কথা হল সমাজ এবং গোষ্ঠী। সমাজ ছাড়া অনুশীলন হয় না, তার উপর আজকাল সমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত—নানা গোষ্ঠীতে; তার মধ্যে কোনো গোষ্ঠীর প্রভাব বেশি কোনো গোষ্ঠীর কম। কাজেই আদিম যুগে হয়তো গোটা সমাজটাকে ধরলেই চলত, কিন্তু এ যুগে তা চলে না। সুতরাং সংস্কৃতির বিচারে প্রথম বিচার সামাজিক বিচার ও গোষ্ঠীগত বিচার। তাদের মধ্যে যোগ সুস্পষ্ট।

কিন্তু এই যোগ খুঁজবার সঙ্গে-সঙ্গে তার বিপ্রয়োগও দেখতে হবে। কারণ সমাজের গতি ও সংস্কৃতির গতি সব সময়ে সমান স্তরে থাকে না, এমন কি সব সময় এক দিকেও চলে না, সমান বা সমান্তরাল গতিতেও চলে না। পূর্বেই বলেছি, সংস্কৃতির বিকাশ হয় চক্ররেখায়। তার কারণ এখানেই নিহিত।

ভেবে দেখলে দেখা যায়, এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে অন্ততঃ কয়েকটি জিনিস পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। প্রথম হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান কি কি আছে সেগুলির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা। তার পর বুঝতে হবে সেই উপাদান কতখানি বস্তুজগতের

১ "Such phenomena are found only in the world of handful human beings, functioning as meaningful personalities, who meaningfully interact with one another and create, operate, accumulate, and objectify their meanings in and through an endless number of 'material vehicles'."—Sorokin : *Social Philosophies in an Age of Crisis*, p. 104.

উপরে উঠছে না, কতগুলি চিত্তক্ষেত্র অবধি প্রসারিত হচ্ছে, আর কতগুলি অনুশীলন পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে। সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রকৃতি ও গতির বৈষম্য—বিশেষতঃ তারা বিরোধ-মুখে চলেছে অথবা অন্বয়মুখে চলেছে। শেষপর্যন্ত বুঝতে হবে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক পটভূমি—তা হতেই সমস্ত সমাজেরও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা বোঝা যাবে।

২

প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় বঙ্গসংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির বাইরে, এখানে আর্যসংস্কৃতি প্রসারিত হতে অনেক দেরি হয়েছিল। সেইজন্য এ দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করবার নির্দেশ ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে বাংলাদেশের প্রতি কটুভাষণও কম ছিল না। সেসব কথার অন্য অর্থ যাই থাক্, এই অর্থটা স্পষ্ট যে সাধারণ বেদবিদ্যার অনুশীলন ও আচরণ বাংলাদেশে শিকড় গাড়ে নি। এ ছিল প্রধানতঃ শবর-চণ্ডালদের দেশ, তার সভ্যতা অন্যরকম, সংস্কৃতির উপাদানও অন্যরকম। ইতিহাসের এই গহন অরণ্যে প্রবেশ করা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের কয়েকটা বড় বড় পর্বের দিকে চোখ বুলিয়ে গেলেও কয়েকটা কথা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হচ্ছে, এ দেশে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি কতদূর স্থাপিত হয়েছিল জানি না, কিন্তু স্থাপিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠল এই পূর্বপ্রান্ত হতেই। বেদাচারের বিরুদ্ধে যতগুলি প্রধান প্রতিবাদ উঠেছিল—যেমন জৈন ও বৌদ্ধধর্ম, সেগুলি উঠেছিল এই বিহার-বাংলা অঞ্চল হতেই। তার বিস্তারও লাঢ়াভূমি (রাঢ়) ও বজ্জভূমিতে (পূর্ববঙ্গ) প্রচুর হয়েছিল এবং বহুকাল ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যখন বেদান্তধর্মের পুনরুত্থান ঘটল, তখন সে পুনরুত্থান বাংলাদেশে দেখা যায় নি।

বস্তুতঃ বাংলায় বৈদিক আচার ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন, সেইজন্য বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণ আমদানি করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত পুরো বৈদাস্তিক অভ্যুদয় বাংলায় হয় নি। যখন হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত হল তখন তা হল বটে, কিন্তু নবকলেবরে হল। একদিকে দেখা দিল সব বিষয়ে বাংলার নিজস্ব রীতি—নব্যন্যায় নব্যস্মৃতি দায়ভাগ ইত্যাদি ; আর অন্যদিকে প্রবল-বেগে উঠল নতুন ধর্ম—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম।

রঘুনন্দনের স্মৃতি সম্বন্ধে একটা কথা আমার অনেকবার মনে হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া আর অন্য কোনো জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, উত্তরভারতের মত এখানে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য রাখেন নি। জাতের পর্যায়ে শূদ্র বলে অভিহিত হওয়া অবমাননাকর, সেইজন্য যখন ১৯০১ সালের সেন্‌সাসের সময় রিজলি সাহেব জাতের খবর লিখতে প্রবৃত্ত হন সেইসময় হতেই বহু জাত শূদ্রত্ব ছেড়ে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবি করে আসছেন। এই নিয়ে তর্ক বিচার ও উত্তেজনা যথেষ্ট আছে। যাঁরা রঘুনন্দনের হিসেবে শূদ্রের কোঠায় পড়ে গিয়েছেন তাঁরা রঘুনন্দনের প্রতি বিদ্বিষ্ট। এসব অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। আমার কিন্তু মনে হয়, তখন বাংলার যে সামাজিক অবস্থা ছিল তাতে রঘুনন্দনের এই ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। তখন কিছু ব্রাহ্মণ পশ্চিম থেকে এসে কিছুকাল এ দেশে বসবাস করছেন বটে, কিন্তু সমাজে তাঁদের প্রভাবের না হয়েছিল প্রসার, না ছিল গভীরতা। সমাজের বৃহত্তম অংশ নিজেদের ধারায় চলত। সেই অংশের মধ্যে নানা জাতির মিশ্রণ, নানা সংস্কৃতির ধারা, নানা লোকাচারের ধারা। এর প্রভাব এত গভীর ও বিস্তৃত নিশ্চয়ই ছিল যে, এদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ সৃষ্টি করে বিভেদ রচনা করার দুঃসাহস রঘুনন্দনেরও সম্ভবতঃ হয় নি। তাই তিনি ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগুলিকে একদিকে বেড়াজালে বেঁধে দিয়ে বাকি সকলকে

একত্রই রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলার জনসাধারণ নিজের চালেই চলুক, গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ আপাততঃ বেঁচে থাক্, পরে যা হয় দেখা যাবে। এই তত্ত্বের অবশ্য আরও পাথুরে প্রমাণ চাই, তবু যেটুকু আভাস-ইঙ্গিত আমরা পাই তা হতে একথা চিন্তা করা হয়তো অন্যায় নয়।

অবশ্য এর চেয়ে অনেক বড় এবং দৃঢ় প্রমাণ মেলে বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বে ও আচরণে। সে সময় তখন ইসলামধর্মের প্রবল অভিঘাত এসে পড়েছে। এ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিকড় উত্তরভারতের মত অত গভীর না থাকায় বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের নীচের স্তরে অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণও করছে, সমস্ত সমাজজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন। কিছুকাল ধরে বাংলায় যে মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হয়েছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এ কাব্যগুলি হতেও স্পষ্ট বোঝা যায় সমাজের নীচের তলার লোকেরাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেসব কাব্যের নায়ক ব্যাধ-শবরদের দল, দেবদেবী অন্য, তারাই রাজত্ব অধিকার করে বসেছে। পরে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এই মঙ্গলকাব্যগুলির চেহারারও বদল হল, তারাও অন্যরকম রূপ নিল। বাংলার শেষ মঙ্গলকাব্য অন্নদামঙ্গল তো অন্য কাহিনী—তার চিত্রের পিছনে ছিল রানী ভবানী ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজ। কিন্তু সে কথা পরের কথা, গোড়ায় তার চেহারা অন্যরকম ছিল। তারিখ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, হয়তো কোনোটা আগে কোনোটা কিছু পরে। কিন্তু এইসব বিভিন্ন চিত্রের সমগ্র রূপটি ধরলে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল এই যে, তখন সমাজ নাড়াচাড়া খাচ্ছে এবং হিন্দুসংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারছে না। বাস্তবিক, ব্রাহ্মণাচার ও জাতিভেদের মধ্য দিয়ে সে আত্মরক্ষা সম্ভবও ছিল না। সেইজন্য যখন বৈষ্ণবধর্ম যজ্ঞক্রিয়া তুলে দিয়ে কেবলমাত্র হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করল, কোনো জাতের বাধা আর রইল না,

এমন কি যবনকে আত্মসাৎ করতেও দ্বিধা হল না, তখনই তা এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিতে পেরেছিল এবং বাইরের আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাও করতে পেরেছিল। সেদিক দিয়ে বলা যেতে পারে এত বড় কালোপযোগী বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন সে যুগে আর হয় নি।

বস্তুতঃ আজও বাংলার সংস্কৃতির পর্যালোচনা করলে এইসব ধারার প্রচুর চিহ্ন পাওয়া যায়। দক্ষিণবাংলায় বনবিবি দক্ষিণরায় মনসা শীতলা প্রভৃতি আর্যেতর দেবতার পূজা, পশ্চিমবাংলায় ধর্মরাজের পূজা, গাজনে মড়া-খেলানো প্রভৃতি আদিম জাতির অভ্যাস, আমাদের মধ্যে গোপরাজাদের বাগ্‌দিরাজাদের প্রবল প্রতাপ, এমন কি শৈবধর্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তি, বৌদ্ধ শীল ও আচরণের ক্রমে ক্রমে তন্ত্রাচারের মধ্য দিয়ে আর্যীকরণ করবার প্রচেষ্টা, তৎসত্ত্বেও আউল-বাউল-দরবেশ-সহজিয়াদের স্বকীয় সাধনার ধারা—ইত্যাদির সামগ্রিক রূপটির কথা ভাবলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই দেশে আর্যের সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতি ও লোকাচার কত বেশি পরিমাণে মিশে গিয়েছে। এমন কি লোকসমাজে আর্যেতর সংস্কৃতিরই প্রাধান্য, একথা বলা বোধ হয় অন্যায় নয়।

এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি তার ভৌগোলিক সীমানা মোটামুটি মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ। কিন্তু উত্তরবঙ্গ—যা বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করতে হবে—সম্পূর্ণ অন্য চেহারার। সেখানে কোচ মেচ প্রভৃতি বহু জাতির সমাবেশ, তাদের সমাজগঠন ও সংস্কৃতির ধারা অন্যরকম। সেখানে পড়েছে অহোমরাজের ছায়া, শান-মিকিরদের আক্রমণের ঢেউও কিছুটা তরঙ্গ তুলেছে এখানেও—এখানকার ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য। তা বাংলার অন্যান্য অংশের বাঁধাছকের বাইরে। বস্তুতঃ, বাংলার ইতিহাসের এই ধারা আজও বাংলায় ছড়িয়ে

আছে। ১৯৩১ সালের আদমশুমারিতে জাতিগত যে তথ্য দেওয়া আছে তা আলোচনা করলে দেখা যায় গঙ্গা ও ভাগীরথীর কূলে কূলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের প্রাধান্য, অন্ততঃ তাঁদের বসবাস এই নদীর ধারেই বেশি। আর যত দূরে যাওয়া যায় ততই তপশীলীজাতির প্রাধান্য বেশি।

এইসমস্ত আলোচনা হতে যে কথাটা বোঝা যায় সেটা হল এই যে, বঙ্গসংস্কৃতির প্রথম উপাদান হল এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতি—সেইটেই এখানকার সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কথা। উত্তরভারতের সঙ্গে তার একটা বড় তফাতও এইখানে। বঙ্গসংস্কৃতির কথা আলোচনা করতে গেলেই এই কথাটা সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে। এ গেল প্রথম কথা।

৩

এইবার দ্বিতীয় কথার অবতারণা করি। খুব বেশি পুরোনো কালের কথায় না গিয়ে মোটামুটি একালের কথায় আসা যাক। দুটি কথা এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে।

এই দুটি কথারই মূলসূত্র হল সংস্কৃতির ঐক্য। যা তৎকালীন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেরও সহায়তা পেয়েছিল, শহর ও গ্রামের মধ্যে খুব বেশি বিভেদ না থাকাতেও সহায়তা পেয়েছিল। কালক্রমে পশ্চিমবাংলায় এখন এই দুটি দিকেই ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছে। এই কথা দুটির কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

ইংরেজ-পূর্ব পশ্চিমবাংলায় (পূর্ববাংলা ধরলে তো একথা আরও বেশি সত্য) দু-চারটি শহরের ঐশ্বর্যের কথা শোনা যায় বটে। মুর্শিদাবাদ শহরের ঐশ্বর্য ক্লাইভের চোখে লণ্ডনের দ্যুতিকেও ম্লান করে দিয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু এরকম শহর দু-চারটি

যাই থাক্ না কেন, তখন সেই শহরের আলাদা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি, যে সংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি হতে বিভিন্ন এবং যে সংস্কৃতি চিত্তের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি সম্পূর্ণ নতুন কালচার-প্যাটার্ন এনেছে। তখন সংস্কৃতির বিভাগ মোটামুটি দুটি ছিল বলা যায়। কিছু ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রচর্চা নিয়ে থাকতেন বটে, কিন্তু এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ছেড়ে দিলে বাকি যে বিপুল জনসাধারণ ছিল সেই জনসাধারণের একটি নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ছিল এবং সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের জন্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট রূপকল্পও ছিল। রামায়ণ মহাভারত পাঠ, রামায়ণ-গান, কথকতা, আউলবাউলদের গানে সহজিয়া ধর্মতত্ত্বপ্রচার, কীর্তন, ইত্যাদি কতকগুলি রূপ ছিল। আর তখন সংস্কৃতির খণ্ডীভবন এতদূর অগ্রসর হয় নি যে, সমাজের উপরস্তর যা থেকে রসগ্রহণ করতেন তা সমাজের নীচের স্তরের পক্ষে বোধগম্য ছিল না। মোটামুটি একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। থাকাও অস্বাভাবিক নয়, কেননা তখনও বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনেকখানি এক ছিল। বর্ষা না হলে ফসলের যে ক্ষতি হত সে ক্ষতি হতে ব্রহ্মত্রভোগী ব্রাহ্মণও বাদ যেতেন না, দরিদ্র চাষীও নয়।

তৎকালীন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশের এই ধরনের একটা মোটামুটি সমন্বয় ঘটেছিল। এই সমন্বয় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল ইংরেজ-সাম্রাজ্যের অভিঘাতে। তার দুটি বড় কারণ। একটি হল নতুন করে অন্য ধরনের শ্রেণীবিন্যাস; দ্বিতীয় হল, নতুন করে সংস্কৃতির খণ্ডীভবন এবং শহুরে (মধ্যবিত্ত) সংস্কৃতির উদয়।

৪

শেষের কথাটি প্রথমে আলোচনা করা যাক। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের কিছু কাল আগে হতেই আমাদের অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু

হয়ে এসেছিল, সমাজ হয়ে উঠেছিল জরাজীর্ণ। কোনোরকমে নিজের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে আত্মরক্ষা করে ছিল বটে, কিন্তু তার নিজস্ব কোনো জোর ছিল না। এই অবস্থায় যখন পশ্চিম হতে অর্থনৈতিক বদল ছাড়াও নবজাগ্রত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবল অভিঘাত এল তখন সে অভিঘাতে সবই বদলিয়ে গেল। তা ছাড়া নতুন ব্যবসাবাণিজ্যে যে সমস্ত নতুন শ্রেণী গড়ে উঠল তাদের সংস্কৃতির ধারা ছিল নতুন, তাদের পরিবেশ ছিল অন্য। অবশ্য এক ধাপেই সে বদল হয় নি। প্রথমে এই দুই ধারার অভিঘাতে ভাঙন আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল, দেখা দিয়েছিল বর্ণসাংকর্য। শ্রীযুত বিনয় ঘোষ তাঁর নানা রচনায় এই যুগসন্ধির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। ভবানীচরণ সেঁকালের বাবুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কানন-ভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ॥" পূর্বকালেও 'বাবু'রা ছিলেন বটে, তাঁদের চেহারা ছিল অন্য। এতখানি মেরুদণ্ডহীন বিলাসসর্বস্ব শহুরে বাবুশ্রেণী আগে ছিল না। ফলে এই সস্তা রুচির বাবুর দল যে নবহুল্লোড় বাধালেন তার মধ্যে না ছিল রুচির লক্ষণ, না ছিল বিকাশের সম্ভাবনা। শ্রীযুত বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন[২] যে, আমাদের সংস্কৃতির যখন এই অবস্থা তখন তার কেন্দ্রস্থল ক্রমে স্থানান্তরিত হতে লাগল শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ হতে হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হয়ে কলকাতার দিকে। তখন সংস্কৃতি-ভাগীরথীর ভগীরথ ছিল টাকা ও বাণিজ্য এবং তার লেনদেনের মালিকেরা। অর্থাৎ এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন পোর্তুগীজ, ফরাসি, ডাচ আর বৃটিশ বণিকেরা এবং তাঁদের বাঙালী দালাল গোমস্তা দেওয়ান বেনিয়ান ও মুন্‌শীরা। স্বভাবতঃই এর সঙ্গে এসেছিল নানা বিকৃত জিনিস,—আখড়াই, হাফ-

২ কলকাতা কালচার, পৃঃ ১১৫

আখড়াই, ঝুমুর ও তরজা গান, বাইনাচ ইত্যাদি। অবশেষে এর মধ্যেই নতুন কালচারের একটা কেন্দ্র স্থাপিত হল শোভাবাজারে—মহারাজা নবকৃষ্ণের ছত্রচ্ছায়ায়। তিনি হঠাৎ নতুন কিছু করেন নি। ভট্টাচার্য ও টোল, বৈষ্ণব ও আখড়া, কবিগান ও পাঁচালি—এ সবই তাঁর আশ্রয় পেয়েছিল। আর সেইসঙ্গে দেখা গেল (যেমন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আমলে) যেসব সাংস্কৃতিক রূপকল্প (যেমন কীর্তন) লোকশিক্ষার এবং লোকসংস্কৃতির বাহন ছিল, প্রবল সামাজিক অস্ত্রও ছিল, এই যুগের রূপকল্পগুলি সে চেহারা হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষকদের বৈঠকখানায় গিয়ে আশ্রয় নিল—সে কি কবি সে কি পাঁচালি। আর সেইসঙ্গে এরা ক্রমে শহরের এই নব-অভ্যুদিত শ্রেণীর কবলে পড়ে গেল, গ্রামে গ্রামে তার প্রচার ও প্রসার রইল না।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর একটা খুব গভীর ও সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল। বাংলার অর্থনৈতিক জীবন পূর্বে গ্রামাশ্রয়ী ছিল। এই সময় হতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, গ্রামসর্বস্বতার অন্ত, বড় শহর, বিশেষ করে কলকাতার অভ্যুদয়, প্রভৃতি যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল, সাংস্কৃতিক জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তার ফলে শহরেই ঘটল নতুন শ্রেণীর অভ্যুদয়। সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান হল এইসব শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ। এর আরও গভীর এবং স্থায়ী ফল হল শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ। পূর্বে বলেছি, আগের যুগে এক লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজের বৃহৎ অংশকে আচ্ছন্ন করে ছিল। সংস্কৃতির খণ্ডীভবন (অর্থাৎ সমাজে শ্রেণীবিন্যাস) প্রবল না থাকায় ভট্টাচার্য টুলো পণ্ডিত, গ্রামের জমিদার হতে মুদী ও চাষীরা হয়তো রামায়ণ-গান বা অষ্টপ্রহর গান শুনেই সমান আনন্দ পেত। কিন্তু নবযুগের থিয়েটার বা কাব্য আর সকলকে আনন্দ পরিবেশন করতে থাকল না। তার সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্ট।

পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করেছি, কিন্তু এইখানেই বলা

চলে যে, এই সময় হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে একটি গভীর পরিবর্তনের ধারা চলে আসছে। সেটি হল শহরের ও গ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ তফাত, সমাজের উপরতলা ও নীচের তলায় যোগাযোগের সম্পূর্ণ অভাব। একটু বিচার করে দেখলেই এ কথাটার তাৎপর্য বোঝা যাবে। শোভাবাজার-সংস্কৃতির যুগ পার হয়ে যখন বাংলায় সত্যই বিস্ময়কর নতুন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হল, যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করলেন মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহামনীষীরা, সেই সংস্কৃতি অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল সংস্কৃতি বটে, কিন্তু তা সর্বসাধারণের সংস্কৃতি নয়, নব-অভ্যুদিত শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতি। একদিকে লোকসমাজ অন্ধকার হয়ে যেতে লাগল, অন্যদিকে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী নব হতে নবতর সংস্কৃতিতে ঝলমল করতে লাগল। এই দ্বিধাবিভাগ শ্রেণীবিন্যাসেরই ফল। এইখানেই সংস্কৃতির বিচারে সমাজবিন্যাস ও শ্রেণীবিন্যাসের কথা এসে পড়ে।

৫

আসল কথা, উনিশ শতকে বাংলায় যে নব-সংস্কৃতির সৃষ্টি হল তার প্রথম কথা হল, সেই সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতি ছিল না, তা ছিল নবজাগ্রত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংস্কৃতি। সে সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা হল, সেকালে যে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস গড়ে উঠছিল তা এই সংস্কৃতির অত্যন্ত সহায়ক ছিল—বস্তুতঃ ও দুটি হাত-ধরাধরি করে পাশাপাশি চলছিল বলাও অত্যুক্তি হবে না। তৃতীয়তঃ, কর্মের ক্ষেত্রে যেমন চিত্তের ক্ষেত্রেও তেমনি অর্থনৈতিক তাগিদ ও মনের প্রেরণা এমন ভাবেই কাজ করছিল যে পূর্বের সংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধি ও আচারমোহগ্রস্ত সমাজকে ভেঙে ফেলে চিত্তের স্বারাজ্য ও মনের উদার অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল। সমাজে যেমন দেখি ইংরেজদের সঙ্গে মেশা,

খানাপিনা করা (ইয়ং বেঙ্গল দলের কথা কে-ই বা না জানেন—কিন্তু তা ছাড়া অন্যত্রও এসব দেখা যাচ্ছিল), বিলেত যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটছিল, অন্যদিকে তেমনি দেখি ওরিয়েণ্টালিস্টদের পরাজয়, ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্তন, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা, সমাজে প্রচলিত কু-অভ্যাসের প্রতিবাদ ও নিরসন, সাহিত্যে মনের মুক্তি কাব্যের মুক্তি ছন্দের মুক্তি। তা না হলে মাইকেলের কাব্যের নায়ক রাম না হয়ে রাবণ হবেন, এমন কথা আগে কেই-বা ভাবতে পারত? বঙ্কিমচন্দ্রই বা দেবদেবীর কাহিনী ছেড়ে মানবজীবনের সুখদুঃখ ভালোবাসা এমন কি অবৈধ প্রেম নিয়ে সাহিত্যরচনা করতে গেলেন কেন? কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত এমন কি আরও আগে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরে দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক অসারতা ও ভণ্ডামির উপর তীব্র কশাঘাত হানতে গেলেন কেন? এসবের পিছনে যে দুটি কথা সবচেয়ে বড় সে দুটি হচ্ছে তখন যুক্তির যুগ (Age of Reason) শুরু হয়েছে এবং সেই যুগের প্রবর্তন করছেন সে যুগের বিদ্বজ্জন বা elite.—সে যুগের অর্থনৈতিক প্রসার-সম্পন্ন শিক্ষিতশ্রেণী থাকার ফলেই এই বিদ্বজ্জনশ্রেণী গড়ে ওঠাও সম্ভব হয়েছিল।

জর্মান পণ্ডিত ম্যানহাইম এই বিদ্বজ্জনশ্রেণী গড়ে ওঠার তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যখন কোনও লিবারাল-গণতান্ত্রিক সমাজে বিদ্বজ্জনশ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু হয় তখন অন্ততঃ প্রথম দিকে তিনটি নীতি অনুসারে বিদ্বজ্জন নির্বাচন হয়। তার প্রথমটি হল বংশ, দ্বিতীয় হল অর্থসম্পত্তি, তৃতীয় হল গুণ।[৩] অন্যান্য দেশে এই ধাপগুলি পর

৩ "If one calls to mind the essential methods of selecting élites, which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished: selection on the basis of *blood, property* and *achievement.*

পর অতিক্রান্ত হতে (যদিচ এগুলির বিশুদ্ধ রূপ কোনো সমাজেই পাওয়া যায় না, সব সময়েই কিছু-না-কিছু মিশাল থাকে) অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু আমাদের সমাজে এই বিবর্তন অনেকখানি তাড়াতাড়িই ঘটেছে। তা অবশ্য ঘটেছে আমাদের বিশেষ সামাজিক অবস্থার ফলেই, কিন্তু তা ঘটেছে। আরও ঘটেছে আমাদের অ-সম সামাজিক বিবর্তন। পর পর এক ধাপ হতে আর-এক ধাপে সমাজ অতিক্রমণ করে নি, এক ধাপে থাকতে থাকতেই আর-এক ধাপ ঢুকে গিয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ধারা আলোচনা করলেই দেখা যাবে, প্রথম যুগে আমাদের বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর মধ্যে বংশ ও সম্পদের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।[৪] কিন্তু ক্রমে ক্রমে গুণই প্রধান হয়ে উঠেছে। আজকের যুগের আলোচনায় দেখা যাবে, আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, এখন বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে।

Aristocratic society, especially after it had entrenched itself, chose its élite primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced, as a supplement, the principle of wealth, a principle which also obtained for the intellectual élite, inasmuch as education was more or less available only to the offspring of the well-to-do. It is, of course, true that the principle of achievement was combined with the two other principles in earlier periods, but it is the important contribution of modern democracy (as long as it is vigorous) that the achievement principle increasingly tends to become the criterion of social success." Mannheim: *Man and Society*, p. 89.

৪ দ্রঃ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ লিখিত "বাংলার বিদ্বৎসমাজ" প্রবন্ধ : "চতুরঙ্গ", কার্তিক ১৩৬২ এবং বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩।

৬

এই পটভূমিকায় আজকের পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্র বিচার করতে গেলে কয়েকটি কথা বিচার করতে হবে। প্রথম কথা, সংস্কৃতির পথিকৃৎ কারা। দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতির পোষক কারা। বলা বাহুল্য, উভয়ে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ। বস্তুতঃ পোষকদেরই পরোক্ষ প্রতিফলন হলেন পথিকৃতেরা, যদিচ ব্যতিক্রম আছে এবং অবশ্যই থাকবে, কেননা প্রতিভা শেষপর্যন্ত কোনো বাঁধন মেনে চলে না।

পোষক-সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যেখানে জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র সাক্ষর, বাকী সবাই নিরক্ষর, সেখানে পোষকশ্রেণী নিতান্তই সীমাবদ্ধ একথা স্বীকার করতেই হবে। যদি লোকসংস্কৃতির ধারাটি অব্যাহত থাকত এবং যুগোপযুক্ত-ভাবে পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হতে পারত তা হলেও কিছু কথা ছিল। কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, তা হয় নি। সে ধারা পঙ্কিলতায় রুদ্ধস্রোত হয়ে গিয়েছে। তার উপর পশ্চিম বা দক্ষিণ বাংলায় তার ধারা যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে অন্যান্য জায়গায়, যেখানে সেই সাংস্কৃতিক ধারা তেমন বিকশিত হয় নি, সেখানে তো কোনো কথাই নেই। সোরোকিনের যে কথা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম : এদের অনুভবের ক্ষমতাই নেই, অনুশীলন করবে কি করে? মোট কথা, এদিকটায় প্রায় অন্ধকার। আমাদের পরমসৌভাগ্যে এই মাটিতে রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার উদয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর অপূর্ব কাব্যের রসাস্বাদন করবার মত মানসিক উপকরণ এইসমস্ত রুদ্ধস্রোত চিত্তক্ষেত্রে ক'জন মানুষের আছে? এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। সেইজন্য উনিশ শতকে যে ধারাটির গোড়াপত্তন হয়েছিল, অর্থাৎ অন্য সবাইকে প্রায় বাদ দিয়ে এক অত্যুজ্জ্বল মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজও কিছুটা বদল হওয়া সত্ত্বেও সেই ধারাই মোটামুটি বজায় রয়েছে।

ঠিক এই অবস্থা সংস্কৃতির পথিকৃৎদের মধ্যেও। আজ পশ্চিম-

বাংলার শ্রেণীবিভাগ করলে মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণী পাওয়া যাবে : শহরে—তার মধ্যে (ক) ব্যবসায়ী (খ) নানা ধরনের মধ্যবিত্ত, চাকুরিয়া, স্কুলকলেজের ছাত্র ইত্যাদি (গ) তলার শ্রেণী, শ্রমিক মজুর ইত্যাদি। গ্রামে—তার মধ্যে (ক) ভূমি-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত (খ) বৃত্তিজীবী, কিছুটা ভূমির সঙ্গেও জড়িত (গ) চাষী মজুর শ্রেণী। সাংস্কৃতিক উপকরণের দিক হতে এই শ্রেণীগুলির পুনর্বিন্যাস করলে দেখা যাবে, কি শহর কি গ্রাম কোথাও চাষী-মজুর-শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষাই বহু ক্ষেত্রে নেই, আধুনিক অর্থে সাংস্কৃতিক উপকরণও নেই। শহরে ব্যবসায়ীরা অন্য শ্রেণীর মানুষ, তাঁদের কারবার লক্ষ্মীর সঙ্গে বেশি, সরস্বতীর সঙ্গে তেমন নেই। কাজেই শেষপর্যন্ত সংস্কৃতির পথিকৃৎদের শ্রেণীবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রায় সকলেই এসেছেন শহর বা গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতে।

বস্তুতঃ একথা অস্বাভাবিকও নয়। জগতের ইতিহাসেই দেখা যায়, বিদ্বজ্জন নির্বাচনের প্রথম যুগ কেটে যাবার পর, অর্থাৎ বংশগত ও সম্পত্তিগত প্রভাব কেটে যাবার পর, যখন গণতন্ত্র প্রসারিত হতে থাকে তখন গণতন্ত্র (এমন কি সত্যকারের গণতন্ত্র হলেও) সকলের জন্য হলেও সংস্কৃতির পথিকৃৎদের উদ্ভব হয় সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সমাজ হতেই। এটি মধ্যবিত্ত সমাজের জগৎজোড়া অধিকার বললেও চলে। আর যখন অর্থনৈতিক সংকট আসে, গণতান্ত্রিক সংকটও দেখা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙে, তখন সংস্কৃতির সংকটও দেখা দেয়।

একালে এইরকম সংকট বহু দেশেই দেখা দিয়েছে। তারই তত্ত্ব আলোচনা করে ম্যানহাইম কতকগুলি মূলসূত্র নির্দেশ করেছেন। সেগুলি উল্লেখের যোগ্য। তিনি বলেছেন, যুক্তির যুগের আরম্ভে যদি গণতন্ত্র প্রসরণশীল হয় এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, যার ফলে সকল শ্রেণীরই আশা থাকে যে সে তার পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারবে, সেই অবস্থায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীই যে ভালোভাবে গড়ে ওঠে

তাই নয়, সমাজে যুক্তিবাদী (rational) এবং খামখেয়ালীদের দ্বন্দ্বে (irrational) যুক্তিবাদীদেরই জয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি দেশে বুদ্ধিবাদী ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করলে এই কথাই প্রমাণিত হয়। তখন সমাজের মধ্যে প্রগতিতে বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, ভবিষ্যতে আস্থা ছিল। কিন্তু কাল যত বিবর্তিত হয় ততই এ অবস্থা কেটে যায়। যুক্তিবাদ তখনই বলবান থাকতে পারে যদি সমাজ প্রয়োজনমত বদলায় এবং যে অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবর্তন হতে থাকে সমাজও সেই অনুসারে চেহারা বদলায়। সমাজ যদি তা না বদলায় তখনই সংঘাত বাধে এবং যৌক্তিকতার বদলে অযৌক্তিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। সমাজে অগ্ন্যুৎপাত দেখা দেয়। সমাজ প্রয়োজনমত বদলাবে এই আস্থা না থাকলে সমাজে খামখেয়ালি প্রবল হয়ে উঠবে একথা তো খুবই স্বাভাবিক।

আজকের কালে সারা জগতে তো বটে, পশ্চিবাংলাতেও যে কতকগুলি ঘটনা ঘটছে তার মধ্যে প্রথম হল মূলধনের পুঞ্জীভবন। সমাজের উৎপাদনশক্তি মাত্র কিছু লোকের হাতে। তার উপর আজ আর উৎপাদনপদ্ধতি সহজ সরল নেই, তা সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই যাঁদের হাতে উৎপাদন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত তাঁরা যে মূলধনের প্রভাবেই প্রতিপত্তিশালী তা নয়, তাঁরা সমাজের বিন্যাস বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সামাজিক শক্তিও নিয়ন্ত্রণ করছেন। শক্তির এই সংহতি আর কেন্দ্রীভবন সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও বিকাশের সহায়ক নয়। কেননা এই জটিলতার মধ্যে সাধারণ লোক দিশাহারা—তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ দূরে থাক্ তারা চিন্তা-শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে না।[৫] তার ফলে একদিকে দেখা

৫ "The fact that in a functionally rationalized society the thinking out of a complex series of actions is confined

যায় সংস্কৃতির সংকীর্ণতা ও সংকট, অন্যদিকে দেখা যায় সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বৃহৎ হতে বৃহত্তর জনসংখ্যার অংশ গ্রহণে অক্ষমতা।

সংস্কৃতির পক্ষে এ অবস্থা যে মোটেই সহায়ক নয় সে কথা তো বলাই বাহুল্য, বরং বলতে হয় রীতিমত ক্ষতিকর। কেননা, সমাজ কখনও চুপ করে বসে থাকে না, ঠিক পথে না হলে সে বেঠিক পথেই এগিয়ে চলবে। বাস্তবিক, তা চলছেও। আজকালকার যুগে প্রায় প্রত্যেক সমাজেই মোটামুটি ছুটো জিনিস ঘটছে। একটি হল, সমাজের এখন স্বাভাবিক টানই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলা। শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, যাকে ম্যাক্স শীলার বলেছেন 'অনুভূতির গণতন্ত্র' (democracy of emotions) সেদিকেও। অনুভূতিসামান্য চাই। বস্তুতঃ দেখা গেছে যে যুগে অনুভূতিসামান্য যত খর্ব হয়েছে অনুভূতি খণ্ডতর সংকীর্ণতর হয়ে উঠেছে সে যুগে ব্যঙ্গরচনা, বৈহাসিক কবিতা হয়তো সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোনো মহৎ সৃষ্টি হয় নি, সংস্কৃতির মহৎ যুগ দেখা যায় নি। এরই সঙ্গে সমাজে আর-একটি লক্ষণ দেখা

to a few organizers, assures these men of a key position in society. A few people can see things more and more clearly over an ever-widening field, while the average men's capacity for rational judgment steadily declines once he has turned over to the organizer the responsibility for making decisions. In modern society not only is the ownership of the means of production concentrated in fewer hands, but... there are far fewer positions from which the major structural connections between different activities can be perceived, and fewer men can reach these vantage points. This is a state of affairs which has led to the growing distance between the èlite and masses...The average person surrenders part of his own cultural individuality with every new act of integration into a functionally rationalized complex of activities.. Mannheim : op. cit., p. 58.

যাচ্ছে, সেটি হল সমাজে পারস্পরিক জটিলতা। সুদূর ডাণ্ডীতে পাটকল চলবে কি না তা নির্ভর করত পূর্ববঙ্গের পাটচাষীর উপর। উৎপাদন-ব্যবস্থা এতই জটিল ও সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠেছে।

সমাজ যখন আপন গতিবেগে এই দুটি শক্তি সৃষ্টি করে চলেছে তখন সমাজের কাঠামোও যদি ঠিক সেইভাবে আপনাআপনি পরিবর্তন হতে থাকত তা হলে সংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ সহজ হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা ঘটছে না বলেই সংস্কৃতিতে সংকট দেখা দিয়েছে। একদিকে গণতন্ত্রের দিকে টান, যার দিকে সমাজ অনিবার্যগতিতে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে মূলধন শক্তি ও সংস্কৃতির পুঞ্জীভবন এবং জনগণের অসহায়তা—এ অবস্থায় সাংস্কৃতিক সংকট না ঘটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এর নাম দিয়েছেন ম্যানহাইম গণতন্ত্রের প্রসার নয়, গণতন্ত্রের উলটো অভিব্যক্তি—negative democratization। তার ফলে জনসাধারণ কাজের আসরে এসে পড়তে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাদের না থাকে চিন্তার শক্তি, চিত্তের বিকাশ বা সংস্কৃতির ধারা। তার ফলে সৃষ্টি হয় না, গোলমাল বাড়ে, সংকট তীব্রতর হতে থাকে।

যখন এইরকম উলটো পাকে গণতন্ত্র চলতে থাকে তখন কয়েকটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। প্রথমে ঘটে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সংখ্যাবৃদ্ধি। প্রথমে বহু লোক আসতে আরম্ভ করে, তাতে প্রথমটায় যে সুফল পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কিছুকাল গত হলেই দেখা যায়, বৈচিত্র্যের বদলে নানা ধরনের হালকা জিনিস ও ভাসা ভাসা ভঙ্গীসর্বস্বতা দেখা দিতে আরম্ভ করে। তখনই দেখা দেয় দ্বিতীয় স্তর। তখন গুণের চেয়ে সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে, মহৎ সৃষ্টির পরিবর্তে দেখা দেয় ভঙ্গীসর্বস্বতা, নতুন নতুন চটকের চেষ্টা। তার ফলে সংস্কৃতি দিক হারায়, সত্যিকারের রুচিবোধ গড়ে উঠতে পারে না। এ যুগে গুণগত উৎকর্ষই বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে

প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র। কিন্তু সেই গুণ ফুটবার আগেই যদি কেউ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে প্রবেশ লাভ করেন তা হলে সংস্কৃতিসৃষ্টির গোড়ার উপকরণেরই অভাব ঘটতে থাকে। সবশেষ স্তরে দেখা যায় সংস্কৃতির চূর্ণীভবন। তখন সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটি ভেঙে-চুরে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলায় তা দেখা যাচ্ছে), এবং সামগ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নানা স্থানীয় সংস্কৃতি ধর্মবিশ্বাস ও দলীয় ঐতিহ্য প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইসব লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কি?

একথা অবশ্য সত্য যে পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি, বিশেষতঃ সাহিত্য, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের হতাশা কাটিয়ে উঠে নতুন পথে যাত্রা করতে শুরু করেছে। কাব্যে জীবনস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে, নতুন প্রত্যয়েরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে, নতুন নতুন (এবং সার্থক) পরীক্ষাও দেখা যাচ্ছে। গল্প-উপন্যাসেও আমাদের কৃতিত্ব খুব বেশি। এসব সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে সমাজের সামগ্রিক বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট এখনও গভীর। সেই সংকট কাটবে না যতক্ষণ না সংকটের কারণ দূরীভূত হবে। সমাজের কোন্ অবস্থায় সাংস্কৃতিক সংকট ঘনীভূত হয় তার যে আলোচনা উপরে করেছি সেই অনুসারে বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের সমাজ যত ভাঙবে, বিদ্বজ্জনমণ্ডলী যত ভাঙবে, অযৌক্তিকতা ও অসুস্থতাবোধ যত বাড়বে সাংস্কৃতিক সংকট ততই বাড়বে। বিশেষতঃ আরও মনে রাখতে হবে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংস্কৃতিই যে গোটা বাংলার সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, তা চিরকাল চলতে পারে না। কালক্রমে গণতন্ত্রের উলটো পাক যখন ক্রমাগত এই বন্ধ দরজায় ঘা দিতে থাকবে তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও ভাঙন আরও গোলমাল দেখা দেবে। তা হতে উদ্ধার মিলবে যদি গণতন্ত্রকে উলটো পাকে ঘুরতে না দেওয়া হয়। সেই সংকটের মোচন চিত্তের উদারতম ও

বিস্তৃততম স্বারাজ্যে, বুদ্ধির উদার অনুশীলনে—যাতে যত সম্ভব বেশি জনসংখ্যা অংশগ্রহণ করে, অনুভব করে, অনুশীলন করে—কেবলমাত্র গোষ্ঠীবিশেষ নয়। ম্যানহাইমের কথা দিয়ে শেষ করি : "পূর্বকালের সমাজে যৌক্তিকতার অনুশীলন সকলে না করলেও চলত কারণ সে সমাজের কাঠামোই ছিল সেইরকম। কিন্তু আজকের সমাজেও যদি তাই চলতে থাকে তা হলে শেষ পর্যন্ত সমাজই চলবে না।"[৬]

৬ "Societies which existed in earlier epochs could afford a certain disproportion in the distribution of rationality and moral power, because they were themselves based on precisely this social disproportion between rational and moral elements...In modern society, neither the general lack of rationality and morality in the control of the total process, nor their unequal distribution will allow it to go on." Mannheim : Op. cit., p. 44.

বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য

ভারতবর্ষকে নতুন করে গড়বার সমস্যা যত বাস্তব ও ব্যাপক হয়ে উঠছে, ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো নিয়ে চিন্তাও ততই প্রবল হয়ে উঠছে। গান্ধীজি বহুদিন হতেই বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলে আসছিলেন। তাই নিয়ে গঠনমূলক কর্মীরা কিছু কাজ করবার চেষ্টাও ক'রে এসেছেন। পক্ষান্তরে আজ কার্যক্ষেত্রে দিকে দিকে কেন্দ্রীকরণের লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু রাষ্ট্রীয়করণই এর একমাত্র লক্ষণ নয়। স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও কার্যক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে; দিল্লীর ক্ষমতা প্রসারিত হয়ে প্রদেশগুলির ক্ষমতাকে ক্রমেই খর্ব করছে। সেইজন্য কেন্দ্রীকরণ অথবা বিকেন্দ্রীকরণ, এই প্রশ্ন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। এটা যে শুধু এই দেশের সমস্যা তাই নয়। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিতে—এমন কি ইংলণ্ডেও—এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন উঠছে এবং তাই নিয়ে নানা কমিটী কমিশন চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। যে-সব দেশ আয়তনে ছোট, শাসনযন্ত্র উন্নত, জনসাধারণ শিক্ষিত ও জাগ্রত সেসব দেশে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা সফল হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বড় বড় দেশেও এ ব্যবস্থা সফল হয়, তবে তার জন্য খুব কড়া নিয়ন্ত্রণ দরকার—যা আমরা এদেশে চালু করতে রাজী নই। কিন্তু ভারতবর্ষের আয়তন বৃহৎ, শাসনযন্ত্রের চাকা এখানে নির্ভুল ও মসৃণভাবে ঘোরে না, দেশের জনসাধারণও শিক্ষিত ও জাগ্রত নয়। সুতরাং এখানে কেন্দ্রীকরণ চলবে কি না সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই ওঠে। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, যদি কেন্দ্রীকরণ চলা সম্ভবও হয় তা হলেও তা চলতে দেওয়া উচিত কি না। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে আমরা যে সম-সমাজের স্বপ্ন দেখি কেন্দ্রী-করণ হতে থাকলে সে স্বপ্ন সফল হবে কি না, কারণ সাধারণতঃ

দেখা যায় যে পুঁজির পুঞ্জীভবনই হল কেন্দ্রীকরণের প্রধানতম তাগিদ।

এই প্রসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে পড়ে। আজকের সমাজ বস্তুবহুল সুখসন্ধানী (Pleasure-hunting) সমাজ—মানুষ এই সমাজে নিজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের দুর্বহ ভারে যেমন একদিকে দুর্বল ও দাস হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে সম্পদের পুঞ্জীভবন চলতে থাকে। এই অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য গান্ধীবাদীরা বিকেন্দ্রীকরণ ও কুটিরশিল্পের কথা বলে থাকেন। কমিউনিস্টরা এর উলটো পথে সমাধান খোঁজেন। তাঁদের সমাধান হল রাষ্ট্রীয়করণের পথে অর্থাৎ মূলধনী প্রথার অন্ত ঘটিয়ে। যাঁরা মূলধনী প্রথার অন্ত-কারক হিসেবে অথচ কমিউনিস্ট সমাধানকে ঘায়েল করবার পদ্ধতি হিসেবে এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করেন, তাঁদের কয়েকটি প্রশ্ন ভাবতে হবে। বিকেন্দ্রীকরণ কি সত্যই কমিউনিস্ট পদ্ধতিকে ঘায়েল করছে? আসলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান ও প্রথম শত্রু হল ধনতন্ত্রে মূলধনের স্বাভাবিক কেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ করছে কে? কোনও রাষ্ট্র, কোনও সমাজ, না কোনও অর্থনীতি?···Concentration of capital এবং accumulation of profit যে সামাজিক শক্তির প্রভাবে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধেই তো তবে বিকেন্দ্রী-করণের লড়াইটা লেগে যায়। এবং সে তো একটা বিরাট সামাজিক লড়াই। কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে কিছু কম ভয়াবহ নয় এবং লড়াইটাও কতকটা সেই-জাতীয়ও বটে, বরং তা আরও অন্তহীন ও বিরামহীন। কেননা কমিউনিস্টরা মূলধনী প্রথার অন্ত করে দিয়ে সংগ্রাম শেষ করতে চায়। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণকারী মূলধনও রাখছে অথচ তাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবে না—অর্থাৎ লাভ করতে দেবে না অথবা দেবে সাতপাক খাইয়ে। শিল্প বাণিজ্য বাজার সম্পত্তি সবই থাকবে, অথচ তাকে কেন্দ্রীভূত হতে দেবে না। কিন্তু কি দিয়ে

তাকে বন্ধ করা যাবে? রাষ্ট্র দিয়ে? সংগ্রাম চালু রাখতে হবে অথচ শেষ করা হবে না? এ কেমন কথা? বিকেন্দ্রীভূত মূলধন কেন আপন নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকবে? কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ভয়ে? তবে সে রাষ্ট্র ভয়ানক একটা monsterএর রূপ নিতে বাধ্য হবে—নৈতিক পুরুষের নয়। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থনৈতিক নিয়ামক কি কিছু নেই? ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আছে বাজারে, লাভে, লোকসানে, সঞ্চয়ে, মূলধন ইত্যাদিতে। সমাজতন্ত্রের নিরাময় হচ্ছে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা। বিকেন্দ্রীভূত কর্মাবলীর নিয়ামক কি?

প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গভীর এবং একেবারে গোড়ার কথাগুলির পুনর্বিচার দাবী করে। এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে সেই কথা বলি।

২

মূল প্রশ্নটার বিচার করবার আগে দুই-একটা আনুষঙ্গিক কথা আলোচনার দরকার আছে। প্রথম কথা, বিকেন্দ্রীকরণ কথাটা কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রীয়করণের প্রতিবাদে অনেক সময় ব্যবহৃত হতে দেখি। কিন্তু গান্ধীজির লেখা আমি যতটুকু পড়েছি তাতে তিনি বিকেন্দ্রীকরণের অস্ত্র ওভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কমিউনিস্টদের ঘায়েল করবার অস্ত্র হিসাবেই ওটার দরকার—এ কথা বললে জিনিসটাকে শুধু ছোট করা হয় না, গোড়ার কথাটাই একেবারে বদলে দেওয়া হয়। এই কথার সপক্ষে দুটি যুক্তি আছে; প্রথমতঃ, গান্ধীজি কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু শুধু রাষ্ট্রীয়করণের জন্য-ই সে বিরুদ্ধতা না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মনে মনে আদর্শ রাষ্ট্রের একটা চেহারা ছিল। সেই রাষ্ট্রের চেহারার সঙ্গে কেন্দ্রীভবন খাপ খায় না। কিন্তু এই কেন্দ্রীভবন শুধু কমিউনিস্টদের কথা নয়,

ধনতন্ত্রেরও কথা। একটিতে কেন্দ্রীভবন রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জনকল্যাণে নিয়োজিত। অন্যটিতে কেন্দ্রীভবন ধনিকগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং নিজেদের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত। এক ব্যবস্থায় অস্ত্রটির ব্যবহার হচ্ছে আর্তত্রাণের জন্য, অন্যটিতে অনাগস্‌দের প্রহারের জন্য। কমিউনিস্টদের আপত্তি অস্ত্রটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে, কাজেই যে মুষ্টি সেই অস্ত্র ধরে আছে সেই মুষ্টিই তাঁরা বদলে দিতে চান। গান্ধীজির আপত্তি ছিল অস্ত্রটিরই বিরুদ্ধে। সেইজন্য সেখানে শুধু মুষ্টিবদলের কথাই নয়, অস্ত্রবদলের কথাটাও সমান দরকারী। এই কথাটার আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা পরে করবার দরকার হবে, কিন্তু তবু এই প্রসঙ্গে এই কথাটার উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে এই গোড়ার তফাতটা না বুঝলে বিকেন্দ্রীকরণের আসল কথাটাই বোঝা যাবে না। গান্ধীজির রচনায় এ রকম কথা ভূরি ভূরি আছে। দু-একটা উদ্ধৃত করছি। গান্ধীজি কেন কমিউনিজমের বিরোধী ছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

> Class war is foreign to the essential genius of India, which is capable of evolving communism on the fundamental rights of all on equal justice.... Socialism and communism of the West are based on certain conceptions which are fundamentally different from ours. One such conception is their belief in essential selfishness of human nature. I do not subscribe to it, for I know that the essential difference between man and the brute is that the former can respond to the call of the spirit in him, can rise superior to the passions that he owns in common with the brute and, therefore, superior to selfishness and violence, which belong to the brute nature and not to the

immortal spirit of man. (Bose : *Selections from Gandhi*, pp. 89-90)

গান্ধীজির চোখে রাষ্ট্রের আদর্শ কি ছিল তা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। তবু দু-একটা কথার উল্লেখ করি। ব্যক্তির উপর গান্ধীজি ভয়ানক জোর দিতেন।—

> The individual is the one supreme consideration....I look upon an increase of the power of the state with the greatest fear, because, although while apparently doing good by minimizing exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality which is at the root of all progress. (*Ibid*, p. 27)

সেইজন্য তাঁর মতে

> Swaraj of a people means the sum total of the Swaraj (self-rule) of individuals.

এইজন্যই তিনি বিশ্বাস করতেন যে আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনপরিধি হবে ন্যূনতম।[১] কিন্তু এই রকম আদর্শ রাষ্ট্রে ব্যাপক আত্মবিকাশের

---

১ রবীন্দ্রনাথ এসব বিষয়ে যে মতামত পোষণ করতেন তা গান্ধীজির মতবাদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ অন্য ভঙ্গীর ছিল। কিন্তু ব্যক্তিক সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার বিরুদ্ধে তাঁর মতও খুব দৃঢ় ছিল। 'ঘরে-বাইরে' হতে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি :—"ভয়ের শাসনসীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন রাখবার জন্যই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া বেঁধে অস্বীকার করা হয়। সেইটেই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।"

সুযোগ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অন্ততঃ কয়েকটি জিনিস দরকার। পুঁজি যদি কয়েকজনের হাতে পুঞ্জীভূত হয় তা হলে তা শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তাতে ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ বাধা পেতে বাধ্য। সেইজন্য বিকেন্দ্রীকরণের দরকার—

> What India needs is not the concentration of capital in a few hands, but its distribution so as to be within easy reach of the 7½ lakhs of villages....we want to organize our national power not by adopting the best methods of production only but by the best method of *both* the production and distribution. (*Ibid*, p. 69)

এর অর্থনৈতিক যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন,

> India became impoverished when our cities became foreign markets and began to drain the villages dry by dumping cheap and shoddy goods from foreign lands. (*Ibid*, p. 68)

নতুন ধরনের গ্রামীণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে হিংসা অর্থাৎ শোষণ থাকবে না।

> Rural economy as I have conceived it eschews exploitation altogether, and exploitation is the essence of violence, (*Ibid*, p. 33)

তার মানে এ নয় যে, আমাদের গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যেতে হবে। আসল কথা হল, মেশিন থাকবে, কিন্তু মানুষের কল্যাণের উপর তার দাবী বড় হয়ে উঠবে না।

> Machinery has its place, it has come to stay.... [But] I refuse to be dazzled by the triumph

of machinery. ....That use of machinery is lawful which subserves the interest of all. (*Ibid*, pp. 66-67)

এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীভূত সমাজে। কাজেই কথাটা শুধু রাষ্ট্রীয়করণের প্রতিবাদ হিসেবে ব্যবহৃত নয়। একটা বৃহত্তর আদর্শের আনুষঙ্গিক বা উপায় হিসেবেই কথাটা এসেছে। রাষ্ট্রীয়করণ সে আদর্শকে ব্যাহত করে, সেইজন্য গান্ধীজি তার বিরোধী। বিকেন্দ্রীকরণ সেই আদর্শকে সফল করে, সেইজন্য তিনি তার পক্ষপাতী। এইজন্যই তিনি এক জায়গায় রাষ্ট্রীয়করণের এমন এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার অর্থ আমি আজও বুঝতে পারি নি। তাঁর কথা হল—

> Jawaharlal does indeed talk of nationalization of property but it need not frighten you. The nation cannot own property except by vesting it in individuals. It simply ensures its just and equitable use, and prevents all possible misuse; and I do not think you can have any possible objection to holding your property for the benefit of the ryots. (*Ibid*, p. 90)

আমরা রাষ্ট্রীয়করণ বলতে সাধারণতঃ যা বুঝি, গান্ধীজি সে অর্থে কথাটা মোটেই ব্যবহার করছেন না। তাঁর বোধ হয় ধারণা যে, রাষ্ট্রীয়করণ মানে স্বত্ব থাকবে ব্যক্তিরই, তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। বলা বাহুল্য, আমরা এ অর্থে কথাটা ব্যবহার করি না। কিন্তু ব্যক্তির উপর গান্ধীজির ঝোঁক এখানেও লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে আর একটু এগোলেই বলা যায় যে, যদি সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অহিংস হন, অর্থাৎ শোষণবর্জিত হন, তা হলে তিনি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের আর দরকার

হবে না, এবং তখন minimum government ছাড়া আর কিছুরই দরকার হবে না। এঁর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির সত্যকারের enlightened হওয়া দরকার। সে অবস্থায় রাষ্ট্রও প্রায় থাকবেই না। এরই নাম enlightened anarchy, যা গান্ধীজির কাম্য ছিল।

৩

এ হতে বোঝা যায় যে, এই লড়াইটা সত্যিই বিরাট্ সামাজিক লড়াই। বস্তুতঃ গান্ধীজি জেনে শুনে খুব সজ্ঞানেই সে কথা বলেছিলেন। শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না তা নয়; বরং খুব বেশি সচেতন ছিলেন। তাঁর সমাধান কিন্তু বিভিন্ন রকমের। কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করেন যে, মানব-চরিত্র বদল হয় না, তাই জোর করে পূর্বেকার রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে দিতে হবে। এবং তারপর রাষ্ট্র অর্থাৎ প্রোলেটারিয়াট্ খুব কড়া হাতে ডিক্‌টেটরি চালাবে। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত খুব স্পষ্ট। লেনিনের মত উদ্ধৃত করে স্টালিন বলছেন—

> The dictatorship of the proletariat cannot be "complete" democracy, democracy for *all*, for the rich as well af for the poor ; the dictatorship of the proletariat must be a state that is democratic *in a new way for* the proletarians and the propertyless in general—and dictatorial *in a new way against* the bourgeoisie. (Lenin : *Selected Works,* vol. vii. p. 34—quoted by Stalin in *Leninism,* p. 43)

গান্ধীজির প্রস্থানভূমিটা গোড়া থেকেই একেবারে অন্য। মানুষের উপর তাঁর অবিচল বিশ্বাস। সেইজন্যই বলপ্রয়োগের বদলে হৃদয়-

বদলে তিনি ভরসা রাখেন। সেই কারণেই তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব "Ramrajya of my dream ensures rights alike of prince and pauper. (Bose, p. 89) এই জন্যই তিনি বলতে পারেন—

> By the non-violent method, we seek not to destory the capitalist, we seek to destory capitalism. We invite the capitalist to regard himself as a trustee. (Bose, p. 85)

এখন সব চেয়ে বড় তর্ক থেকে যায় এ মতের সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা নিয়ে। সমাজ থেকে সঞ্চয় তুলে দিলাম না, অথচ তাকে একটা সীমা ছাড়াতে দেব না, এই নিয়মন করবে কে? ক্যাপিটালিস্টকে রেখে ক্যাপিট্যালিজম ধ্বংসের চেষ্টা কেমনতর? তা হলে মনে হয়, সত্যই তো সংগ্রাম চালু রাখতে হবে অথচ শেষ করা হবে না। রাষ্ট্রের ভয়েই কি বিকেন্দ্রীকৃত মূলধন নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকবে? তা হলে কি রাষ্ট্র একটা বিকট মূর্তি ধরবে না?

এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে একটা পাল্টা প্রশ্ন আছে। গান্ধীবাদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি আপাততঃ। ধরেই নিলাম যে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা না করলে লোভ যায় না—স্বেচ্ছায় সম্পত্তিত্যাগ, হৃদয়-বদল, ট্রাস্টীশিপ এসব আকাশ-কুসুম মাত্র। সে হিসেবে বলপ্রয়োগ ছাড়া গতি নেই এবং সে বলপ্রয়োগ যদি পূর্ণতম না হয় তা হলে বুর্জোয়ার জের মিটবে না এবং হয়তো একুশবার নির্বুর্জোয়া করবার অবসর কলিযুগে মিলবেই না—সচকিত বুর্জোয়ারা একজোট হয়ে প্রতিবিপ্লবের ধাক্কায় বিপ্লবকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সুতরাং ওস্তাদের মার প্রথম বেলাতেই হওয়া উচিত এবং সে মার একেবারে চরম হওয়া উচিত। কিন্তু মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে ও স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তিতে যাঁরা বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং সেই কারণেই বলপ্রয়োগের দরকার অনুভব করছেন, তাঁরাও শেষ

পর্যন্ত কি বলছেন ? কথাটা ভেবে দেখা দরকার। সকলেই জানেন, সোশ্যালিজম আর কমিউনিজম এক নয়। সমাজতন্ত্রবাদ হল সাম্যবাদে যাবার প্রথম ধাপ মাত্র। এ দুয়ের তফাত আজ সকলেই জানেন, সেজন্য এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু এ অবস্থা সহজে আসে না। প্রথমে বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংস চাই। এমন কি বুর্জোয়া সমাজের পুরো ধ্বংস না হলে যে শ্রমিকেরা ক্ষমতাগ্রহণ করবে না তা নয়। অন্তত: লেনিনের শিক্ষা তা নয়। কাজেই শ্রমিকেরা যদি সুযোগ পেয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে বুর্জোয়া সমাজ পুরোপুরি চলে গেল এমন কথাও ভাবা যায় না। সেইজন্য পরাজিত বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালাবার দরকার বহুদিন থাকে। লেনিনের কথা হল :

> The dictatorship of the proletariat is a most determined and most ruthless war waged by the new class against a *more powerful* enemy, the bourgeoisie, whose resistance is increased *tenfold* by its overthrow. (quoted by Stalin in *Leninism*, p. 41)

সুতরাং একদিকে যেমন এই নির্মম সংগ্রাম চলবে, অন্যদিকে চালাতে হবে নিজেদের পরিবর্তনের চেষ্টা। মার্ক্স কর্মীদের বলেছিলেন—

> You will have to go through fifteen, twenty, fifty years of civil wars and international conflicts, not only to change existing conditions, but also to change yourselves. (*Ibid*, p. 41)

লেনিন আরও স্পষ্ট করে বললেন—

It will be necessary under the dictatorship of the proletariat to re-educate "millions of peasants and small masters, hundreds of thousands of office-employees, officials and bourgeois intellectuals" to subordinate all these to the proletarian state and to proletarian leadership, to overcome "their bourgeois habits and traditions...."....just as we must in a protracted struggle waged on the basis of the dictatorship of the proletariat—re-educate the proletarians themselves, who do not abandon their pettybourgeois prejudices at one stroke, by a miracle, at the behest of the Virgin Mary, at the behest of a slogan, revolution or decree, but only in the course of a long and diffficult mass struggle against mass petty-bourgeois influences. (*Ibid* p. 42)

এই কথাগুলির তাৎপর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিপ্লব হবার আগেই শুধু চিত্তক্ষেত্রের প্রস্তুতি হলে চলবে না। বিপ্লব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনের সংস্কার যায় না। সেইজন্য বিপ্লবের পরেও দীর্ঘকাল ধরে প্রোলেটারিয়েটকে শেখাতে হবে—অর্থাৎ তাদের নতুন মানুষ করে তুলতে হবে। এই শিক্ষার প্রয়োজন এত দীর্ঘকালের যে যখন সমাজতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদে যাবার উপক্রম হয়েছে—অর্থাৎ পুরো একটা যুগ হাতেকলমে লোকে সমাজতন্ত্রবাদকে সফল করে পরবর্তী যুগে যাবার উপযুক্ততা অর্জন করেছে—তখনও এই শিক্ষার প্রয়োজন কমে না। মানুষের মন সত্য সত্যই বদলে দেওয়া তো সহজ নয়।

রাষ্ট্রের এই শুকিয়ে ঝরে যাওয়া সম্বন্ধে লেনিন তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক গ্রন্থে খুব পরিষ্কার আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রথম কথা হল, নৈরাজ্যবাদীদের মতে রাষ্ট্রকে উৎখাত করে দেওয়া এবং

মার্ক্সীয় মতে রাষ্ট্রের ঝরে-পড়া সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করবার সময় রাষ্ট্র ঝরে পড়ে না। পুরোপুরি সাম্যবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্র ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। কিন্তু মধ্যে প্রলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ বেশ কিছুকাল থাকবেই। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনও প্রয়োজন থাকে না, কেননা শ্রেণীগতভাবে কাউকে অত্যাচার করবার বা দাবিয়ে রাখবার প্রয়োজন থাকে না।

> Only Communism makes the State absolutely unnecessary, for there is *nobody* to be suppressed —"nobody" in the sense of a *class*, in the sense of a systematic struggle against a definite section of the population. (Lenin: *The State and Revolution*)

কিন্তু এ জিনিস সহজে হয় না। কমিউনিজমের প্রথম অবস্থায়—যাকে সোস্যালিস্ট অবস্থা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে—পুরোপুরি কমিউনিজম স্থাপনা করা সম্ভব হয় না। বুর্জোয়া সমাজের জের তখনও কিছু কিছু চলে। সেইটেকে সজোরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার জন্য সে অবস্থায় খুব জোরালো রাষ্ট্রযন্ত্র চাই। একদিকে এই চাপ, অন্যদিকে জনসাধারণের অভ্যাস বদল—এইভাবে পুরো কমিউনিজমের স্থাপনা হবে।

স্টালিনও তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ *Economic Problems of Socialism in USSR*-তে বলেছেন, সমাজতন্ত্রবাদ থেকে পুরো সাম্যবাদে যেতে হলে অন্ততঃ তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া চাই। প্রথমটি হল, সমস্ত সামাজিক উৎপাদনের অবিরাম প্রসার। দ্বিতীয়তঃ, যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা এখন আছে group property হিসেবে—সেটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ চাই। তৃতীয়তঃ, সমাজের মতিগতির সম্পূর্ণ বদল চাই। স্টালিনের কথাই তুলে দিচ্ছি—

It is necessary, in the third place, to ensure such a cultural advancement of society as will secure for all members of society the all-round development of their physical and mental abilities, so that the members of society may be in a position to receive an education sufficient to enable them to be active agents of social development, and in a position to freely choose their occupations and not be tied all their lives, owing to the existing division of labour, to some one occupation. (p. 76)

যতক্ষণ বড় বড় জটিল মেশিন থাকবে ততক্ষণ সেসব মেশিন চালাবার জন্য বিশেষ শিক্ষারও দরকার হবে এবং ততক্ষণ শ্রমবিভাগের হাতও এড়ানো যাবে না। প্রত্যেকেই পলিটেক্‌নিকে সমান শিক্ষা পেয়ে প্রত্যেকেই সব মেশিন চালাতে সমান দক্ষতা অর্জন করবে—এ না হলে শ্রমবিভাগের হাত সম্পূর্ণ এড়ানো বোধ হয় সম্ভব নয়। কিন্তু বড় বড় জটিল মেশিনে যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে কি প্রশ্ন করা চলে যে, অপেক্ষাকৃত সহজ এবং ছোট ছোট মেশিনের রাজত্ব ছাড়া পুরো কমিউনিজম সম্ভব নয়?

যাক, এই আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ছেড়ে দিলাম। যে কথাটা বলছিলাম। দেখা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত নতুন মানুষ গড়তেই হবে। তারই জন্য অবিরাম চেষ্টা। প্রথম বিপ্লবের পূর্ব হতে একেবারে পুরো সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই চেষ্টা চলবে। দশ বিশ পঞ্চাশ বছরও তা চলতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ social development-এর active agent হয়ে না উঠবে ততক্ষণ পুরো কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠাও হবে না। কিন্তু যখন মানুষ ঐ রকম বদলে

যাবে তখন পুরো কমিউনিস্ট সমাজের প্রতিষ্ঠাও হবে আর রাষ্ট্রও ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে ঝরে যাবে।

সুতরাং আমার পাল্টা প্রশ্ন হল, উপায় যতই পৃথক হোক না কেন, (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল যে উপায় ভয়ংকর রকম পৃথক; সেই জন্যই গান্ধী আর লেনিনের সমীকরণের চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় বলে আমি মনে করি।) শেষ পর্যন্ত এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন যে, কেবল যান্ত্রিক উপায়ে শেষ পর্যন্ত কোনও মানবিক সমাজ চলতে পারে না? এ কথাও তো সহজেই বোঝা যায় যে-সময় প্রত্যেকটা মানুষ রাষ্ট্রের আদর্শ সফল করবার জন্য সজ্ঞানে চেষ্টা করছে সেখানে তাদের উপর জোর করবার দরকার হয় না এবং রাষ্ট্রের কর্মসীমা স্বতঃই কমতে কমতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। রাষ্ট্রের আদর্শ লেনিনের ও গান্ধীর এক নয়। দুজনের উপায়ও পৃথক। কিন্তু যখন লেনিনের পথেই লেনিনের আদর্শে মানুষ পৌঁছে যাবে এবং প্রত্যেকেই সমাজবিকাশের active agent হিসাবে চলার ফলে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, তখন জীবনযাত্রা, সঞ্চয় ও সমাজের নিয়ামক থাকবে কে? মানুষের হিতবুদ্ধি নয় কি? যান্ত্রিক উপায়টা গোড়ায় দরকার যদি বা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতুন মনোবৃত্তি ছাড়া উপায় আছে কি?

গান্ধীজি সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে গোড়া থেকেই এই হিতবুদ্ধি জাগ্রত করতে চাওয়া ছাড়া অন্য কিছু চেয়েছিলেন কি? লেনিন স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্বের অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। গান্ধীজিও স্বতঃস্ফূর্তির তত্ত্বে বিশ্বাস করেন নি। আপনা-আপনি এরকম বদল হয় না। তার জন্য অবিরাম চেষ্টা চাই। শ্রেণীসংগ্রামের চেয়ে এ সংগ্রাম কিছুই ছোট নয়, বরং আরও বড়। বস্তুতঃ এটা যে কঠিনতর শ্রেণী-সংগ্রামই—এ কথা গান্ধীজি বলতে কখনও কসুর করেন নি। কঠিনতর এই কারণে যে, এ মারের ভয় দেখিয়ে মন বদলানো নয়,

গোড়া থেকেই সত্যকারের মন বদলানো। যা কমিউনিস্টদের মতে অসম্ভব। তাঁদের মতে প্রথমটায় বল-প্রয়োগ চাই-ই—প্রোলেটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ প্রথমটায় না হলে চলবে না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রতি পদে নিয়ন্ত্রণ চালাতে গেলে রাষ্ট্র monster-রূপ নেবে কি না ? আমার মনে হয় এ প্রশ্ন ঠিক লাগছে না। পূর্বেই বলেছি, কমিউনিস্ট শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, বুর্জোয়া সমাজের পতনের পরও প্রলেটারিয়ান রাষ্ট্রকে বহুকাল ধরে সংগ্রাম চালাতে হবে, কেননা বুর্জোয়া সমাজের শিকড় সহজে মরে না। লেনিনের কথায় সে সংগ্রাম হবে "a most determined and ruthless war,....bloody and bloodless, violent and peaceful, military and economic, educational and administrative—অন্যদিকে, নতুন রাষ্ট্রকে শক্ত বুনিয়াদে দাঁড় করাবার জন্য যে নিদারুণ নিয়ন্ত্রণ দরকার তার কথা সকলেই জানেন। সুতরাং সে রাষ্ট্র যদি monster-রূপ না নেয়, তা হলে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যতটুকু নিয়ন্ত্রণ দরকার সেটুকু নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র monster হয়ে উঠবে কেন ? গান্ধীজি তো গোড়া থেকেই চেয়েছিলেন মানুষের সজ্ঞান সহযোগিতা, স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ। এটা কাজে সম্ভব হোক আর নাই হোক, সে কথা অন্য। সে কথাও কার্যক্ষেত্রে আমাদের ভাবতে হবে, কিন্তু শুধু থিয়োরির দিক থেকে অন্ততঃ এতে গোড়ার দিকে নিয়ন্ত্রণ দরকার হলেও তা তুলনায় কমই হবে। প্রয়োজনমত সে রকম নিয়ন্ত্রণ চাই, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাই না—এ কথা গান্ধীজি নিজেই বলেছেন।

> The violence of private ownership is less injurious than the violence of the State....the State represents violence in a concentrated and organized form....However, if it is unavoidable,

> I would support a minimum of State-ownership. (Bose, p. 42)

মানুষে স্বেচ্ছায় নৈতিক সীমানার মধ্যে যদি সংযত না হয়, অথবা গোড়ায় তার সেই নীতিবোধ জাগরিত হতে যদি দেরি হয়, তা হলে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা দরকার হবে বই কি। কিন্তু অন্যপন্থায় withering away of the state হবার আগে পর্যন্ত যে কঠিন সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণের দরকার হয় তার চেয়ে স্বভাবতঃই কম। সেইজন্য গান্ধীজি বলতেন যে, ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিংসার ফল, কিন্তু রাষ্ট্রগত সঞ্চয় অহিংসারই ফল।—

> Accumulation by private persons was impossible except through violent means, but accumulation by the State in a non-violent Society was not only possible, it was desirable and inevitable. (Bose, p. 279)

এর তাৎপর্য খুব স্পষ্ট।

সেই সঙ্গে আরও একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। সেটা হল, প্রমাণ ও প্রমেয় এক নয়। প্রমেয় থাকলে তার প্রমাণ থাকে, কিন্তু একটা প্রমাণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ প্রমেয় বস্তুর সম্পূর্ণ স্বরূপ বোঝা যায় না; কেননা আরও প্রমাণ থাকতে পারে। জ্বর হয়েছে দেখেই বলা চলে না, রোগী সান্নিপাতিকে ভুগছে, কারণ সর্দি হলেও জ্বর হয়। সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে তা বুঝতে হবে। পুঁজির পুঞ্জীভবন এখন একটা টেক্‌নিকের মত। পূর্বে একটা বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়ারই লক্ষণ ছিল পুঁজির পুঞ্জীভবন। সে সমাজ হল ধনতান্ত্রিক সমাজ। তার যত বিকাশ হবে অর্থাৎ ধনতন্ত্র যত বাড়বে, পুঁজি ততই পুঞ্জীভূত হবে। এখন এই অবস্থার বদল হয়েছে। একটা বিশেষ সমাজের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে পুঁজির পুঞ্জীভবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ ঘুচে গিয়েছে। অন্য

রকম সমাজেও পুঁজির পুঞ্জীভবন হতে পারে। তফাতটা টেক্‌নিকের তত নয় যতটা উদ্দেশ্যের। কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পুঁজির চরম পুঞ্জীভবন হয়, আমেরিকাতেও পুঁজির পুঞ্জীভবন হয়,—কিন্তু দুয়ের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এক জায়গায় তা পুঞ্জীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রের হাতে, অন্য জায়গায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তিসুখের জন্য। অর্থাৎ, ক্যাপিটালিজমের জন্য যেসব টেক্‌নিক আবিষ্কৃত হয়েছে, কমিউনিজম সে টেক্‌নিক ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করে নি। বড় বড় ফ্যাক্টরি, এরোপ্লেন, অ্যাটম বোমা তৈয়ারির কারখানা এসব একই ধরনের দু জায়গায়। লোহা-নিষ্কাশনের টেক্‌নিক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কিছু নতুন নয়। শুধু এই বা কেন? এমন কি, লেন-দেন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারেও সেই সমস্ত টেক্‌নিক অনেক দূর পর্যন্ত ব্যবহার করতে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কোনও দ্বিধা নেই। স্টালিন তাঁর শেষ গ্রন্থে বলছেন যে, রুশিয়াতে তো জিনিস তৈরি করে বেচবার সময় দামের হিসেবেই কেনাবেচা হয়, জিনিসের বদলে জিনিস বিনিময়ের প্রথা নেই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর তাৎপর্য যে-রকম সমাজবাদী রাষ্ট্রে তা নয়, কারণ সেখানে সমাজসংগঠনটাই অন্য। তাঁর কথা হল ঃ

> Commodity-production leads to capitalism only if there is private ownership of the means of production, if labour power appears in the market as a commodity which can be bought by the capitalist and exploited in the process of production, and if, consequently, the system of exploitation of wageworkers by capitalists exists in the country.

সমাজতান্ত্রিক দেশে এসব নেই। সেই জন্য দামের হিসেব প্রচলিত থাকলেও তার ফলাফল সেখানে সম্পূর্ণ রকম তফাত। সেখানে

উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল চরম লাভের লোভ নয়, সমাজের চরম উন্নতি। পক্ষান্তরে বিকেন্দ্রীকরণ হলেই যে সেই সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজ হতে পারে না এমন কোনও কথা নেই। জাপানের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প-ব্যবস্থার কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এমন কি ইংলণ্ডেও সেই ধরনের চেষ্টা কিছুটা দেখা যাচ্ছে। তা বলে কেউই বলবেন না যে, জাপান বা ইংলণ্ড ধনতান্ত্রিক রাজত্ব নয়। আসল কথা হল, একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিকে পুঁজির পুঞ্জীভবন ধনতন্ত্রের বিকাশের নামান্তরমাত্র। এ কথাও সত্য যে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক ঝোঁকই হল পুঁজির পুঞ্জীভবনের দিকে। কিন্তু তা হতে উল্টো জিনিসটাও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় না। অবস্থা বা পারিপার্শ্বিকের বদল ঘটলে দেখা যায় যে, পুঞ্জীভবন ছাড়াও ধনতন্ত্র চলতে পারে, অন্ততঃ অনেককাল চলতে পারে। আবার, পুঞ্জীভবন হলেও ধনতন্ত্রের আবির্ভাব একেবারেই না হতে পারে যদি পারিপার্শ্বিক বদলে দেওয়া হয় এবং সমাজব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণ অন্য রকমের থাকে। তখন অস্ত্রের টানে সৈনিককে চলতে হয় না, সৈনিকের ইচ্ছামতই অস্ত্র চলে এবং সে অস্ত্র সম্পূর্ণ নতুন উদ্দেশ্যে চালিত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীভবনের অগ্নিবাণকে কাবু করবার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের বরুণবাণ ছোঁড়া হল, ব্যাপারটা এ রকম নয়। ব্যাপারটা বস্তুতঃ টেক্‌নিকের ঠোকাঠুকির প্রশ্ন নয়ই। আসল কথাটা হল সমাজবিন্যাসকে বদলে দেবার প্রশ্ন, যে কথাটা স্টালিন খুব গভীরভাবে বলেছেন। কমিউনিস্টরা সেই চেষ্টা করছেন আরও বেশি কেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ একেবারে সব রাষ্ট্রায়ত্ত করে। বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন যদি আলোচনা করতেই হয়, তা হলে সেটাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতে হবে,—বুঝতে হবে সেটা সমাজবিন্যাস এমন করে বদলাতে পারছে কি না যাতে ধনতন্ত্রের হাত হতে উদ্ধার পেতে পারা যায়। তা না হলে শুধু বিকেন্দ্রীকরণ হিসেবেই বিকেন্দ্রীকরণের মূল্য কিছু নেই। গান্ধীজি যে এটাকে

গভীরতর অর্থে প্রয়োগ করবার কথাই বলেছেন, এমন প্রমাণ তাঁর রচনায় ভূরি ভূরি আছে। সেটা সফল হবে কি না তা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। প্রথমতঃ, যদি কোনও মহাশক্তিধর পুরুষ আসেন যিনি মানুষের নৈতিক সীমানার মধ্যে সংযত থাকার মনোবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, তা হলে তা হতে পারে। কিন্তু গান্ধীজি স্বয়ং এ রকম দৈবে বিশ্বাস করতেন না, কারণ একজন লোকের নৈতিক প্রভাবের উপরই যদি সমাজব্যবস্থার বদল নির্ভর করে তা হলে সে লোকটি মহাপুরুষ হয়ে যেতে পারেন বটে, কিন্তু তাতে সমাজব্যবস্থার আসলে কোনও বদল হয় না। সেই জন্য চাই সমাজব্যবস্থারই বদল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, বিকেন্দ্রীকরণের লড়াইটাই হল সেই সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে, যে শক্তির ফলে কেন্দ্রীভবন হয়। অতএব দেখতে হবে আজ সমাজে যে ঘাত-প্রতিঘাত চলছে তাতে এই লড়ায়ের সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি।

৪

পূর্বেই বলেছি, এই লড়ায়ের সাফল্যের জন্য গান্ধীজি দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করতেন। প্রথম হল, মানুষের উপর দুর্মর বিশ্বাস। ডাকের মত ডাক দিতে পারলে হৃদয় বদল হবেই। দ্বিতীয়তঃ, যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন নেহাত প্রয়োজন হলে কিছুটা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ। এইজন্যই গান্ধীজি নিজেকে প্র্যাক্টিক্যাল আইডিয়ালিস্ট বলতেন। তাঁর কল্পনা শুধু অলস কল্পনা ছিল না; কাজের খাতিরে তিনি অন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে রাজী ছিলেন, যদি সে অস্ত্র ক্রমে ক্রমে তাঁর আদর্শকে কাজে পরিণত করবার সহায়ক হয়। নচেৎ অবশ্য নয়।

কিন্তু গান্ধীবাদ মার্ক্সবাদ ইত্যাদি সব রকম 'বাদে'র নৈষ্ঠিক টীকা-

টিপ্পনী ছেড়ে দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিতে জগতের বর্তমান অবস্থা বিচার করে আমার অনেক সময়ই ছুটো কথা মনে হয়েছে। এ বিষয়ে খুব দৃঢ় সিদ্ধান্ত হিসেবে আমি কথা ছুটি উপস্থিত করছি না, ত্রুটি থাকলে সংশোধন মেনে নিতে রাজী আছি। তবু কথা ছুটি বলি। প্রথম কথাটা হল, আজ সংকটে পড়ে ধনতন্ত্র আবার এক নতুন রূপ নিচ্ছে। দ্বিতীয় কথাটা হল, ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোয় কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণ-তত্ত্বের বিশেষ কতকগুলি সমস্যা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পুনর্বিবেচনার দরকার আছে।

মার্ক্স ও লেনিনের কথাটা মূলতঃ এক হলেও পারিপার্শ্বিকের তারতম্য অনুসারে লেনিন তত্ত্ব ও কর্মকৌশলের কিছু কিছু বদল করেছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। মার্ক্সিজম কোনও dogma নয়, লেনিন এ কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন এই কারণেই। বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে কোনও বিপ্লবী তত্ত্ব হতে পারে না। মার্ক্স যে সময় তাঁর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন তখন ধনতন্ত্রের রূপ এক রকম ছিল। লেনিনের সময় তার চেহারা বদল হয়ে গিয়েছে। মার্ক্সের সময় ধনতান্ত্রিক বিকাশ প্রধানতঃ জাতীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, লেনিনের যুগের মত তার আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের চেহারা ততখানি প্রবল হয় নি। সেইজন্যই মার্ক্স বলেছিলেন, কোনও দেশে বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ পরিণতিতে পৌঁছলে তবে শ্রমিকবিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়। সেই জন্য শ্রমিক-বিপ্লব হবার সম্ভাবনা সেইসব দেশেই ঘটে, যেখানে ধনিকসমাজ এ রকম পরিণতি লাভ করেছে বা করতে চলেছে। লেনিন বললেন, জগতের অবস্থা এমন বদলেছে যে, এ কথা আর সত্য নয়। মূলধন তার বিকাশের চরম পর্যায়ে পৌঁছে আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের রূপ নিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের জাল আজ জগৎজোড়া। সুতরাং সেই জাল যেখানে দুর্বলতম সেইখানেই তাকে ছিঁড়তে হবে। সেই

দুর্বলতম স্থান থেকেই বিপ্লবের জয়যাত্রা শুরু হবে। সে দেশ শিল্পে অগ্রসর না-ও হতে পারে, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। লেনিনের এই বিশিষ্টতার কথা স্টালিন তাঁর 'লেনিনিজম' নামক গ্রন্থে খুব সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, লেনিন ধনতন্ত্রের যে অবস্থা দেখেছিলেন বর্তমানে কি সেই অবস্থা আছে? সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন, তা নেই। এই বদল নানা দিকে ঘটেছে। তার অনেকগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক মূলধনের জাল এক জায়গায় ছিঁড়লেও এখনও জগৎবিপ্লব হয় নি। সেইজন্য থিয়োরির দিক থেকে এক দেশে বিপ্লবের যুক্তি এখন তাত্ত্বিকদের তো জোগাতে হচ্ছেই; উপরন্তু ম্যালেনকভ স্বয়ং কিছুদিন আগে বলেছেন যে, ক্যাপিটালিস্ট ও কমিউনিস্ট দুটি পদ্ধতি জগতে পাশাপাশি থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শুধু রুশিয়া নয়, পরন্তু পূর্ব-জার্মানি হতে শুরু করে চীন পর্যন্ত এক অতি বিরাট ভূখণ্ড ধনতান্ত্রিক বাজারের বাইরে চলে গিয়েছে—যে কথাটা স্টালিন তাঁর নবতম গ্রন্থে খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। তৃতীয়তঃ, যেসব দেশ কমিউনিস্ট বাজারের বাইরেও আছে, তার মধ্যে অনেক দেশই মাথা নাড়া দিতে শুরু করেছে। বিশেষতঃ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে পূর্বেকার মত শোষণ চলবে না। চতুর্থতঃ, এ পর্যন্ত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও মূলধন দেখা দিচ্ছে, বিদেশী মূলধনের তার সঙ্গে রফা না করে উপায় নেই। আজ আমেরিকা যতই চেষ্টা করুক না কেন, পূর্বেকার ইংলণ্ডের মত আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটালের জাল সে রকম ভাবে আর কোনও কালেই ছড়াতে পারবে না। তার জাল গুটোতে হয়েছে। একেই স্টালিন বলেছেন, ক্যাপিটালিজম্-এর ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু যদি কেউ বলেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ধনতন্ত্র এখনই ভেঙে পড়বে তা হলে ভুল কথা বলা হবে। একদিকে যেমন

এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়ছে, অন্যদিকে ধনতন্ত্রও বিপদ বুঝে ঠিক তেমনই আত্মরক্ষার জন্য নিজের রূপ বদলাচ্ছে। আমেরিকার অতি-সাম্প্রতিক চেষ্টার কথা ছেড়ে দিলে বলা যায়, ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার জন্য রূপ-বদলের প্রধান লক্ষণ হল গ্রুপ বা দল বাঁধা। একটা দেশ বা দু-তিনটি দেশ মিলে যখন সারা জগৎকে শোষণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না, তখন স্বতঃই চেষ্টা হয় অন্ততঃ কয়েকটা দেশ একত্র মিলে পারস্পরিক কিছু সুবিধা দিয়ে বাইরের সংকটের হাত এড়াবার। এ হল সর্বনাশ উপস্থিত হলে অর্ধেক ত্যাগ করে আত্মরক্ষার সেই সনাতন চাণক্য-নীতি। এই রকম দল বাঁধার খুব বড় রকম চেষ্টা প্রথম দেখা গিয়েছিল বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় অটোয়া-চুক্তি বা ইম্পীরিয়ল প্রেফারেন্সের মধ্য দিয়ে। তারপর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই চেষ্টা প্রসারিত হয়েছে—যার ফলে স্টার্লিং ব্লক, ডলার ব্লক, hard currency countries, soft currency countries ইত্যাদির উৎপত্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এর জের মেটে নি, বরং বেড়েছে। পূর্বে আমরা যেখানে দেখতাম আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান ও জগৎজোড়া অবাধ বহুমুখীন বাণিজ্য, আজ তার বদলে সেইজন্যই দেখি নিয়ন্ত্রিত ও কন্ট্রোল-কণ্টকিত জাতীয় মুদ্রামান এবং চুক্তিবদ্ধ দ্বিমুখীন অর্থাৎ bilateral trade-এর ক্রমপ্রসার। এর মানে এ নয় যে, কোনও দেশেই ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে না। বরং প্রাচ্যের যেসব পশ্চাৎপদ দেশ এখন শিল্পে বাণিজ্যে অগ্রসর হতে শুরু করেছে সেসব দেশে পুরনো ভঙ্গীতে ধনতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে এবং পুঁজির পুঞ্জীভবন হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অবস্থার চাপে আন্তর্জাতিক ফিনান্স-ক্যাপিটাল যেমন বিকলাঙ্গ হয়ে দল বেঁধে আপন প্রাণ বাঁচাবার নীতি অনুসরণ করছে, বাইরের মূলধনের চাপে এবং ভিতরের গণ-আন্দোলনে দেশী মূলধন তো জন্ম হতেই বিকলাঙ্গ। গত শতকে জাতীয় মূলধন যে নিদারুণ তেজে বেড়ে উঠেছিল এখন সে তেজ

নেই, হতেও পারে না। সুতরাং মার্ক্সের কর্মকাণ্ড যেমন লেনিন বদল করেছিলেন এখন এই অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে কর্মকাণ্ডের পুনরায় বদল প্রয়োজন কি না সে কথা ভাবা দরকার। বিকেন্দ্রী-করণ কি সেই নতুন কর্মকাণ্ড হতে পারে?

কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করবার আগে আরও একটা কথা বলা দরকার। সেটা হল ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থা। পুঞ্জীভবন কৃষিতেও হয়, বর্তমান ভারতবর্ষে তা হচ্ছেও। কিন্তু তবু এ কথা সত্য যে, শিল্পে যে রকম আকারে এবং যতটা তীব্রভাবে পুঞ্জীভবন হয়, কৃষিতে ততখানি হয় না। সেইজন্য মার্ক্স যখন ধনতন্ত্রের বিকাশের কথা বলেছিলেন তখন মুখ্যতঃ শিল্পের কথাই বলেছিলেন। এমন কি, সাম্যবাদীর ঘোষণাপত্রিকায় যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে, তা কেবল-মাত্র বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের দ্বন্দ্ব—অর্থাৎ যারা মজুরি দিয়ে লোক খাটায় এবং যারা মজুরি অর্জন করে এই দুই দলের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে কৃষকসমাজের ভূমিকা কি, সে সম্বন্ধে একবার মাত্র একটি কথা আছে। মার্ক্সের সাধারণ অভিমত হল, কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল, তারা ইতিহাসের ধারাকে পিছন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় এবং যদি কৃষক সমাজের কোনও এক ছোট অংশ কোনও সময় বিপ্লবের সহযোগিতা করেও, সেটাও প্রকারান্তরে স্বার্থের খাতিরেই।[২] সেইজন্য মার্ক্সের তত্ত্ব ছিল কৃষকদের থামিয়ে রাখতে

২ মার্ক্সের কথা হল, The lower mindle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all these fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay, more they are reactionary, for they try to roll back the wheels of history. If by chance they are revolutionary, they are so only in view of their impending transfer into the proletariat. লেনিন স্পষ্ট করে বলেছেন, It may be said that the whole of Marx's

হবে। লেনিন অবশ্য বিপ্লবের শক্তি হিসেবে কৃষকদের কথা ভোলেন নি। কিন্তু তাঁর তত্ত্বেও কৃষকেরা বিপ্লবের সূচীমুখ নয়। এমন কি বিপ্লবের পরও তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য থাকে, কিন্তু তবু পার্থক্যের ধারা সুস্পষ্ট। মধ্যে মধ্যে সংঘাতও হয়েছে, লেনিনকে তা সামলাতে হয়েছে। স্টালিনকেও সময় সময় তা সামলাতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের ধারা এখন পর্যন্ত চলছে। স্টালিন তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থেও বলেছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে কৃষির ক্ষেত্রে তেমন হয় নি। যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বটে, কিন্তু তারা পুরো State propertyও নয়,—তারা হল Group property। এই তফাত ঘুচে না গেলে পুরো কমিউনিজম আসবে না। আপাততঃ এই দুইটির অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরাকরণ হবে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে।[৩] কিন্তু পার্থক্য যে আছে

Capital is devoted to explaining the truth that *the basic forces of capitalist society are, and can only be, the bourgeoisie and the proletariat.* (Lenin : *Work in the Rural Districts* ; *Report Delivered at the Eighth Congress of the Russian Communist Party, Bolshevik*, March 28, 1919) লেনিন কিন্তু বললেন, However it by no means follows from this—It would be a profound mistake to think it does—that in the future work of building communism, now that the bourgeoisie has been overthrown and political power is already in the hands of the proletariat, we can continue to carry on without the assistance of the middle and intermediary elements...Now we must devote our attention to *the question of the middle peasantry* in its full magnitude. *(Ibid)*

৩ স্টালিনের কথা হল, Of course, the workers and the collective-farm peasantry do represent two classes differing from one another in status. But this difference does not weaken their friendship in any way. *(Economic Problems of Socialism in the USSR,* p 30.)

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিপ্লবে কৃষক সমাজের স্থান কি—এই নিয়ে বিরাট একটি বই রচিত হতে পারে, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে একেবারেই সম্ভব নয়। যে কথাটা এখানে বলবার উদ্দেশ্য সেটা হল এই যে, কৃষি আর শিল্পের চেহারা এক নয়, তাদের বিবর্তন-ধারাও এক নয়। কেন্দ্রীভবনের সমস্যা এবং তার প্রতিষেধক হিসেবে আরও কেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়করণের ব্যবস্থা শিল্পের ক্ষেত্রে সহজে প্রযোজ্য। রুশিয়াতে আজও কৃষি পুরো রাষ্ট্রায়ত্ত হতে পারে নি। বস্তুতঃ কৃষির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই সেদিকে বেশি নয়। রুশিয়ার এই রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীকরণের প্রভাব কৃষির উপর কি হয়েছে তাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। সংক্ষেপে বলা যায়, রুশিয়ার সমস্ত পরিকল্পনার ঝোঁক হল শিল্পের দিকে,—কৃষি তার পিছনে পিছনে এসেছে। স্টালিন যে হিসেব সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে দাখিল করেছিলেন তা হতে দেখি যে, ১৯১৩ সনে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪২˙১ ভাগ আসত বড় শিল্প হতে, কৃষি থেকে আসত ৫৭˙৯ ভাগ। ১৯৩৩ সনে তা বদলে গিয়ে অবস্থা দাঁড়াল অন্যরকম ; শিল্প হতে এল ৭০˙৪%, কৃষি থেকে ২৯˙৬%। এর মধ্যে আবার Producer Goods Industryর উপরই ঝোঁক পড়েছিল বেশি। কৃষির মধ্যেও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের যত প্রসার হয়েছিল (সাড়ে সাত লক্ষ হেক্টার বৃদ্ধি) খাদ্যদ্রব্যের তত হয় নি (সাত লক্ষ হেক্টার বৃদ্ধি)। অর্থাৎ প্রধানতম ঝোঁক ছিল দেশকে শিল্পে অগ্রসর করা—তারই রথচক্রে অন্য সমস্ত কিছু বাঁধা থাকবে। এই ধারা এখন পর্যন্ত প্রবহমান।

এ হতে একটা জিনিস মনে হয়। রাষ্ট্রীয়করণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভবনের প্রতিকার হতে গেলে সারা দেশটারই গতিপ্রকৃতি কেন্দ্রীভবনের দিকে ঝোঁকা দরকার। অর্থাৎ, যে দেশটা কেন্দ্রীভবনের দিকে ঝুঁকেছে সেইখানেই ঐ চিকিৎসা সহজে এবং খুব সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। যে দেশটা আগাগোড়া শিল্পায়িত হয়ে ওঠে নি এবং

আর সমস্ত কিছুই তার রথচক্রে বাঁধা নয় সেখানে ঐ চিকিৎসা ব্যাহত হয় না কি? পূর্বেই বলেছি, রুশিয়াতেও কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়করণ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নি। যে দেশ সর্বপ্রযত্নে একমাত্র শিল্পায়নকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়ে আর সব কিছুই সেই অনুসারে গড়ে তুলতে চায় না, সেসব দেশে তা হলে কি পুরো রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ের সন্ধান প্রয়োজন নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতবর্ষকেও পুরোপুরি শিল্পপ্রধান দেশ করবার আদর্শ-ই আমরা গ্রহণ করছি না কেন? এ প্রশ্নের আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে বলা যায়, সে আদর্শ গ্রহণ করলেও তা কাজে পরিণত করা সহজে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, আজ বাইরের জগতে যে অবস্থা তাতে আমরা জিনিস উৎপাদন করলেই তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করতে পারব তা নয়। এমন কি নিজেদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করার পথেও বাধা আছে। প্রধানতম বাধা হল ক্রয়ক্ষমতার অভাব। সে বাধা রয়েছে কেন, তা কেন দূর করা যাচ্ছে না এসব অনেক তর্কের বিষয়। আপাততঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আমরা রাতারাতি শিল্পভূয়িষ্ঠ দেশ হচ্ছি না এবং কৃষিই কিছুকাল পর্যন্ত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা থাকবে, তা হলে আমাদের দেশের এই বিশেষ অবস্থায় কোন্ কৌশল সবচেয়ে কার্যকরী হবে?

এ বিষয়ে আমি নিজে এমন কোনও দৃঢ় সিদ্ধান্ত করতে পারি নি যার ফলে খুব জোর করে কোনও শেষ কথা বলবার সাহস রাখি। কিন্তু তবু না বলে পারছি না যে, এ যত ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে বর্তমান কালে এইসব অবস্থাবৈশিষ্ট্যের ফলে জগতে—বিশেষ করে ভারতবর্ষে—এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে আমাদের নতুন কর্মকৌশলের কথা ভাবতে হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ছোট ছোট শিল্পের উপর জোর পড়ছে, কৃষিও সমবায়ী করবার চেষ্টা হয়েছে। হয়তো বিকেন্দ্রীকরণের

বর্তমান সরকারী রূপ এই-ই। এতে আমাদের এখনো-জোরালো ধনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটবে কি? সমাজবাদী টেকনিকের পুরো নিয়ন্ত্রণের দরকার হবে না? অর্থাৎ আমরা উভয় দিক পরিত্যাগ করে একটা সত্যিকারের নতুন মধ্যিম নিকায় তৈরি করতে পারব—যে নিকায় সফল হবে? এ বিষয়ে সমাজশাস্ত্রীরা ভাবুন, আমার বক্তব্য এই।

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা

কিছুকাল আগে কাগজে পড়া গিয়েছিল যে, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য আমেরিকা থেকে একটি ছ বছরের বালক ও একটি চার বছরের বালিকা ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই রকম অল্পবয়সে সমুদ্র-পাড়ি দিতে দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়—এই সিদ্ধান্ত করে ইংলণ্ডের হোম-সেক্রেটারি ইংলণ্ডে তাদের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছেন; অবশ্য সেই সঙ্গে বলে দিয়েছেন যে, যদি তারা সাঁতার দেবে না এই শর্তে রাজী হয়, তা হলে সেই শর্তাধীনে ইংলণ্ডে এক মাস থাকতে পারে। হোম-সেক্রেটারির এই সিদ্ধান্তকে সকলেই সুবিবেচনার কাজ বলে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সংবাদ-পত্রে কোনও কোনও রসিক লোক এই প্রশ্ন করেছেন যে, যদি তারা ফরাসী দেশ থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইংলণ্ডের কূলে এসে ওঠে, তা হলে কি তাদের উঠতেও দেওয়া হবে না? বলা বাহুল্য, কোনও রসিকতর ব্যক্তি এ প্রশ্নের জবাব দেন নি। আর, যেহেতু জগতের সকল সরকারী দপ্তরখানার ত্রিসীমানায় রসিকতার প্রবেশ নিষেধ, সেহেতু ইংরেজ সরকারও আর এ নিয়ে মাথা ঘামান নি।

কিন্তু এই কথাটা পড়ে মনে হল, বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, যার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। যখন ভারতবর্ষে ধর্ম প্রাণবান ছিল, জীর্ণ লোকাচারের ঠুন্‌কো বাঁধনেই শেষ হয়ে যায় নি, সে যুগে ভারতবাসী শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনেই নয়, ধর্মপ্রচারের আগ্রহেও দেশবিদেশের মানবসমাজের সঙ্গে পরিচয় করতে চেয়েছে,—তারাও বিদেশে গিয়েছে, বিদেশীদের পক্ষেও তাদের দরজা খোলা ছিল। ইতিহাসের সীমানার ওদিকেও শোনা যায়, বশিষ্ঠ প্রভৃতি নাকি তিব্বত পার হয়ে সুদূরে যাত্রা

করেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য, ইতিহাসের সীমানার এদিকে অতীশ প্রভৃতির নাম আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বহু বছর ধরে নানা কারণে এ দেশের ধর্ম ও সমাজের এই সজীব বীর্যবত্তা ও প্রাণের প্রবাহ যখন কেবল কতকগুলি বাহ্য লোকাচারের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন একদিকে আমরা জাগ্রত বিচারবুদ্ধিকে প্রচলিত সংস্কারের কাছে বিসর্জন দিয়েছিলাম, তেমনই অন্যদিকে চারপাশের দরজা বন্ধ করে বসে ছিলাম, পাছে বাইরের দমকা হাওয়ায় আমাদের এই জীর্ণ নড়বড়ে কাঠামোটা ঠুক করে পড়ে ভেঙে যায়। সনাতন ভারতবর্ষ সেইজন্য একালে চারদিকের দরজা এঁটে খুব নিশ্চিন্তে অচলায়তনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল,—ওই ইংলণ্ডের হোম-সেক্রেটারির মতই ভাবছিল যে, এবার আর সাঁতারুদের ইংলণ্ডে প্রবেশ করতে দিচ্ছি না। ঠিক এমন সময়েই ফরাসী দেশ থেকে সাঁতার দিয়ে ইংলণ্ডে হাজির হবার মতই বিদেশ থেকে পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউ আমাদের কূলে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। আমাদের সমাজের হোম-সেক্রেটারিরা কালাপানির ভয় দেখিয়ে জাত যাবার হুমকি দিয়ে আমাদের চারদিকে নানা রকম বেড়া তুলে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু ঢেউটা যখন বাইরে থেকে এসে সজোরে আমাদের কূলে আঘাত দিল, তখন সেইসব হোম-সেক্রেটারির কল্পনাজল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে সেই ঢেউ সমস্ত ঠুন্‌কো বেড়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বস্তুতঃ, এ ইতিহাস কারও অজানা নয়, সকলেই এর মর্মকথাটা জানেন। পশ্চিমী সভ্যতার অভিযান আমাদের দেশে সাম্রাজ্য জয়ের রক্তপিচ্ছিল পথেই আরম্ভ হল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নতুন হাওয়া নিয়ে এল তাতে দেশজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিত্তও জয় করল। আমাদের ইতিহাসে দেখা যায়, বার বার বিদেশী শক্তি ভারত আক্রমণ করেছে, জয়ও করেছে, কিন্তু

চিত্তের ক্ষেত্রে এমন বদল ঘটাতে আর কোনও শক্তিই পারে নি। রবীন্দ্রনাথের কথায় "বাহির থেকে মুসলমান হিন্দুস্থানে এসে স্থায়ী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরের দিকে প্রসারিত করে নি। বাহুবলের ধাক্কা দেশের উপর খুব জোরে লেগেছে, কিন্তু কোনো নতুন চিন্তারাজ্যে কোনো নতুন সৃষ্টির উদ্যমে তার মনকে চেতিয়ে তোলে নি।...তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষ রূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীক রূপে।...মানুষ হিসেবে তারা রইল মুসলমানদের চেয়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে, কিন্তু য়ুরোপের চিত্তদূত-রূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আরকোনো বিদেশী জাত কোনো দিন এমন করে আসতে পারে নি। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।" আমরা স্থলে জলে শুনতে লাগলাম তার পরাক্রান্ত সিংহ-গর্জন, অনুভব করতে লাগলাম তার শক্তির মদমত্ততা, কিন্তু সেই সঙ্গে আস্বাদ পেলাম তার বন্ধনমুক্ত বুদ্ধির স্বাধীন অনুশীলন, চিত্তের উদার স্বারাজ্য। প্রত্যক্ষ এরোপ্লেনের সামনে গল্পের পুষ্পকরথ টেকে না। তেমনই আমরা দেখলুম যে, পঞ্জিকা, মনসা, ওলাবিবিকে অস্বীকার করে সংস্কারমুক্ত মনের সাহায্যে এরা ব্যাধি মহামারীকে করল বিতাড়িত, চড়চড় করে গেল এগিয়ে। তখন অন্ধবিশ্বাসে অর্থহীন প্রাণহীন আচারকে মানতে আমাদেরও আর ইচ্ছা রইল না, আমাদের মনেও নানারকম প্রশ্ন এসে দেখা দিল।

আজকে আমরা আবার একটা যুগান্তরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যুগান্তরের চিহ্ন সব দিকেই। বর্তমান যুগ যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন ইউরোপ জগতে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছিল, কি অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, কি চিত্তের উদ্ভাসনে। জগৎময় যেমন তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে, তেমনই তার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোও ছড়িয়েছে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও অন্যান্য দেশে যে জীর্ণ সমাজব্যবস্থা ছিল তা খসে পড়বার উপরেই

ছিল, তখনও তার চিত্ত জাগ্রত হয় নি, আত্মাভিমানও না। সুতরাং ইউরোপের অস্ত্রশক্তি বা মননশক্তি কোনটার বিরোধিতা করবার মত তার কিছু ছিল না;—শুধু তার কেন, জগতের কারও ছিল না। আজ কিন্তু পালাবদল ঘটেছে। এতকাল তার স্বাধিকারমত্ততা চলবার পর মেঘদূতের যক্ষের মতই সে অস্তগতমহিমা হতে চলেছে। একদিকে ইউরোপে দেখা দিয়েছে গভীরতর সংকট, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে প্রাচ্যেও চিত্তের জাগরণ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ইউরোপের প্রাধান্য আজ সেইজন্য অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং বাইরের প্রবলতায় দুদিক থেকে বিপন্ন। এই সংকটে সমস্ত জিনিসটা আর একবার খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

২

ইউরোপীয় সভ্যতার বাণী যখন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিল তখন ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী যতই মহনীয় হোক না কেন, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক ছিল না। বাস্তব জীবনে আমরা কতকগুলি অর্থহীন আচারকেই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিলাম, ফলে আমরা অবুদ্ধিকে অবিদ্যাকে রাজা করে দিয়ে তার কাছে হাতজোড় করে বসেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কী বৃত্তান্ত, বলে ভূতের কোন জবাবদিহি নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এতবড় জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে।···চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে

মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি, সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার, না সর্বমানবের।…জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোন একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না। স্মুতরাং পরপদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদযুগলের পরিবর্তন হবে, এইমাত্র প্রভেদ।" বাস্তবিকপক্ষে আমাদের হচ্ছিলও তাই। এই অবুদ্ধিকে অবিদ্যাকে আশ্রয় করেছিলাম বলেই আমাদের সমাজ অন্তঃসারশূন্যতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল, বারে বারে আমরা বৈদেশিক শক্তির হাতে মার খাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন পশ্চিমী সভ্যতার কাছে মার খেলাম, তখন মার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত হবারও সুযোগ পেলাম। এই নতুন চিন্তাধারা হল, ওই ভূতের ভয় থেকে মুক্তি। চিত্তবৃত্তির স্বারাজ্য। রবীন্দ্রনাথেরই কথায়, "যেখানেই য়ুরোপের মন পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত-প্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পণ্ডিতের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকে সে নির্মমভাবে দমন করেছে। সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।" এই বুদ্ধিই তাকে সর্বত্র জয়ী করেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধি তার সামনে নব নব আবিষ্কারের পথ রচনা করেছে, যন্ত্রশক্তির উদ্ভাবন সম্ভব করেছে। তার ফলে সারা জগতে স্থলে জলে আকাশে অবাধ বিচরণ সম্ভব

হয়েছে, কত কল্পনাতীত জিনিস আজ বাস্তব হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রিক চিন্তায় এই বুদ্ধিই তাকে জ্ঞান দিয়েছে যে, রাষ্ট্রের অমোঘ বিধান বিধির লিখন নয়, তা মানুষেরই গড়া। অর্থাৎ যে সময় থেকে তারা বুঝল যে রাষ্ট্রনিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে সেই সময় থেকেই ভয়মুক্ত মনে তারা ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করে সমাজের ও রাষ্ট্রের নতুন রূপ গঠনে চেষ্টিত হয়েছে, এরই ফলে তারা সমাজজীবনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে পেরেছে, রাষ্ট্রকে দিতে পেরেছে নতুন রূপ। আসলে আছে এই বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিই তাকে চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে শক্তির ক্ষেত্রে এমন অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়েছে যে, তার সামনে কেউই দাঁড়াতে পারে নি; বরং তার শক্তির মত্ততায় আহত হলেও তার চিত্তের জ্যোতিতে সাগ্রহে বরণ না করে নিয়ে পারে নি। রামমোহনের ফরাসী পতাকা দেখে উচ্ছ্বাস এবং মাইকেলের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন এইরকম আগ্রহের পরাকাষ্ঠা বললেও চলে, সেই প্রথম সংস্পর্শে আমরা পশ্চিমী সভ্যতার ঢেউয়ে একেবারেই ভেসে গিয়েছিলাম।

তারপর অবশ্য অনেক কাল কেটে গিয়েছে, অবস্থার অনেক বদল হয়েছে। আমরা ক্রমে বুঝতে পারলাম যে "য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মহলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্য নয়, আগুন লাগাবার জন্য।" এই আগুনের ধ্বংসলীলার চিহ্ন পিকিনের পথে পথে, অহিফেন-যুদ্ধে, ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে, পারস্যের পদদলনে, বস্তুতঃ বিজিত দেশের সর্বত্রই ছড়ানো আছে। সুতরাং আমাদের মন থেকে ভূতের ভয় দূর করবার জন্য আমরা যেমন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি কৃতজ্ঞ, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে কর্মের ক্ষেত্রে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তিমত্ততাকে প্রাণপণে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজেদের সম্মানকে বিশ্ব-রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। একদিনে এ চেষ্টা সম্ভব হয় নি। কিন্তু

এ কথা আজ মানতেই হবে যে, পর পর দুটি মহাযুদ্ধের ফলেই হোক, বা ইতিহাসের যে-কোন কারণেই হোক, সমস্ত প্রাচ্য আজ রুখে দাঁড়িয়েছে, নির্বিবাদে তার উপর শাসন করবার দিন বিগত। তা ছাড়া সাম্রাজ্যের দিন যত শেষ হয়ে এসেছে ততই ইউরোপে নিজেদের মধ্যে লেগেছে কলহ, লেগেছে মহাযুদ্ধ, ঘটেছে বিপুল শক্তিক্ষয়, এসেছে অনিবার্য্য ক্লান্তি। শক্তির মদমত্ততায় বিশ্বময় কেশর ফুলিয়ে বেড়ানোর সামর্থ্য তার আর নেই। আমেরিকা বার বার খোঁচানো সত্ত্বেও সে যেন সে রকম যুদ্ধোত্তম করতে পারছে না। কিন্তু আসল সংকট সেখানে নয়, আসল সংকট চিত্তের ক্ষেত্রে। তার যে আসল মহিমা ছিল, সে মহিমা যদি অস্তগত হয়, তা হলে আর কোন জিনিসই তাকে বড় করতে পারবে না। সেই সংকটের কথাটাই বলি।

৩

ইউরোপে এসে দেখছি, যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে সেটা হল, কমিউনিজ্‌ম। এত বড় একটা মহাযুদ্ধের ঝড় ইউরোপের উপর দিয়ে বয়ে গেল, কি অসীম ক্ষতি ও লোকসান! কিন্তু তবু সেইসব স্মৃতিও যেন ইতিমধ্যেই ম্লান হয়ে এসেছে, আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে রণদামামা বাজতে শুরু হয়েছে, তা ওই কমিউনিজ্‌মকে কেন্দ্র করেই। কমিউনিজ্‌ম হবে কি হবে না—এইটেই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইখানে একটা কথা বুঝবার আছে। কমিউনিজ্‌ম হবে কি হবে না—এই প্রশ্নটার যখন উল্লেখ করি, তখন তার অর্থ এ নয় যে ইউরোপে মাত্র গোটাকতক সোভিয়েট-অধিকৃত দেশে খাঁটি ধরনের কমিউনিজ্‌ম হয়েছে, আর বাকি সমস্ত দেশে কমিউনিজ্‌মের যা কিছু

উল্‌টো শুধু সেই সবই রয়েছে। একটা উদহারণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। আজকের জগতে আমেরিকা ও রুশিয়া ঠিক দুটি উল্‌টো জীবন-যাত্রা ও সমাজপদ্ধতির প্রতীক। কমিউনিজ্‌ম বলতে যদি রুশিয়াকে বুঝি, তা হলে তার যা কিছু উল্‌টো তা খুঁজে পাওয়া যাবে আমেরিকায়। ইউরোপে আজ পশ্চিম-ইউরোপ ও পূর্ব-ইউরোপের মধ্যে এই কমিউনিজ্‌মের প্রশ্ন নিয়েই রণদামামা বাজতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু সেখানে আসল প্রশ্নটা হল—মস্‌কোর অধিকার কতদূর অবধি বিস্তৃত হবে? আপত্তিটা মস্‌কোর প্রতি যত, 'কমিউনিজ্‌মে'র প্রতি ততটা নয়। অবশ্য কথাটা এভাবে বলার বিপদ আছে। কমিউনিজ্‌ম কি—এ নিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অন্ত নেই। এমন কি, পাকা কমিউনিস্টদেরও সে বিষয়ে মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, 'প্রাভ্‌দা'র দৈববাণী শুনে তাঁরা আবার ভুল সংশোধন করে নেন। সুতরাং মস্‌কোর নির্দেশের বাইরে কমিউনিজ্‌ম হতে পারে, এ কথা অনেকে মানবেনই না। কিন্তু এরকম চুলচেরা শাস্ত্রগত অর্থে কমিউনিজ্‌ম কথাটা ব্যবহার করছি না। মস্‌কোর ব্যাখ্যা বাদ দিয়েও যদি ইতিহাসের পর্যায় হিসেবে এবং একধরনের বিশিষ্ট সামাজিক ও মানসিক অবস্থার প্রকাশ হিসেবে কথাটাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যায় তা হলে দেখা যাবে, আমেরিকা যে অর্থে কমিউনিস্ট-বিরোধী পশ্চিম-ইউরোপের যেসব দেশ রুশিয়ার বিরুদ্ধে 'সাজ সাজ' রব তুলেছেন তাঁরা কিন্তু সে অর্থে কমিউনিস্ট-বিরোধী নন। অর্থাৎ তাঁরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেও নিজেরা এদিকে সম্পত্তি রাষ্ট্রীয়-করণ, শ্রেণীবৈষম্যের হ্রাস ইত্যাদি ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছেন অথবা হতে চাচ্ছেন। ব্যাপারটার মহাভারতীয় নাটকীয়তা আছে। যেন এক পক্ষ দ্রোণাচার্যের হয়ে লড়ছেন, অপর পক্ষ দ্রোণাচার্যকে মারতে চাইছেন, কিন্তু উভয় পক্ষেরই অস্ত্রশিক্ষা দ্রোণাচার্যের কাছে। তফাতের মধ্যে একালের দ্রোণাচার্যটি অর্জুনের কাছে সানন্দে মরতে রাজী নন, এই

যা। বর্তমান কালের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতির চেহারা দেখলেই তা বোঝা যাবে। এ দেশগুলির কোথাও মার্কা-মারা কমিউনিস্টরা গভর্মেন্ট গঠন করতে পারে নি ; বরং কোথায়ও কোথায়ও ইলেক্শন-নিয়মের চাতুরীতেই হোক[১] বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক কিছু ক্ষমতা হারিয়েছে। ইংলণ্ডে তো কমিউনিস্টদের কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু এসব দেশে বে-কমিউনিস্টদের হাতে যা হচ্ছে তা আমেরিকায় কখনও ঘটবে না। এবং আমেরিকার সঙ্গে তুলনা করলে এসব জিনিসের রকমসকম তাদের তুলনায় প্রায় 'কমিউনিস্ট' ভঙ্গীরই। ইংলণ্ডের কথা সকলেই জানেন। ফ্রান্সের সরকার অতখানি অগ্রসর হতে রাজী হন নি ব'লে অশান্তির অন্ত নেই। ধর্মঘট, হৈ-চৈ লেগেই আছে। ইটালিতেও সম্প্রতি যেসব ভূমিসংস্কার আইন হয়েছে সেগুলি আর যাই হোক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে বাড়ায় নি, বরং দারুণ রকম খর্বই করেছে। তফাত যথেষ্ট, দুপক্ষ এ নিয়ে প্রাণ-ঘাতী লড়াই করতেও দ্বিধা করবে না, তবু এসব দেখে মনে হয় যে উভয়পক্ষই ভেক ধারণ করতে চলেছে—তার মধ্যে যারা মস্‌কোর আখড়ায় মন্ত্র নিয়ে ভেক ধারণ করেছে তাদের আল্‌খাল্লার রঙটা কিছু গাঢ়, একেবারে ম্যাজেণ্টা রঙে ছোপানো, আর গুরুর আদেশ মনে করে ভালমন্দ কোন কাজ করতেই তাদের কোনও দ্বিধা নেই। আর যারা মস্‌কোর আখড়ায় মন্ত্রণা নিয়ে নিজে নিজেই ভেক ধারণ করেছে তাদের আল্‌খাল্লার রঙটা কিছু ফিকে, সকলের আল্‌খাল্লা ঠিক এক

১ ১৯৫০ সালে ফ্রান্সে নতুন ইলেকশন-নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল। তাতে বহু জায়গায় proportional reprsentation বদলে দিয়ে দলগত ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অর্থাৎ, তিনটি দল একত্রিত হয়ে একটি নির্বাচনকেন্দ্রে শতকরা ৫১টি ভোট পেয়েছে। তাদের প্রার্থীরা যদি আলাদা আলাদা একজনও না জিতে থাকে তা হলেও তারাই জয়ী হবে। জয়ের হিসাবটা সম্মিলিত দলের, ব্যক্তির নয়।

রকমও নয়। তা ছাড়া গুরু না থাকায় ভালমন্দ সব কাজ ইতস্তত না করে করতেও তাদের অনেক সময় বাধে। অর্থাৎ আমেরিকা ও রুশিয়ার মত একজন ভেকধারী আর একজন আলখাল্লা-পরা তো নয়ই, উপরন্তু একেবারে দোশালা-পরা ফুলকোঁচা-ওড়ানো চেহারার তফাতটা এতখানি নয়। ভেকধারীদের মধ্যেও ঝগড়া হয়, এখানেও হতে পারে, কিন্তু তার জন্য একদল ভেকধারী রাগ করে নিজেদের আলখাল্লা ছেড়ে ফুল-কোঁচা-করা ধুতি পরতে রাজী নয়। সে অপরের ভেক ধারণ করবে না বটে, সেখানে মারামারি করবে যথেষ্ট, কিন্তু নিজের ভেকও ছাড়বে না।

অবশ্য ইউরোপেও এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। উদাহরণ স্বরূপ স্পেন ও সুইট্জরলণ্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। স্পেনেও ওরকম ভেকধারী গভর্মেণ্ট নেই, সুইট্জরলণ্ডেও নয়। কিন্তু স্পেনে যে ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থা আছে তাতে ব্যক্তির অধিকারটা বড় হয়ে ওঠে না। কিন্তু স্পেন সম্বন্ধে আলোচনা করব না, কারণ প্রথমতঃ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, দ্বিতীয়তঃ চিত্তের ক্ষেত্রে বা কর্মের ক্ষেত্রে স্পেন পথপ্রদর্শক নয়। সুইট্জরলণ্ডের কথাটা অন্য। এখনও সে গণতন্ত্রের চরম উদাহরণ হয়ে আছে। কোনও অশান্তি নেই, ধর্মঘট নেই, মতপ্রকাশের অধিকার সম্পূর্ণ। এমন দেশ আজকের দিনে দুর্লভ। কিন্তু তার কারণ আছে যথেষ্ট। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে না হতে তার মধ্য থেকে সেই প্রাচীন কালেই সুইট্জরলণ্ড গঠিত হয়েছিল, এ রকম সংহতি বর্তমান রাষ্ট্র-গুলির মধ্যে তারই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন। দ্বিতীয়তঃ, এতকাল তারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে এসেছে, তার ফলে প্রচলিত জীবনযাত্রার ধারা কখনই হঠাৎ এমন ভয়ানকভাবে ওলটপালট হয় নি যাতে মানুষের সকল বাঁধন কেটে গিয়ে তারা মরিয়া হয়ে সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকে। তৃতীয়তঃ, এ দেশের লোকের চিত্ত কর্মে

আকৃষ্ট। প্রত্যেকটি জায়গার উন্নতি হয়েছে, দেশময় শিল্প-ব্যবসা ছড়ানো, নদী থেকে বিদ্যুৎ হচ্ছে, কলকারখানা চলছে। এই কর্মের মধ্যে তাদের চিত্ত মুক্তি পায়, সেই দিকেই তারা বেশি ব্যস্ত। চতুর্থতঃ আরও একটা কারণ আছে বলে আমার মনে হয়। সে কারণটা এই যে, মানুষের মন যে ভঙ্গীতে বিকশিত হলে তারা 'প্রয়োজনীয়' জিনিসের চেয়ে 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিস নিয়েই মাথা ঘামাতে আরম্ভ করে, এমন কি যার ফলে অনেক জাত, বাঙালীর মত, কাজের বদলে শুধু কল্পনা নিয়েই মত্ত,—এদের মনটা সে ভঙ্গীর নয়। সেইজন্যই প্রকৃতির এমন মহিমার মধ্যে থেকেও এবং এত দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে শান্তিভোগ করেও এদের মধ্যে গ্যেটে শিলার শেক্সপীয়রের মত কোনও কবি বা নাট্যকার জন্মায় নি, হিউগো ফ্লবেয়ারের মত কোনও ঔপন্যাসিকও জন্মায় নি, বাখ বীঠোফেনের মত সংগীতকারক দূরে থাক্ আট হাত লম্বা আলপাইপ ভেঁপু ছাড়া জাতীয় বাজনাও কিছু নেই, পাহাড় পেরিয়ে ইতালিতে চিত্রের পরাকাষ্ঠা হয়ে গেলেও এ দেশের কোনও বড় চিত্রকরের নাম শোনা যায় না। এমন কি, এমন কোন একজন বড় রাজনৈতিক নেতার নামও শোনা যায় না ইতিহাসে যাঁর দান বড় হয়ে আছে। আসলে এসব নিয়ে এরা মাথা ঘামাতে চায় না। অথচ এ দেশের লোকে ঘড়ি তৈরি করে সবচেয়ে ভাল, জিনিস তৈরি করে নিখুঁত, দেশটার অর্থনৈতিক উন্নতি করতে ওস্তাদ, আর যতটুকু অবসর পায় তার সবটুকুই খেলাধুলায় মত্ত। কাজেই মনটা এইদিকেই আটকে আছে, ওদিকে যেতে চায় না। সেইজন্যই হয়তো এ দেশটায় ঐসব সমস্যা এখনও ঠিক সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি। কিন্তু এ রকম ঘটনাচক্র বেশি দেশের ভাগ্যে ঘটে না—এমন কি ঘটে কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ আজকের দিনে আর তো চোখে পড়ে না। কাজেই এসব হল ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়।

বিভিন্নরকম ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন

দেশ বিভিন্নরকম ভাবে গড়ে উঠবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু যে কারণে ইউরোপ জগতে প্রধান আসন গ্রহণ করেছিল সেই কারণটার অনুসন্ধান করতে গিয়ে এখন কি দেখি? দেখি যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং চিত্তের ক্ষেত্রেও ইউরোপ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এক পক্ষ মনে করে যে, নতুন যুগে চিত্তের উদ্ভাসনের যে বাণী তা কমিউনিজ্‌মের মধ্যেই আছে। অপর পক্ষ তা মনে করে না, অন্ততঃ প্রথম পক্ষের বাণীর মধ্যে তা নেই এই কথাটাই সে বলতে চায়। অবশ্য এই দ্বিতীয়পক্ষভুক্ত সকলের কথা ঠিক এক নয়। আমেরিকার যে কথা, ইংলণ্ডের কথা ঠিক তা নয়। তবু এক বিষয়ে তারা একমত যে অন্ততঃ অপর পক্ষের কথার মধ্যে সে বাণী নেই।

অপর পক্ষের কথার মধ্যে যে সে বাণী নেই—এ কথা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। কমিউনিজ্‌মের গোড়ার কথাই হল এই যে, কমিউনিজ্‌ম হল আসলে কর্মকাণ্ডের ব্যাপার—তার জ্ঞানকাণ্ড যদি কর্মকাণ্ডের পথ দেখাতে না পারে, তা হলে মিছে থিয়োরি নিয়ে কোনও লাভ নেই। থিয়োরি ভুল হলে কর্মপন্থা ঠিক থাকবে না—এ কথা সত্য, সেই জন্য ঠিক থিয়োরির বিশেষ দরকার আছে, কিন্তু সে থিয়োরি হবে কাজের অগ্রদূত। সেই জন্য কমিউনিজ্‌মের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডকে আলাদা করে দেখা নৈষ্ঠিক কমিউনিস্ট শাস্ত্রে লেখে না। সে-হিসেবে কমিউনিস্ট পুঁথির যা বাণী, তার সঙ্গে বিভিন্ন মার্কামারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কি ঘটছে তা যদি আলাদা না করে দেখি, তা হলে এ কথা বলতেই হবে যে, তার বাণী যতই বড় হোক্ না কেন, সে বাণী বাস্তবে যে রূপ পাচ্ছে তার সঙ্গে সকল মানুষের মন পুরোপুরি কিছুতেই সায় দিতে পারে না। রাষ্ট্র-রক্ষার দোহাই দিয়ে, বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার অজুহাত দেখিয়ে যে সমস্ত ক্রূরতা, অসত্যতা ও মানবতার নির্যাতন চলছে তাতে হয়তো রাষ্ট্রের বুনিয়াদ

আপাততঃ ভয়ের ভিত্তিতে পাকা হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে মন সায় দেয় না। তা ছাড়া, যে কথা আমি বার বার বলবার চেষ্টা করেছি, সেটাও হল এই যে, প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব যদি আসে, তা হলে সে আসবে নিজের ইতিহাসের তাগিদে—মস্‌কোর কাছে দাসখত না লিখে দিলে বিপ্লব হল না, এ কথা কিছুতেই মানতে পারি নে।

কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে, এ পক্ষের কথাটা কি। কমিউনিজ্‌মের কর্মকাণ্ডের বেলায় যতই আপত্তি করি না কেন, তার জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অন্ততঃ একটা দৃপ্ত আহ্বান আছে, যা শোষিত মানুষের মনকে নাড়া দেয়। আর জগতে শোষিত মানুষই বেশি, সেই জন্য তাদের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া খুব স্বাভাবিক। বলা অবশ্য সহজ যে, এই আহ্বান হল মানুষকে জৈব সুখের আহ্বান, এর মধ্যে মনুষ্যত্বের বড় আদর্শের কোনও আহ্বান নেই, এ হল মানুষের লোভকে বাড়িয়ে তোলা, হিংসাকে জাগিয়ে তোলা। পক্ষান্তরে এ কথাও তো সত্য যে অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-শিক্ষার অভাবে যেসব মানুষ বিকশিত হতে পারছে না, তাদের এই অকালমৃত্যুও তো মনুষ্যত্বের চরম অপমান, সেই অপমানও তো অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-শিক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু এ সব তর্কই ছেড়ে দিলাম; ধরে নিলাম, কমিউনিউজ্‌মের আহ্বান খুব উঁচু স্তরের আহ্বান নয়। কিন্তু যতক্ষণ এ পক্ষের বাণীর মধ্যেও একটা বড়দরের আহ্বান শুনতে না পাব, ততক্ষণ সে বাণীর দিকে জগৎ আকৃষ্ট হবে কেন?

অথচ আজকে এই পক্ষের অবস্থাটা কি? ইউরোপের কথাই বলি, কেননা, আমেরিকার শক্তিই আছে, বাণী নেই। এর মধ্যে সব চেয়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় হল, নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব। যখন মানুষের কাছে কোন একটা সত্য সত্য বৃহৎ বাণী আত্মপ্রকাশ করে তখন তার জ্যোতিতে মানুষ যায় দিশাহারা হয়ে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব লুপ্ত

হয়ে যায়, সমস্ত মানুষটার মনেপ্রাণে সেই বাণীই অবিরত ঝংকৃত হতে থাকে। সত্যকারের বড় বাণীর এই হল লক্ষণ। সেই জন্য ইংরেজী সভ্যতার প্রথম আঘাতের সময় ইউরোপীয় চিত্তের উদ্ভাসন যখন মহৎ বাণীরূপে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করল, তখন আমরা তার স্রোতে ভেসে গিয়েছিলাম। যখন মহাত্মা গান্ধী প্রথম স্বরাজের বাণী প্রচার করলেন, তখন তার দৃপ্ত প্রকাশে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম—আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হয় নি, সংশয়ের অবকাশ হয় নি, আজ পশ্চিম-ইউরোপের চিত্তে যদি সেই রকম একটা খুব বড় বাণীর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ থাকত, তা হলে এত হাজার রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব আত্মকলহের অবকাশ থাকত না—এসব ছেড়ে দিয়ে সকলেই সেই বাণীর উন্মাদনায় ভেসে যেত। অথচ আজ পশ্চিম-ইউরোপে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় সব চেয়ে বেশি। প্রথমে ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করি। ফ্রান্সে ১৯৫০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে S. F. I. O., R. G. R., M. R. P., U. D. S. R., P. R. L., Radicals, Near Radicals ইত্যাদি কত যে দল ছিল তার ইয়ত্তা নেই। পরের নির্বাচনগুলিতেও সেই দশা। তাই দেখে কিছু কিছু লোক বিরক্ত হয়ে ক্লেমেন্সোর বিখ্যাত উক্তি স্মরণ ক'রে বলেছিল Je vote pour le plus bete অর্থাৎ I vote for the biggest beast! ভোট জিতবার সময় নানা কৌশলে বিভিন্ন দল কমিউনিস্টদের যদি বা হারালো, গভর্মেণ্ট গঠনের সময় আর তাদের মিল হয় না তার ফলে গভর্মেণ্ট গড়া কঠিন হয়ে ওঠে। তার ফলে ফ্রান্সে আজ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা সকলেই জানেন। ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করি। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজ জাতের ভিত্তিই ছিল সবচেয়ে মজবুত, একেবারে কংক্রিটে গাঁথা, সেখানে কোনও ফাটল ছিল না। সে হিসেবে তারা জগতের মধ্যে অনন্য। তারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে রাষ্ট্রচর্চায় শিল্পকলায় এমন একটি নিজস্ব জীবনদর্শন ও জীবনযাত্রা সৃষ্টি করতে পেরেছিল যা তার সমস্ত দেশবাসীকেই

আটকে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, অন্য কোনও আদর্শ তাদের টানতে পারে নি, অন্ততঃ বেশিরকম পারে নি। সাম্রাজ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশেষ কোনও মতবিরোধ ছিল না, দেশের ব্যাপারেও রাজ্যশাসনের এমন কতকগুলি পদ্ধতি ছিল যা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই মেনে চলত, ক্ষমতা পেলেই তার অপব্যবহার করত না। তার উপর, স্বদেশের প্রতি ইংরেজের ভক্তি অসীম, সেখানে কোনও চিড় খাওয়ানো সম্ভব ছিল না। এখন এর প্রত্যেক জায়গাতেই ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে। স্কটলণ্ড আলাদা পার্লামেণ্ট চায় ও আলাদা ব্যবস্থা চায়, এ দাবি তার এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে তা শুধু মুখে মুখে ঘোরার বদলে এখন তার জন্য লণ্ডন থেকে রাজ্যাভিষেক-প্রস্তর চুরি হয়ে গেল। ওয়েলস্‌ও এইরকম দাবি তুলছে। পার্টিশনের ভুক্তভোগী হিসেবে এইরকম ভাঙনের কথা তোলা মানা করতে গিয়ে দেখেছি, অনেক সাধারণ লোকের মধ্যেও এ সব বিষয়ে দাবি এত জোর যে তারা কোন মানা শুনতে চায় না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল এই যে, ইংলণ্ডের ডকে sabotage হবে, যুদ্ধ-জাহাজে sabotage হবে, বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্বশীল কর্মচারীরা উধাও হয়ে যাবে এবং সন্দেহ হবে যে তারা হয়তো রুশিয়াতেও পালিয়ে থাকতে পারে— এসব কথা আগে ইংলণ্ডের পক্ষে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এসব থেকে যা প্রমাণিত হয় সেটা হল এই যে, এত কাল যেসব আদর্শ যেসব বাণী ইংরেজচিত্তকে অমোঘ আকর্ষণে আটকে রেখেছিল,এখন অন্ততঃ দু-চারটি ক্ষেত্রেও সে পূর্বের মত তা পারছে না, আর একটা আদর্শের বৃহত্তর আকর্ষণে লোকে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভেসে যাচ্ছে। তবু তো অন্য দেশের তুলনায় এখনও ইংলণ্ডে এসব খুবই কম। বেলজিয়ম তো Flemish ও French এই দুই অংশের চাপা মন-কষাকষিকে আজ বেশ স্পষ্ট রূপ দিতে আরম্ভ করেছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, কিন্তু এই লক্ষণ পশ্চিম-ইউরোপের সর্বত্র। ওদিকে যেমন

কমিউনিস্টদের অদ্ভুত একাগ্রতা, fanatic zeal, এদিকে তেমনই বিশ্বাসের অভাব, একাগ্রতার অভাব, অন্তর্দ্বন্দ্ব যথেষ্ট। এ থেকে বোঝা যায়, ওদিকে এমন একটা বাণী আছে যা ভাল হোক মন্দ হোক লোককে মাতিয়েছে, কিন্তু এদিকে সেরকম কিছু নেই।

বাস্তবিক পক্ষে এদিকে সেরকম যে কিছু নেই তা বুঝবার জন্য এইরকম বাহ্য লক্ষণ যাচাই করবার দরকার হয় না, এদিকের কথাটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বর্তমান কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি যেভাবে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকারকে পদদলিত করে চলেছে তাকে বাধা দেবার প্রয়োজন আছে বুঝি। কিন্তু যাঁরা এই আহ্বান জানিয়েছেন তাঁদের ঘরের মধ্যে নিগ্রো-সমস্যা আছে, কালা আদমিকে ঘৃণা এখনও সর্বত্র যায় নি। সুতরাং এ অবস্থায় সে আহ্বানের মূল্য স্বতঃই যায় কমে। দ্বিতীয়তঃ, এ পর্যন্ত এঁরা এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা করেছেন সে হল সম্মিলিত ইউরোপ (United Europe) গড়ে তুলবার চেষ্টা। এ চেষ্টা তো রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছেই। চার্চিল প্রথমে কথাটা তোলেন, তারপর আইসেনহাওয়ারও তাই বলেছেন। নর্থ আটলান্টিক চুক্তি হল এর সামরিক সংস্করণ। শুম্যান প্ল্যান হল এর অর্থনৈতিক সংস্করণ। কিন্তু এসব লোক যখন এই ধরনের কথা বলেন তখন তাতে বিস্মিত হই না। কিন্তু সত্য সত্য বিস্ময়ের কারণ আসে যখন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত দার্শনিকও বর্তমান কালের সমস্যাগুলির অতি নিপুণ বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত সমাধানের বেলায় ওই কথা ছাড়া আর কোনও বাণী খুঁজে পান না।

অবশ্য ইউরোপের ইতিহাসের কথাটা এক দিক দিয়ে ভেবে দেখলে এতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই। এতদিন ধরে বুদ্ধির যে স্বারাজ্য এবং চিত্তের যে স্বাধীনতার অনুশীলন সে করে এসেছে, বর্তমান ইতিহাসের চাপে তার এই ধরনের পরিণতি অনিবার্য। তার সংকটের

মূল তার ইতিহাসের মধ্যেই। ব্যাপারটা ঘটেছে কি? এক দিকে তার মন অবুদ্ধি অবিদ্যার সংস্কার বাদ দিতে দিতে শেষকালে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এতকাল আমরা যেসব জিনিসকে মানুষের হিতবুদ্ধি ব'লে মনে করতাম এখন সেগুলিকে শ্রেণীবিশেষের হিতবুদ্ধি বলে প্রমাণ করতে দেরি লাগছে না। অন্য দিকে, ইতিহাসের চাকা এমনই ঘুরেছে যে দেশবিদেশের সম্পদ আহরণ করে নিজের দেশকে ধনী করবার দিন আর নেই। এরই ফলে আজ ইউরোপীয় দেশগুলির নিজেদের মধ্যে লেগেছে কলহ, আবার প্রত্যেক দেশের মধ্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে লেগেছে সংঘাত। এই মানস ও বাস্তব উভয়বিধ সংকট তার সামনে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিছুকাল আগে কোন সংবাদ-পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার এই মানস সংকটের স্বরূপটা সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সেই কথাটার উল্লেখ করি। বর্তমান কালের পশ্চিমের মানুষের মনের অবস্থাটা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন যে, যারা কমিউনিজ্‌মের মত একটা খুব অন্ধবিশ্বাসের অনুরক্ত নয়, তাদের মন আজ কেবলই সন্দেহের দোলায় দুলছে। তাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এক দিকে প্রাচীনকালে ধর্ম বা নীতি বা হিতবুদ্ধি বলতে যা বোঝাত তা তাদের কাছে মৃত। লোকে এখন মানুষ খুন করে না, তার কারণ বাইবেলের অনুসরণ নয়, আইনের ভীতি। অথচ তারা জীবনে একটা গভীর অর্থের সন্ধান খুঁজছে, কেবল আহার নিদ্রা নিয়ে খুশি থাকতে চায় না, কিন্তু তারা সেটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। এই সমস্যাটারই ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে রাসেল বলছেন, এমন এক যুগ ছিল যে সময় নির্জন পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রে গ্রহতারার অবিরাম গতি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আদিম মেষপালক মনে করত যে, এই গ্রহতারাই তার ভাগ্যনিয়ন্তা। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে

এসব বিশ্বাস আর সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান মানুষকে কি দিয়েছে? রাসেলের মতে বিজ্ঞানের দানকে, অথবা বিজ্ঞানলিপ্সু চিত্তভঙ্গিমাকে, তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। মানুষের প্রথম সংঘর্ষ হল প্রকৃতির সঙ্গে। শীত-গ্রীষ্ম থেকে সে বাঁচতে চায়, ব্যাধি-মহামারী থেকে মুক্তি চায়, সাগর-পর্বতের বাধা জয় করতে চায়, ফসল ফলাতে চায়। তাই সেই আদিমকালে অগ্নি-আবিষ্কারের পর থেকে এ যুগের শব্দগতি বায়ুযান পর্যন্ত সবই হল সেই পর্যায়ের চেষ্টা। বলা বাহুল্য, এদিকে তার অসাধারণ সাফল্য। কিন্তু এই দিকে বিজ্ঞানবুদ্ধির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর এক পর্যায়ের সংঘর্ষ শুরু হয়। সেই সংঘর্ষ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নয়, সে সংঘর্ষ হল মানুষের সঙ্গে মানুষের। আজ আমরা সেই অবস্থায় আছি। সম্প্রতি কথা উঠছে যে আণবিক শক্তিকে যুদ্ধের কাজে না লাগিয়ে শিল্পের কাজে লাগানো হবে। রাসেল বলছেন, মানুষের বর্তমান অবস্থায় এ কথাটা একেবারে বাজে! মানুষের চিত্তে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের ইচ্ছা থাকলে এ শক্তিকে যুদ্ধের কাজে তারা লাগাবেই। কিন্তু যদি আমাদের জৈবক্লান্তিতেই হোক বা শুভ বুদ্ধিতেই হোক এই সংঘর্ষ আমরা কোনরকমে এড়িয়ে যেতে পারি, তা হলেও আর একটা সংঘর্ষ বাকি থেকে যাবে। সেটা হল নিজের অন্তরের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ। যে মানুষ আদিম মেষপালকের মত গ্রহতারায় বিশ্বাস করতে পারে না, যে মানুষের কাছে traditional moralsও মৃত, অথচ যে মানুষ কমিউনিজ্ম বিশ্বাস করে না, সে আজ দাঁড়াবে কিসের উপরে? রাসেল বলছেন, পরস্পর মিলিত হও, তা হ'লেই বিজ্ঞান তোমাদের আজ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার বদলে তখন সে জীবনের দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মিলব কিসের ভিত্তিতে? তার কোন জবাব রাসেল দেন নি।

রাসেলের ভাষা উদ্ধৃত করি কিছু কিছু—

The present time is one in which the prevailing mood is a feeling of impotent perplexity.... One of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid and those with any imagination are filled with doubt and indecision. [In this age] the whole conception of sin has, as it were, gone dead, so far, at least, conscious thought and feeling are concerned. Most people have not thought out any other system of ethics and have not, perhaps, theoretically rejected the old system....But it has lost its hold on them....They have, in fact, no wish to conform to the ancient pattern.

[But] A way of life cannot be successful so long as it is a mere intellectual conviction. It must be deeply felt, deeply believed, dominant even in dreams....I should wish to pursuade those to whom traditional morals have gone dead, and yet who feel the need of some serious purpose over and above momentary pleasure, that there is a way of thinking and feeling which is not difficult for those who have not been trained in its opposite and which is not one of self-restraint, negation and condemnation.

* * *

It is in the nature of man to be in conflict with something....The contest, in which men are engaged, are of three kinds—they are conflicts of (1) Men with nature ; (2) Men with other men ; and (3) Men with themselves.

...Every victory over physical nature makes

possible an increase in the numbers of the human species and has been usually used mainly to this end. But in proportion as man masters his environment his relations to his fellowmen assume increasing importance, partly because the technique of mastery over nature involves social groups more cohnent than those of the most primitive man, and partly because in proportion as the winning of daily bread becomes easier, a greater amount of energy can be set aside for killing the enemies.

There comes, however, a moment in human evolution when owing to the growth of technique, men can become richer through agreement with previous competitors than through extermination of enemies. When this stage is reached, what may be called the demands of technique require a cessation, or at least mitigation, of the conflicts of man with man. When this stage is reached (it is in fact the stage which mankind has reached at the present moment) the conflicts that most need to be resolved are the conflicts of man with himself.

....For these reasons the war of man with himself is that which, at the end of human evolution, assumes supreme importance. By this means [i.e. large scale co-operation if and when possible] an external harmony of man with man can be established, but it will not be a genuine harmony until men have achieved a genuine harmony with themselves....

Man, by the mastery of nature, has emerged gradually into a degree of liberty for which he seems as yet insufficiently adult. In an age of mechanics and skilled scientific production we retain the feelings, and many of the beliefs, that were appropriate to the ages of scarcity and primitive agriculture....The freedom from bondage to nature therefore is by no means wholly a boon ....scientific knowledge in fact give the means (when there are means) of combating any extra-human enemy but it does not give the means of combating the human enemy without, or the part of the individual soul which leads it towards death than towards life.*

তার মানসিক অবস্থাটা যখন একদিকে দাঁড়িয়েছে এইরকম, তখন অন্যদিকে বস্তুজগতের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি? সাম্রাজ্যবাদের যুগ গত হয়েছে, সুতরাং সারা সাম্রাজ্যের সম্পদ আহরণ ক'রে দেশের লোকের আর্থিক সঞ্চয় বাড়াবার আর উপায় নেই। তারপর ইউরোপের নবলব্ধ শক্তি যতদিন সাম্রাজ্যবিস্তারেই নিবদ্ধ ছিল তত-দিন চলছিল বেশ, কিন্তু যখন ইতিহাসের চাকা ঘুরতে ঘুরতে তাদের নিজেদের মধ্যে মর্মান্তিক কলহ লেগে গেল, তখন ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্য রকম। পর পর দুটো মহাযুদ্ধে তার অবস্থা গেল বদল হয়ে। তারপর এল তৃতীয় পর্যায়, যে সময় দেশের গরিব লোকেরা বললে যে, দেশের মধ্যে আমরা চিরকালই শোষিত হয়ে থাকব—এ জিনিস

* প্যারিস থেকে প্রকাশিত Continental Daily Mail নামক দৈনিক সংবাদপত্রে জুন ও জুলাই ১৯৫১তে লিখিত রাসেলের পাঁচটি প্রবন্ধ হতে এই সকল অংশ উদ্ধৃত।

চলতে পারে না, কেননা, এ তো বিধির বিধান নয়, এ হল মানুষেরই চক্রান্ত। এ কথা তার পক্ষে বলা খুবই স্বাভাবিক, কেননা, রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধারার নির্মোহ মননশীলতার শিক্ষাই সে এতদিন পেয়ে এসেছে। যতদিন তা প্রাচ্যের কুসংস্কার ভাঙবার কাজে বা শোষণের কাজে লাগছিল ততদিন তা ভাল, আর এখন তা নিজের গায়ে লাগছে বলে খারাপ—এ কথা বললে চলবে কেন? যাঁরা বলেন, সমাজে অর্থবান মাইনরিটিরও অন্তত: বাঁচবার অধিকার আছে, জনস্বার্থে এই সংখ্যালঘুদের বাঁচবার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হবে না কমিউনিজ্‌মের এই মতবাদ হল মনুষ্যত্বের চরম অপমান,—তার উত্তরে যদি কেউ বলে যে, আফিং না খেয়ে বাঁচবার অধিকার তো চীনদেশের ছিল, কিন্তু তাদের জোর করে আফিং খাওয়াবার জন্য অহিফেন-যুদ্ধ করতে এবং বলপ্রয়োগ করতেও তো কুণ্ঠা হয় নি—তখন সে কথার জবাব কি রইল? কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এর মধ্যে জৈব সুখের আহ্বান ছাড়া কিছুই নেই। উত্তরে বলা যেতে পারে, হয়তো ঠিক কথা—কিন্তু এ পর্যন্ত তো জৈব সুখ ছাড়া অন্য কোন দিকেই এই শক্তি প্রযোজিত হয় নি; আর তাই যদি হবে তা হলে সে সুখ কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকের করতলগত হয়ে থাকবে, আর বাকি সকল লোক নিদারুণ দুঃখে কাল কাটাবে, এ কেমনতর কথা? ইউরোপীয় যুক্তিতে এর কোনও জবাব নেই, কেননা, এটা তাদের কথারই উল্‌টো মার—তাদের এতদিনকার যুক্তিরই নিষ্ঠুর পরিণতিমাত্র। সেইজন্য ইউরোপীয় সভ্যতার মূল কাঠামোটাকে বজায় রেখে তার মধ্যেই কমিউনিজ্‌মকে প্রতিহত করার চেষ্টায় রাসেলের মত মহানাস্তিকের মুখেও traditional morals-এর জন্য যেন ক্ষীণ আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে। আমরা ইউরোপের কাছেই secular state-এর পাঠ নিয়েছিলুম, কিন্তু আজ নিজের যুক্তির মারকে ঠেকাবার জন্যই ইউরোপে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রলালিত ধর্মশিক্ষার চেষ্টা।

যতদূর স্মরণ হচ্ছে, ইংলণ্ডের নবতম এডুকেশন অ্যাক্টেও ধর্মশিক্ষার কিছুদূর অবধি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও দেখি, আজ আবার প্রায়-প্রকাশ্যে ফ্যাসি ও নাজি নেতাদের কোলে টেনে নিতে এবং উৎসাহ দিতেও তেমন আপত্তি নেই। কিন্তু অতীতের হৃতশক্তি ধ্বংসাবশেষ দিয়ে ভবিষ্যতের পথ রচনা হয় না। তার জন্য চাই নতুন কালের বাণী, যা নতুন জোয়ার এনে দেবে মানুষের মনে। নৈষ্ঠিক কমিউনিজ্‌মের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্রূরতা নির্যাতন প্রভৃতি বহু জিনিস থাকা সত্ত্বেও সে আজ বহুলাংশে ইউরোপীয় সভ্যতারই logical পরিণতি, অথচ তার মধ্যে মানুষের মনকে নাড়া দেবার একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে একথা অস্বীকার করব না। অন্য দিকে যাঁরা সেই সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে থেকে ঐসব ক্রূরতা নির্যাতন বাদ দিয়ে নতুন নির্মিতির সন্ধান খুঁজছেন তাঁরা এটা-ওটা ধরছেন বটে, কিন্তু কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না। এই রকম সংকটের কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

আমি জানি, আমাদের দেশের অনেক পাঠক এই পর্যন্ত পড়েই খুব উল্লসিত হয়ে বলবেন, দেখেছ তো, বস্তুতান্ত্রিকতার কি পরিণতি হল? এর থেকে যদি উদ্ধারের কোনও উপায় থেকে থাকে, তা হলে তা পাওয়া যাবে প্রাচ্যের মহাবাণী "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"-র মধ্যেই, আজ এই কথাটাই প্রচার করবার দরকার আছে।

আমার এই পাঠকদের বলি যে, প্রাচ্যের এই বাণীর মধ্যে যত বড় কথাই উচ্চারিত হয়ে থাক্ না কেন, বর্তমান সমাজের কাঠামোর

এই বাণীর মধ্যে সংকটের সমাধান খোঁজা সম্পূর্ণ ভুল। পাশ্চাত্যেও এই বাণী চলবে না, প্রাচ্যেও নয়। তার কারণটা বলি।

আমাদের শাস্ত্রেই বার বার করে অধিকারীভেদের কথা বলা হয়েছে। সেইজন্য যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা ঋষিরা বলেছিলেন তখন তাঁরা বলেছিলেন, অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হঠাৎ হয় না, অথ—অনেক মানস-পর্যায় পেরিয়ে আসবার পর, অতঃ—সেই বিবর্তনের ফলে, ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা হয়। সেই গোড়ার সাধনা শেষ না হলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারই হয় না। হঠাৎ একটা পথের লোককে ডেকে যদি বলি যে, তুমি স্ত্রীপুত্র ঘরবাড়ি ছেড়ে এই গাছ-তলায় বসে সূর্যের দিকে এক চোখে তাকিয়ে অনবরত 'মার্তণ্ড্য মার্তণ্ড্য' জপ করে যাও তা হলেই তোমার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হবে, তা হলে তার ব্রহ্মপ্রাপ্তির চেয়ে আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই বেশি।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সেই কথা। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের কথা সে-ই বলতে পারে, যে ভোগের চরম করেছে এবং যার ভোগের উপকরণের অন্ত নেই। সেইটেই হল ত্যাগ। যে ভোগই করে নি, যার কাছে ভোগের কোনও উপকরণই নেই, সে যদি বলে বসে—আমি সব ত্যাগ করলুম, তা হলে সে কথা ঈশপোক্ত শেয়ালের দ্রাক্ষাফল সম্বন্ধে উক্তিরই সামিল। দেড়শো বছর রাজত্ব করবার পর ইংরেজ ভারতবর্ষকে বলতে পারে—আমি আর সাম্রাজ্য ভোগ করব না, সত্যি সত্যি সেটা ত্যাগ করতে চাই। সে যদি সে কথা সত্যি সত্যি বলে তা হলে সেটা তার মহৎবুদ্ধির পরিচয় হবে। কিন্তু আজ যদি ভারতবর্ষ বলে বসে—আমি সব ত্যাগ করে ইংরেজকে দিয়ে দিলুম, তা হলে সেটা প্রবলের কাছে দুর্বলের আত্মসমর্পণ ছাড়া আসলে কিছুই নয়।

যখন প্রাচ্যের তপোবনে এইসব মহাবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তখন প্রাচ্যে সেকালের মাপকাঠিতে বস্তুস্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব

ছিল না, বরং তখন প্রাচ্যই ছিল সারা জগতের সভ্যতা ও ঐশ্বর্যের কেন্দ্র। কাজেই সে অবস্থায় যদি এই বাণী উচ্চারিত হয়ে থাকে তখন তার একটা গভীর সার্থকতা ছিল।

কিন্তু আজকের ভারতবর্ষের সে অবস্থা নয়। আজকের ভারতবর্ষ রোগ-ব্যাধিতে জরাজীর্ণ, অস্বাস্থ্য-অপুষ্টিতে হৃতবল, আর্থিক অভাবে দীন, অশিক্ষা-অবুদ্ধির বন্ধনে জর্জর। তার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, জৈব জীবনের সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও তার মেটে না। অথচ এগুলো যে দৈবের বিধান নয়, নির্মোহ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে অবলম্বন করলেই যে ব্যাধি-মহামারী তাড়ানো যায়, অস্বাস্থ্য-অপুষ্টি দূর করা যায়, শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, এ শিক্ষা ইউরোপ আমাদের দিয়েছে। সেই বুদ্ধিকে অবলম্বন করে সে আমাদের উপর আধিপত্যও বিস্তার করেছে, আমাদের মার্তণ্ড্য মন্ত্র তাদের দুর্দাম গতিবেগকে ঠেকাতে পারে নি। সুতরাং আজকের দিনে আমাদের দুরবস্থা যেমন আছে তেমনই চলতে থাক্ আর আমাদের অক্ষমতার আবরণ হিসেবে আমরা মার্তণ্ড্য মন্ত্রের দোহাই পাড়তে থাকি—এ কথা সম্পূর্ণ অচল। বরং বহুকাল ভোগ করবার পর, বহু ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় চিত্তে যদি বা প্রশ্ন জাগবার কোনও সম্ভাবনা হয়ে থাকে, অতঃ কিম—যে দেশে জৈবজীবনের ন্যূনতম উপকরণটুকুও মেলে না, সে দেশে সে প্রশ্নের সম্ভাবনাই হতে পারে না। বরং সে দেশ পাশ্চাত্যের চেয়েও এখন আরও বহুদিন বেশি মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক হয়ে থাকবে, এই আশাই স্বাভাবিক। আর, ঘটছেও তাই। প্রাচ্যে কমিউনিজ্‌ম দেখতে দেখতে যে রকম দ্রুতগতিতে বস্তুতন্মাত্রভাবে প্রসার লাভ করছে, ইউরোপেও বোধ হয় তা ঘটে নি।

এ কথা অবশ্য সত্য যে আজ ইউরোপ তার নিজেরই যুক্তির বিভীষিকায় ভীত হয়ে যে মুক্তির সন্ধান খুঁজছে, তা রাসেল-কথিত পারস্পরিক সম্মিলনের মধ্যে হবে না। কারণ তিনি যে আসল

internal harmony চেয়েছেন সেটা সম্মিলিত জাতিসংঘের বা পশ্চিম-ইউরোপের জোড়াতালি দেওয়া স্বার্থবুদ্ধির মিলনে মিলবে না। তার জন্য চাই সত্য সত্য এমন শুভবুদ্ধি যা মানুষের মনকে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সে চরম শুভবুদ্ধির অবসর এখনও হয় নি। পাশ্চাত্য হয়তো সাময়িক ক্লান্তির বশে শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এই রকম একটা শুভবুদ্ধির সন্ধান করে, আবার সেই ক্লান্তি কেটে গেলেই পরস্পর মারামারি করতে শুরু করে। আর প্রাচ্যের অবস্থা তো বলেছিই: যখন গোঁড়া পরিবারের ছেলে মুরগি খেতে শেখে, তখন তার মুরগির ওপর টানটা চিরকালের মুরগি-খোরকেও ছাড়িয়ে যায়।

সুতরাং, পরিণামে ত্যাগের ওই মহাবাণীর মধ্যে যত বড় সত্যই থাক্ না কেন, তার মধ্যেই আসল internal harmonyর প্রকৃত সন্ধান থাক্ না কেন, সে কথা আজকে সকলকে উপলব্ধি করাবার চেষ্টা বৃথা। সেই জন্য আজকে যেটুকু শুভবুদ্ধির চেষ্টা করা যেতে পারে, সেটা অন্য দরের এবং অন্য স্তরের। সেটা বস্তুজগতকে পাশ কাটিয়ে নয়, বরং এরই মধ্যে যতটা সম্ভব শুভবুদ্ধির আমদানি করে। ঢেউয়ের উজানে গিয়ে নয়, ঢেউয়ের সঙ্গে চলবার সময়ই যথাসম্ভব হাঁকপাঁকানি নিবারণ করা। আজকের ভারতবর্ষ যদি সেই দিকে কোনও নতুন পথ আবিষ্কার করতে পারে, সেইটেই হবে জগৎ-সভ্যতায় বর্তমানে তার নতুন দান। হয়তো বর্তমান যুগের জ্ঞান-কাণ্ডের সঙ্গে শুভবুদ্ধি-প্রণোদিত কিছুটা নতুন কর্মকাণ্ডের সংযোগে এই পথের সন্ধান মিলতে পারে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে এই রকম একটা সম্মিলনের কথা বলেছিলেন। বলা বাহুল্য, জগতে অধিকাংশ ভাল জিনিসেরই যে দশা ঘটে, তাঁর কথারও সেই দশা ঘটেছিল—অর্থাৎ, কেউ শোনে নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নতুন সভ্যতার তেজ বিকিরণ করতে

করতে ইউরোপ প্রাচ্য ভূখণ্ডে এসেছিল আজ আর তার সে তেজ নেই, সে শাপেনাস্তংগমিতমহিমা। আরও দেখা যাচ্ছে যে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইউরোপের সেই নতুন সভ্যতা চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছিল, সেই প্রাচ্য ভূখণ্ডেরও চেহারা বদলিয়ে গিয়েছে, তার আর পুরোনো চেহারা নেই। আজ বিশ্বজোড়া সংকটের মধ্যে প্রতীচ্য থেকে যে বাণী খুব জোরে এসে আমাদের কানে বাজছে সে হচ্ছে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাণী—যাকে সফল করার জন্য সকল রকম জবরদস্তি করতেও বহু দেশ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। এ অবস্থায় আমাদের যদি কিছু করণীয় থাকে সেটা হল ঐ নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বাণীকেই সফল করা, কিন্তু তা নতুন উপায়ে করতে হবে। আমাদের দেশের মনীষীরা বারবার বলে এসেছেন চিত্তের উদার স্বারাজ্য ছাড়া যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা বৃথা। ভয়ের শাসনসীমা বাড়িয়ে জৈবিক সুখবৃদ্ধির চেষ্টার মধ্যে মহত্তম বাণী নেই। আজ ভারতবর্ষ যদি এই সংকটের স্বরূপ বুঝে স্ব-ইচ্ছায় বিনাভয়শাসিত অবস্থায় মানবমুক্তির সেই বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা হলে সে পথিকৃতের সম্মান অর্জন করতে পারবে। আমরা স্বেচ্ছায় সানন্দে সমাজতন্ত্রবাদের পথে যাত্রা করেছি, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ এই যাত্রাকে সফল করতে পারলে আমাদের চিন্তাব্যাকুল ইউরোপের কাছে পাঠ নিতে হবে না, আমরাই নতুন পাঠ রচনা করতে পারব।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, আমরা এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক, এখন আমাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার দরকার হয়েছে। সে চিন্তা নিজের ছাড়া অন্য কারও অধীন নয় বলেই তা এলোমেলো হলে চলে না, সাবালকের মত হওয়া চাই। আমাদের দেশে কাজের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হলেও দেখা যাচ্ছে চিন্তার ক্ষেত্রে সে অগ্রগতি হয় নি। চিন্তাধারা আগের খাতেই বয়ে চলেছে অনেক সময়। বরং আরও কিছু গোলমাল যেন বেড়েছে। স্বাধীন হবার পর আমাদের খুব বেশী প্রয়োজন ছিল সুতীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধের, যে বোধ আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপকে নির্ভুল গতি দেবে। তার বদলে দেখছি, আমরা ছিটকে অনেক শতাব্দী পার হয়ে রামরাজত্বে (গান্ধিজীর অর্থে নয়) চলে যেতে চাইছি, যেখানে রাষ্ট্রপতি ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে পাদোদক পান করেন। মুখে বলি সেক্যুলরিজম, কাজে অন্য কথা। স্বাধীনতা লাভের পর, দ্বিতীয়তঃ, আর একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন ছিল সেটি হল তীব্র বিচারবোধ। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চিত্তের স্বারাজ্য এবং মোহমুক্ত বুদ্ধির উদার অনুশীলন। বস্তুতঃ এ হল গণতন্ত্রের সাফল্য এবং অগ্রগতির ন্যূনতম উপকরণ—এ না হলে স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে যাবে। অনেক স্বাধীন দেশে, যেমন ডিক্টেটর-শাসিত দেশগুলিতে, এর অভাব আছে। সেইজন্য সে দেশে আর যাই হোক গণতন্ত্র আছে বলা যায় না, ব্যক্তিমানুষের বিকাশও বিঘ্নিত। ফলে আজ যিনি পূজ্য কাল তিনি হেয়, আজ যে মতবাদ শিরোধার্য কাল তা পদদলিত। ভারতবর্ষের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তা নয়।

ভারতবর্ষের যেসব সমস্যা এতদিন চাপা ছিল এবং এখন প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলিকে সেইজন্য উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হতে পুনর্বিচার করবার প্রয়োজন আছে। আমাদের এই আত্মানুসন্ধান কিছুকাল

অবিরত চালাতে হবে, তা না হলে এখন পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি বহু সময়ই রোমান্টিকতার যে কুয়াশায় আবৃত হয়ে আছে সেই কুয়াশা কেটে গিয়ে সত্যের দীপ্ত আলো ঝলকিয়ে উঠবে না। অথচ সেই সত্যের আলো ছাড়া পথ চলতে গেলে অন্ধকারে আমাদের পতন অনিবার্য। বলা বাহুল্য তা কেউই চান না। এই দিক থেকে ভারতবর্ষের একটি সমস্যার সামান্য কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

২

গান্ধিজী যখন তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। সেইসঙ্গে তিনি বার বার বলেছিলেন সেই স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম এবং প্রধান সোপান হল হিন্দুমুসলমান মিলন। এই দুই সম্প্রদায়ে ভেদ থাকলে তার সুযোগ তৃতীয় পক্ষ নেবেই। বস্তুতঃ গান্ধিজীর চোখে এই মিলন শুধু মাত্রই স্বাধীনতা-লাভের একটা অস্ত্র ছিল না, তার চেয়েও বড় জিনিস ছিল। তিনি জানতেন কোনও দেশই আত্মকলহগ্রস্ত হয়ে বেশিদূর এগোতে পারে না। স্বাধীনতার আগেই হোক বা পরেই হোক, এগোতে গেলেই এক হয়ে এগোতে হবে। বেতালা তালে চলার ছন্দ থাকে না। তা ছাড়া গান্ধিজী ছিলেন মনুষ্যত্বের পূজারী, মানবমহিমার উদ্গাতা। সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিতে মানুষ ছোট হয়ে যাবে এতে মানবমহিমাই খর্ব হয়ে যায়। সুতরাং স্বভাবতঃই তিনি সে সংকীর্ণতাকে উত্তরণ করবার আদর্শ স্থাপনা করেছেন এবং উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেখতে পাই, এত বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তির নিরলস সাধনা সত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তাঁর দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি সফল হয়েছে, অপরটি হয় নি। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, কিন্তু হিন্দুমুসলমান মিলন ঘটল না। বস্তুতঃ

স্বাধীনতা আমরা কেন, গত মহাযুদ্ধের পর এ পর্যন্ত সতেরটির অধিক দেশ পেয়েছে। কাজেই আমাদের স্বাধীনতা পাওয়াটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়। তার মধ্যে গান্ধিজীর অপূর্ব নেতৃত্বে জনজাগরণও আছে, নানা আন্তর্জাতিক কারণও আছে, আরও অন্যান্য ব্যাপারও থাকতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতালাভটাই গান্ধিনেতৃত্বের সাফল্যের চরমতম কষ্টিপাথর এমন কথা বলা সমীচীন হবে না। বরং যদি হিন্দুমুসলমান মিলন ঘটত, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হত না, পাকিস্তানের দাবী উঠত না, আমরা এক হয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষেই স্বাধীন হতে পারতাম, তা হলেই গান্ধিনেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলা চলত। কারণ স্বাধীনতা গান্ধি ছাড়াও অনেক দেশ পেয়েছে, বর্মা পেয়েছে, ইন্দো-নেশিয়া পেয়েছে,—কিন্তু সেসব দেশে মানবমহিমার এমন পূজারীর আবির্ভাব হয় নি। কাজেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে মানবমহিমার জয়গান যদি উন্মুখর না হয়ে উঠল, মিলতে না পারলাম পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় একাত্মভাবে, তা হলে গান্ধিজীর শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা রইল কই? ভুললে চলবে না, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সাংবাদিকেরা গান্ধিজীর বাণী চাইলে তিনি বলেছিলেন, দেবার মত কোন বাণীই তাঁর নেই।

ইতিহাসের মর্যাদা রাখতে গেলে স্বীকার করতেই হয়, গান্ধিবাণীর যে অংশ সফল হয়েছে সেইটেই গান্ধিজীর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কথা নয়, হয়তো অন্য পাঁচটা কারণেও তা বিলম্বে হলেও হতে পারত। কিন্তু যেটা গান্ধিবাণীর শ্রেষ্ঠ এবং শেষ কথা, যে কথা এই আঘাতকলহখিন্ন হানাহানির যুগে দীপ্ত ভাস্করতায় গান্ধিজীর মুখ দিয়ে নতুন করে প্রকাশিত হল, যা একান্তভাবে গান্ধিজীরই কথা, সেখানে আমরা হেরে গিয়েছি। কোথায় কোনও ত্রুটি ছিল। মন্ত্রের সাধনা আমাদের সফল হয় নি।

আজ সেই ত্রুটির দিকে অন্ধ হয়ে অস্ট্রিচ পাখির মত বালিতে মুখ

গুঁজে থাকলে চলবে না। চোখ বুজে থাকলে বিপদ এড়ানো যাবে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ এখন জগৎসভায় বিপ্লিত দুরত্যয় পথে চলতে শুরু করেছে, বিপদ তার ঘরে বাইরে। রাজ্যলোলুপ বৃহৎ শক্তিগুলির অস্ত্রঝন্‌ঝনা শোনা যাচ্ছে চারদিকে, গরম এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের কোন অভাবই নেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ হচ্ছে আমাদের ঘরে। আমরা যদি আমাদের ত্রুটি বা দুর্বলতার মূল দূর করতে না পারি তা হলে চোরাবালির উপর সৌধ রচনা করলে একদিন দুর্ঘটনা অনিবার্য।

৩

বহুদিন পূর্বে আমি এইসব ত্রুটির কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলাম।[১] তার মধ্যে আমার একটা বক্তব্য ছিল, আমরা মিলনের জন্য শোভাযাত্রা বা আড়ম্বর যতখানি করেছি পথ ততখানি রচনা করি নি। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ খিলাফৎ আন্দোলনে যুক্ত হওয়া। সেকালে কি ক্ষণিক উত্তেজনায় বা কিসের লোভে এ কথা সম্ভব হয়েছিল জানি নে, কিন্তু আর একটি যুগের প্রান্তে এসে নির্মোহ দৃষ্টিতে এ কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে কি করে এই অদ্ভুত গোঁজামিল সম্ভব হয়েছিল! ভারতবর্ষ তখন অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে চাইছে, তার ঘটছে জনজাগরণ, তার গতি আধুনিক সেক্যুলর গণতন্ত্রের দিকে। খিলাফতের গতি ও প্রকৃতি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ফিরে চাইছিল ধর্মরাজ্য, তার টান হল ইতিহাসের উল্‌টো দিকে। একজন এগোতে চায় সম্পূর্ণ সামনে, একজন একেবারে পিছনে। একজনের ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ, একজনের পুরো অতীতে। এইরকম

১ মৎপ্রণীত 'দেশের কথা' পুস্তক দ্রষ্টব্য

দুটি অসম বস্তুর বিষম জোড়াতালিতে কি করে কল্পনা করা হয়েছিল দেশ এগোবে? কি করে একেই ঐক্য বলে আমরা ভাবতে পেরেছিলাম? আমার তো মনে হয় একেই উৎসাহ দিয়ে আমরা মুসলমান-সমাজের যে ক্ষতি করেছি তার তুলনা নেই। যখন তাদের দৃষ্টি অতীতের জাল ছিঁড়ে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল না সে সময় যদি আমরা তাদের মনে আধুনিকতার মূলসূত্রগুলি প্রবেশ করাতে পারতাম, যার ফলে তারাও এগিয়ে চলতে পারত সামনের দিকে, তা হলেই তাদের প্রকৃত উপকার করা হত। কিন্তু যখন জগৎ চলছে সামনের দিকে, ভারতবর্ষ চলছে সামনের দিকে, এমন কি ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজও চলবার চেষ্টা করছে সামনের দিকে, সেই সময় আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান-সমাজকে সামনের দিকে টেনে আনবার চেষ্টা না করে বরং সজোরে ঠেলে দিলাম পিছনের দিকে। তাতে কি ভারতবর্ষের হিত হয়েছে, অথবা ভারতের মুসলমান-সমাজেরও? পাকিস্তান কি এই বীজেরই মহীরুহ নয়?

আসল কথা, এইরকম জোড়াতালি দেওয়া ঐক্য যে কখনই প্রকৃত ঐক্য নয়—এ কথা আমরা বুঝি নি বা বুঝবার চেষ্টা করি নি। এ কথা বুঝতে হলে অনেক মুশকিলে পড়ে যেতে হয়, তাই হয়তো আমরা সেগুলি এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। যেখানে অনৈক্যের মূল গভীরে সেখানে সেই মূল কারণ দূর না করে শুধু উপরে জোড়াতালি দিলে কাজ হয় না। অথচ আমরা তাড়াতাড়ি কার্যসিদ্ধির আগ্রহে সেই কারণগুলি দূর করবার জন্য সময় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নষ্ট না করে কেবল উপরে একটা ঐক্য স্থাপন করতে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়েছিলাম। তারই ফলে এই দুর্গতি। মিল হয় নি, অমিল বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে।" তাই ঘটেছে। এই জন্যই "সত্যের আহ্বান" শীর্ষক

বিখ্যাত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, বলেছিলেন ধৈর্য চাই। আমরা অধৈর্যের চাপে সে কথা না শুনে চট্ করে কার্যসিদ্ধি করতে গিয়েছিলাম, তারই ফল ফলেছে।

বস্তুতঃ লখ্‌নৌ প্যাক্ট হতে শুরু করে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্যাক্ট ও আলাপ-আলোচনা বড় কম হয় নি—জিন্নার সঙ্গেই গান্ধিজী জওহরলাল সুভাষচন্দ্র কতবার কত না মিলনসূত্র আবিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ফল কি হয়েছে? প্রত্যেকবার এইরকম চুক্তি বা আলাপ-আলোচনার পর অবস্থার উন্নতি তো হয়ই নি, বরং অবনতি ঘটেছে। সন্দেহ বেড়েছে, আকাশ আরও ঘোলাটে হয়েছে। এর ক্রমসঞ্চিত ভারে শেষ পর্যন্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস দুর্লঙ্ঘ্য আকার ধারণ করল, তার অতিক্রমণ আর সম্ভব হল না। বস্তুতঃ এ হতেই বাধ্য। যদি স্বার্থের সমতা থাকে, উদ্দেশ্য এক হয়, তা হলে তো প্যাক্টের দরকারই হয় না। মানুষ তো তখন আপনিই মিলবে পরস্পর। আর যেখানে তা নেই সেইখানেই দরকার হয় প্যাক্টের, অর্থাৎ আপাতলাভের লোভে বিরোধী স্বার্থকে কোন রকমে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ আজকাল হিন্দু বিবাহেও সিদ্ধ, অন্যত্র তো বটেই। সেই গাঁটছড়া ছিঁড়েছে, সে তো ছিঁড়বার জন্যই বাঁধা, কিন্তু তার ফলে অনেকখানি আনুষঙ্গিক বেদনা ও রক্তপাত ঘটেছে বার বার, বিষাক্ত হয়ে উঠেছে আবহাওয়া।

এইরকম দুর্ঘটনা যে কেবল গান্ধিজীর আমলেই ঘটেছে তাই নয়, তার আগেও ঘটেছে, তার পরেও ঘটতে থাকবে। লখ্‌নৌ প্যাক্ট তো ১৯১৬ সালের। তা ছাড়া শুধু এ দেশের কথাই নয়।

আন্তঃরাষ্ট্রিক ইতিহাসও এইরকম চুক্তির শোকাবহ পরিণতির যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বহন করছে। সে কথা যাক।

বাংলায় ১৯০৫ সনে যখন স্বদেশী আন্দোলনে ভাবের জোয়ার বইছে তখনও একটি এইরকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেইটি উল্লেখ করি, কেননা রবীন্দ্রনাথ সেই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করে মিল ও গরমিলের তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাই উদ্ধৃত করছি—

"বরিশালের কোনো এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমঃশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।"

—'সদুপায়' ঃ রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ৫২২ পৃষ্ঠা

এই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তাতে এই জেদের কারণ বিশ্লেষণ করেন। কালক্রমে সে বিশ্লেষণের মূল্য কমে নি বরং বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হ'ক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশি মাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশঃ লোকের সম্মতি জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে-কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।[২]

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।…আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে,

২ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেও এই সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে।

ইংরাজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই··· ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখনই না পাই তখন রাগ হয়।···যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নিচের লোকেদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে।···সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপর রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসাবশতঃই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে।···যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।···বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি সন্দেহ নাই।”

—ঐ, ৫২৬-২৭ পৃষ্ঠা

এই অধৈর্য অসহিষ্ণুতা এবং ক্রোধোন্মত্ততার ফলে আমরা যে বিভীষিকা দূর করতে চেয়েছি সেই বিভীষিকাকেই শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছি। আমাদের মন্ত্রসাধনার গলদ এইখানেই ঘটেছিল। এ মন্ত্র ছিন্নমস্তার সাধনার মন্ত্র, যাতে দ্রুত সিদ্ধি আনে কিন্তু সিদ্ধির মুহূর্তে মাথা কাটা যায়। এ ইতিহাস আমাদের নতুন নয়, বরং খুব বেশী পুরনো, বার বার এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। আমরা আমাদের অসহিষ্ণুতায় ও দ্রুত কার্যসিদ্ধির লোভে কিছুতেই ভিতরের গরমিল দূর না করে কেবল বাইরে মিলনের চেষ্টা করেছি। গান্ধিজীর

আমলেও অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখনও লিখেছিলেন—

"প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই যে আশ্চর্য উদ্‌বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁচেছিল।...এসে একটা জিনিস দেখে আমি হতাশ হয়েছি। দেখছি, দেশের মনের উপর একটা বিষম চাপ। বাইরে থেকে কিসের একটা তাড়নায় সবাইকে এক কথা বলাতে এক কাজ করাতে ভয়ংকর তাগিদ দিয়েছে।...কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে। কেন বাধ্যতা? আবার সেই রিপুর কথা এসে পড়ে, সেই লোভ। অতি সত্বর অতিদুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে।...এই প্রলোভনে দেশের এক দল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' এটা যে ভারতের কথা সে ভারত এঁদের মতে স্বরাজ পেতেই পারে না।...স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য, তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি চাই।...আমার ওস্তাদ যদি আমার দরিদ্র অবস্থার প্রতি দয়া ক'রে হঠাৎ ব'লে বসেন 'বাবা, বীণা তৈরি করাতে বিস্তর আয়োজনের দরকার, সে তুমি পেরে উঠবে না, তুমি বরঞ্চ এই কাঠির গায়ে একটা তার বেঁধে ঝঙ্কার দাও, তাহলে অমুক মাসের অমুক তারিখে, এই কাঠিই বীণা হ'য়ে বাজতে থাকবে', তবে সে কথা খাটবে না।"

—কালান্তর : সত্যের আহ্বান

সে কথা খাটে নি এই নির্মম সত্য আজ আর বলবার দরকার

করে না। পূর্বেই বলেছি গান্ধিজীর দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রধানতম উদ্দেশ্যটিই সফলতা লাভ করে নি।

হয়তো কিছু বা আশা জাগত যদি দেখা যেত স্বাধীনতার পর আমরা এই ভুল বুঝেছি। সংক্ষিপ্ত উপায়ে দুর্লভ ধন লাভ করার চেষ্টা, এবং সে চেষ্টায় অসফল হলে অধৈর্য অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেছি। শুরু করেছি সযত্নপ্রয়াসে স্বরাজের সেই বহুবিস্তৃত ও শ্রমসাধ্য তত্ত্বকে সফল করে গড়ে তোলবার, যে প্রয়াস অনায়াস ও আপাতলোভের মোহে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে দ্বিধা করে না। সৌধের চাকচিক্যে চোরাবালি দূর করবার প্রয়োজনীয়তাকে ভোলে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় এখনও আমরা এই সত্যে অচলপ্রতিষ্ঠ হই নি, বরং অতীতে যে ভুল করে এসেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। যেমন, কিছুকাল হল ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যাচ্ছে। বার বার বলা হচ্ছে, ভারতবর্ষের ঐক্য বিঘ্নিত হচ্ছে, ভারতের ঐক্য চাই, যে কোনও উপায়েই চাই। ভারতবর্ষের ঐক্য তো নিশ্চয়ই চাই, সেইটেই তো সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের অনৈক্যের ছিদ্রপথে বার বার শনি প্রবেশ করেছে এই তো আমাদের ইতিহাস। কিন্তু শুধু 'ঐক্য চাই' বললেই তো ঐক্য মিলবে না। যে কোনও উপায়েও তা হয় না। অধৈর্য বা জোড়াতালির পথেও নয়। স্বদেশী আমলে জোর করে বয়কট চালাতে গিয়ে যেমন ঘটেছিল, এখনও আমরা যদি বলি যে আমরা ঐক্য চাই, একটি বিশিষ্ট পথে চাই, তোমরা তা না মেনে নিলে ঐক্য হবে না, অতএব ক্ষতি-স্বীকার করেও তা মানো, তা হলে সেই সেকালের মুসলমানদের জোর করে দিশী নুন খাওয়ানোর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। সে চাওয়াকে সত্য সত্য পাওয়ায় পরিণত করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে বিঘ্ন কোথায়। সেই বিঘ্নের মূলোচ্ছেদ না করে আমরা উপরে যতই গোঁজামিল দিতে যাই না কেন তাতে ফল ভালর বদলে খারাপ

হবে। আজও মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, ভৌগোলিক বিভাগে বিভাগে, প্রদেশে প্রদেশে, অর্থনৈতিক কাঠামোর স্তরে স্তরে শত অন্যায় ও গরমিল বাসা বেঁধে আছে, সেগুলির দূরীকরণ আগে করতে হবে। তা না হলে যে বিভীষিকার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সেই সংগ্রামই সেই বিভীষিকাকে বড় করে তুলবে—যেমন পূর্বে পূর্বে তুলেছিল। আজকের উত্তেজনায় আমরা ইতিহাসকে অমর্যাদা করবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মহাকালের অমোঘ রথচক্র এড়িয়ে পালাবার কোনও পথ নেই। এ বিষয়ে কোনও চেষ্টাই সত্যকারের দানা বাঁধবে না যদি সেই ঐক্যের ধুলোচাপা পথে ঐসব বড় বড় গর্ত লুকিয়ে থাকে। আসল সমস্যা গর্ত বন্ধ করা, ধুলো চাপা দিয়ে মনকে চোখঠারা নয়। বরং সে ধুলো চাপা দেওয়ায় অতর্কিতে হোঁচট খাবার সম্ভাবনাই বেশী।

৫

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অমনি দেশের কৃতী অকৃতী সকলেই সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে, 'আমরা তো একটা তবু যা হোক কিছু সমাধানে লেগেছি, তুমিও এমনি একটা সমাধান খাড়া করো, দেখা যাক তোমারই বা কত বড় যোগ্যতা।' সুতরাং পূর্বে সমস্যার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে যে পাপ করেছি, কিছুটা সমাধানের কথা না বললে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো নেই, বরং জনমতের আদালতে অনন্তকাল রৌরব নরক ভোগের দণ্ডাজ্ঞাও হয়তো সুদুর্লভ হবে না।

কিন্তু এই সমাধানের কথা বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, কেননা এ সমস্যাটি হল ভারত-ইতিহাসের মর্মমূলের, সেইজন্য

সমাধানও ভারতবর্ষের মহাকাশময়ই বিধৃত। তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভব নয়। তবু দু-একটা কথা বলবার চেষ্টা করব।

বলা বাহুল্য, সমস্যাটা হল ভেদ দূর করা। কিন্তু প্রশ্ন হল সেটি করব কেমন করে? এর নানা উপায় আছে। কিন্তু কোন্‌টি আমাদের গ্রহণীয়?

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে ভাববার কথাটি হল, ভারতবর্ষের সমাজে একটি অত্যন্ত মৌলিক বদল ঘটে যাচ্ছে। বলতে গেলে অন্যান্য বদল তারই অনুষঙ্গ। সে রকম বদল হয়তো ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে কখনও ঘটে নি। এই বদলটি ভাল করে না বুঝলে আমরা নতুন পথ রচনা করতে পারব না।

সে বদলটি হল, ভারতবর্ষ সমাজাশ্রয়ী দেশ হতে বদলে রাষ্ট্রাশ্রয়ী দেশে পরিণত হতে চলেছে। তারই জন্মযন্ত্রণায় আমরা বিপর্যস্ত। কথাটি আর একটু বিশদ করে বলা দরকার।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সকল মনীষীই বলে গিয়েছেন তার মর্ম ছিল রাষ্ট্রে নয়, সমাজে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজে'র সেই কথা। আমাদের ইতিহাসে কত রাজা এসেছে কত রাজা গিয়েছে, কত রাজত্বের উত্থান-পতন হয়েছে, কিন্তু তাতে সমাজের মর্মস্থল স্পর্শ করে নি। কারণ আমরা বিধৃত ছিলাম সমাজে, রাষ্ট্রে নয়। গ্রামগুলির সমবায়ে ছিল আমাদের সমাজ, সেই সমাজই আচ্ছন্ন করেছিল আমাদের জীবন। রাজা বা রাষ্ট্রের প্রবেশ ছিল তার মধ্যে খুবই কম। গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেইসঙ্গে প্রচলিত উৎসব-আনন্দ আমাদের জীবনযাত্রায় একটা সু-সম ছন্দ এনে দিয়েছিল—রাজা বদল হলেও সে ছন্দের তাল বড় বদলাত না। এই কারণেই তার দীর্ঘকাল ধরে আত্মরক্ষা সম্ভব হয়েছে, ঝড়ে-ঝাপটায় সে হয়তো সাময়িক ভাবে নুয়ে পড়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়ে নি। বেশী কেন্দ্রীভূত না হবার একটা প্রকাণ্ড সুবিধে এই-ই। একটা কেন্দ্রকে ভাঙলেই

সব ভেঙে পড়ে না, বহু কেন্দ্রের সমবায়ে রচিত তার জীবন। এর এক বিশিষ্ট ধারা আছে। সাধারণতঃ প্রাচ্য দেশে এই ধারাই প্রচলিত, ভারতবর্ষে তো বেশী করে।

য়ুরোপের ধারা সম্পূর্ণ অন্য। হয়তো এককালে তাদের ধারাও কিছু পরিমাণে এদিকে ছিল, কিন্তু বহুদিনের সযত্ন চেষ্টার ফলে আজ আর তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ ধারার বদলে সে চর্চা করেছে রাষ্ট্রের ধারা, রাষ্ট্রেই তার ধ্যানধারণা একাগ্রভাবে নিবদ্ধ। সে জানে কল্যাণকর রাষ্ট্র হলেই তার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ হবে, তাই একালে এমন কি সামাজিক বা পারিবারিক কল্যাণ-অকল্যাণের ভারও সে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে চায়। স্বেচ্ছাতেই চায়, কেননা সে জানে সে ভোটের মাধ্যমে (ডিক্টেটরী দেশের কথা বলছি না) কর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অধিকার যারই হোক না কেন, এসবের দৈনন্দিন নিয়ামক হল রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সমাজ নয়। রাষ্ট্রই সেখানে অহরহ সমাজকে ভাঙছে গড়ছে পালিশ করছে, সেখানে রাষ্ট্রের পরিধিই বহুবিস্তৃত, রাষ্ট্র বাদ দিয়ে সমাজের কথা প্রায় চিন্তাই করা যায় না। অথচ ভারতবর্ষে ঠিক এর উলটো ধারাই চলে এসেছে। গ্রাম্য সালিশী করেছে মোড়লেরা, তার জন্য রাজদ্বারে অনেক সময়েই দৌড়তে হত না। সমাজের বিধিব্যবস্থাও ঠিক করে দিতেন গ্রামের প্রধানেরাই, আর রাজা বলতে বোঝাত স্থানীয় ভূস্বামীকেই। বরং উপবীতধারী ব্রাহ্মণের বা কাষায়বস্ত্রধারী শ্রমণের যে অধিকার ছিল সমাজনির্মাণের, সে অধিকারই ছিল স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক,—রাজার প্রভাব তার তুলনায় নগণ্য। দৈনন্দিন জীবনে কোন্‌টা উচিত কোন্‌টা অনুচিত তার অধিকাংশই নিয়মিত হত সামাজিক চাপে, আইনের চাপে নয়। য়ুরোপের ধারা এর ঠিক বিপরীত।

আজ যেখানে যেখানে আমাদের গরমিলের সূত্রপাত দেখা যাচ্ছে

সেখানে ভাল করে অনুসন্ধান করলে এই কথাটিই ধরা পড়ে। আরও ধরা পড়ে আমাদের ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা। পুরো ভারতীয়ও নেই, পুরো য়ুরোপীয়ও নেই, একটা মাঝামাঝি জগাখিচুড়ী অবস্থা। এমনিতেই আমাদের সমস্যা যথেষ্ট ছিল, এখন তো আরও জটিল হয়েছে কেননা আমরা উভয় দিক্ থেকে আক্রান্ত।

এ কথা তো অবশ্য-স্বীকার্য যে আমরা পুরো য়ুরোপীয় হই নি, হতে আমাদের অনেক দেরি আছে। সেই কথা লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেছি, রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টে তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েছে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয় শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা। যদিচ একই জাতের মানুষ তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী হয়ে উঠেছিল। এই জন্যে তাদের বিপ্লবের একটিমাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলায়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে ঘুচিয়ে দেওয়া।···কিন্তু পূর্বেই বলেছি, বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়।···ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের।···ঐ যে পূর্বেই বলেছি, একদা ইংরেজ জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে জুড়েছে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয় নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না; সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজনৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে

বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।"

—শূদ্রধর্ম : কালান্তর, ২২২-২৩ পৃষ্ঠা

কথাটির তাৎপর্য খুব গভীর। ভেদই দুঃখ, ভেদই পাপ। সেই ভেদকে বজায় রেখে তার উপর ঐক্যের জোড়াতালি-পলেস্তারা দুদিনেই খসে পড়ে যাবে। কিন্তু কি ধরনের ভেদ, কি ধরনের অনৈক্য? দেশবিশেষে তার চেহারা এক-এক রকম। রাষ্ট্রাশ্রয়ী দেশে তার চেহারা ছিল রাজা ও প্রজায় ভেদ, এখন ধনী ও নির্ধনের ভেদ। ঝোঁকটা অর্থনৈতিক। লর্ডের মেয়ে চাষার ছেলেকে বিয়ে করে না তার কারণ অর্থগত শ্রেণীবৈষম্য, ব্রাহ্মণ-কায়স্থের জাতিভেদ নয়। অথচ আমাদের দেশে অহরহই দেখা যায় খুব বড়লোক ব্রাহ্মণঘরে খুব গরীব অথচ কুলীন স্বঘর থেকে ঘরজামাই করতে কিছুই আটকায় না, অথচ খুব বড়লোক ব্রাহ্মণ এবং খুব বড়লোক কায়স্থের মধ্যে বিবাহ ঘটলে রসনা অবিরত সঞ্চালিত হতে থাকে এবং সামাজিক তর্জনী উদ্যত হয়ে ওঠে। সমস্যাটা তফাত।

সকল দেশে সকল কালেই যেমন, আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে ভেদ ঘোচানো। গরমিল দূর না হলে মিল আনব কি করে? কিন্তু তার জন্য জানতে হবে আসলে গরমিল কি এবং তা ঘোচাবার উপায় কি। যতদিন আমরা সমাজাশ্রয়ী দেশ ছিলাম ততদিন এর উত্তর অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তখন ছিল আমাদের ভেদ প্রধানতঃ সমাজে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও তথাকথিত অধঃকৃতদের মধ্যে, পরস্পরের সঙ্গে আচারে আচরণে, সমাজদেহের মধ্যে ঐক্যবোধের অভাবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রাজনৈতিক সংস্কার অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারের উদ্যমই প্রবলতর হয়ে উঠেছিল সেটা অকারণ নয়। কেননা তখন পর্যন্ত আমাদের সমাজাশ্রয়ই ছিল প্রবলতর, রাষ্ট্র আমাদের জীবনে এখনকার মত ব্যাপক স্থান অধিকার করে থাকে নি। এখন সে

অবস্থা পালটেছে অথচ পুরো পালটায় নি। সমাজের সেই শতধা-বিচ্ছিন্ন ভাব, সেইসব বিরোধ অসাম্য অনৈক্যের জড় তো মরেই নি, উপরন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধনী ও নির্ধনের বিরোধ, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ দুটি ধারারই মন্দ উপসর্গগুলিই একত্রিত হল, অথচ কোনটির কোন সুবিধাই পেলাম না। এ একেবারে ডবল মার। যতদিন আমরা কোন একদিকে নির্গমনপথ না পাচ্ছি ততদিন উভয় দিক হতেই মার খেতে হবে। এই মিশ্রিত কালে আমাদের সমস্যা সেইজন্য তীব্রতর। উভয়বিধ ভেদবুদ্ধিই আমাদের দূর করতে হবে, তা না হলে প্রকৃত মিলনের ভিত্তি রচিত হবে না।

এই সংকটকালে সেইজন্য যেদিকে চাই সেদিকেই দেখি সুতীব্র সংঘর্ষ এবং বিরোধ ফণা উদ্যত করে বসে আছে। বরঞ্চ সেই কালনাগিনীর দল বাড়ছে। আমাদের জাতিগত বিভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রেণীগত বিরোধ—দুয়ে মিলে বিরোধ আরও তীব্রতর হয়েছে। শুধু কি তাই? তার উপর আমাদের প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি, সেখানেও কত বিরোধ কত সংঘর্ষ! এক প্রদেশের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের উপর অন্য প্রদেশের বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের আক্রোশ। এক প্রদেশের উৎপাদকেরা অন্য প্রদেশের গ্রাহকদের শোষণ করতে দ্বিধা বোধ করে না। কাজেই এইসব বিরোধের মূল দূর না করতে পারলে ঐক্যের জন্য মিছে চিন্তিত হয়ে লাভ নেই।

৬

পূর্বের আলোচনা হতেই সমাধানের পথটা আপনা-আপনি অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের উভয়বিধ অনৈক্য দূরেরই একটা উপায় হতে পারে, সে হল আমাদের সমাজাশ্রয়িতা পুরোপুরি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রাশ্রয়ী রাষ্ট্র হওয়া। অর্থাৎ মনে প্রাণে

য়ুরোপের কাছে পাঠ নেওয়া। তা হলে তখন ভেদটা হবে সম্পূর্ণ শ্রেণীগত এবং সেই ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না। সে পথ নিশ্চয়ই একটা মস্ত পথ, বহু দেশ সেই পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিশেষতঃ সেইসব ভেদ ঘোচাবার নানা অস্ত্র এখন আমাদের হাতে, সাম্যবাদ এখন বহুল-প্রচারিত এবং বহুল-আচরিতও, কাজেই এ পথ কঠিন নয়। আমাদের চোখের সামনেই তো বহু দেশ ক্রমশঃ সেই পথেই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

অপর একটি পথ হল সম্পূর্ণ সমাজাশ্রয়ী হওয়া, অবশ্য নতুন ধরনের সমাজ। যে সমাজ সর্বরকম শোষণ ও অনৈক্য-বর্জিত সম-সমাজ। আমরা নিশ্চয়ই ইতিহাসের চাকা উল্‌টে প্রাচীন কালে ফিরে যেতে চাই না। আমরা নিশ্চয়ই সতীদাহ চাই না (যা আবার রাজস্থান অঞ্চলে শুরু হয়েছে), আমরা নিশ্চয়ই যুক্তিবাদ ছেড়ে দিয়ে গুরুবাদ বা অবতারবাদে ফিরে যেতে চাই না (যদিচ তা আজকাল বাড়ছে), আমরা নিশ্চয়ই একালের জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো পরিত্যাগ করে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ফিরে যেতে চাই না। কাব্যে যতই গুণগান করি না কেন, মশা-মাছি-ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, সংকীর্ণ দ্বন্দ্ব-কলহে বুদ্ধিভ্রষ্ট, কূপমণ্ডূক ক্ষয়িষ্ণু গ্রামগুলি নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শ নয়। সে সমাজে ফিরে যাওয়ার কোনও অর্থই নেই, বরং অনর্থ আছে। তার চেয়ে মনে প্রাণে য়ুরোপীয় হওয়া লক্ষগুণে শ্রেয়। কিন্তু আমরা যখন আবার নতুনভাবে সমাজাশ্রয়ী হব ভাবি তখন এই পুরনো যুগকে কবর থেকে টেনে তোলার কথা ভাবি না, নতুন যুগের নতুন ধরনের সজীব শোষণহীন ভেদহীন প্রাণচঞ্চল সমাজের কথাই ভাবি। তার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিমানুষের প্রাধান্য—যে ব্যক্তিমানুষ রাষ্ট্রের চাপে অপরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত নয়, পরন্তু নিজের হিতবুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই বিশ্বহিতে প্রবৃত্ত। যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ ভয়ে নয়

অন্তরের প্রেরণায় সামাজিক মঙ্গলে নিযুক্ত। যে মানুষকে অপরে বাঁধে নি, বাঁধবার দরকার হয় নি, কেননা সে নিজেই নিজেকে বেঁধেছে। যার ব্যক্তিত্ব সীমিত বা খর্বিত করা হয় নি, বরং খুব বেশী উচ্চস্তর পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে বলেই সে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, শোষণকার্যে বিরত এবং সমাজকল্যাণে আগ্রহশীল। এইরকম বিকশিত-মনুষ্যত্ব মানবের সমবায়ে বিকেন্দ্রীভূত যে সমাজ সেই সমাজই নতুন যুগের আশ্রয় হতে পারে—অন্য সমাজ নয়।

এ সম্বন্ধে আমি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে নানা আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই নে। এর কোন্‌টি শ্রেয় এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রাশ্রয়ের পথ অবলম্বন করে বহু রাষ্ট্র এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু ভারতবর্ষে এ পথের অনেক অসুবিধা আছে সে কথাও অস্বীকার করে লাভ নেই। ভারতবর্ষ মহাদেশ, তার অংশপ্রত্যংশকে রাষ্ট্রের নিগড়ে পুরো বাঁধতে গেলে যে রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরি করতে হবে তার শক্তি হবে অসীম এবং শক্তিমত্ততা হবে ভয়াবহ। দ্বিতীয়তঃ সেই বিরাট্ রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকা মসৃণভাবে ঘোরাতে সময় লাগবে বহু। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রের ভিত্তিতে মানুষের লোভ ও অনিষ্টচেষ্টাকে আটকে রাখা নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু ও-পথ একবার স্বীকার করে নিলে শেষ পর্যন্ত তার চরম সীমা পর্যন্ত এগোতেই হবে। এবং সে চরম সীমা হল কোন-না-কোন ধরনের ভয়ের শাসন। ভারতবর্ষ সে পথ বেছে নেবে কি না সেটা বিচার্য। চতুর্থতঃ আমাদের সব বিভেদটাই এখনও রাষ্ট্রাশ্রয়ী নয়। রাষ্ট্রনৈতিক শেলায়ের কাপড়ই তৈরি হয় নি। পক্ষান্তরে যদি আমরা নতুন মানুষ ও নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারি তা হলে ঐ পথের দুঃখকষ্ট এবং মানব-মহিমার লাঞ্ছনা এড়িয়েও আমরা এমনতর নতুন সমাজ রচনা হয়তো করতে পারি যেখানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলেছে অন্তরের গভীর ভালবাসায়,

মন্ত্রশক্তির তথাকথিত বন্ধনে নয়, সে মিলন হৃদয়ের টানে বলেই শর্তাধীনও নয় সন্দেহদিগ্ধও নয়, বিচ্ছেদ আশঙ্কায় সচকিতও নয়, সে মিলন সত্যকারের মিলন। এইভাবে যদি আমরা মেলাতে পারি মানুষের সঙ্গে মানুষকে, দূর করতে পারি অসাম্য অবিচার ক্ষোভ শোষণ বিদ্বেষ ও সন্দেহ, কাজের টানে নয় প্রাণের টানেই 'ভাই' আহ্বান উচ্চারিত হতে থাকে, তা হলে সেই মিলনের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ ভারতের মহিমময় সৌধনির্মাণ সম্ভব হতে পারে, নচেৎ নয়। গান্ধিজীও মিলনচেষ্টা করতে গিয়ে নিদারুণ ব্যর্থকাম হয়েছেন সে কথা স্বাধীন ভারতবর্ষের ভোলার নয়।

নানা জীর্ণ আচার-সংস্কারের বেড়াজালের মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে আমরা ভগবানের দোহাই দিয়ে কাল কাটাচ্ছিলুম, এমন সময় য়ুরোপ এল কেশর ফুলিয়ে সিংহবিক্রমে। পাঁজি, মনসা, ওলাবিবি, মঘা-অশ্লেষা, এমন কি বৃহস্পতিবারের বারবেলাটাও মানল না। বিজ্ঞানের অনুশীলন করেছে তারা, লাভ করেছে বুদ্ধির বন্ধনমুক্ত অনুশীলন, প্রতিষ্ঠা করেছে চিত্তের উদার স্বারাজ্য। মধ্যযুগের বাঁধনমুক্তির পর য়ুরোপ তার নবলব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে এই নতুন যুগের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যেখানেই য়ুরোপের মন পা বাড়িয়েছে সেইখানটাই সে অধিকার করেছে। কিসের জোরে? সত্যসন্ধানের সততায়। বুদ্ধির আলস্যে, কল্পনার কুহকে, আপাত-প্রতীয়মান সাদৃশ্যে, প্রাচীন পণ্ডিতের অন্ধ অনুবর্তনায় সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে চায় তার প্রলোভনকে সে নির্মমভাবে দমন করেছে। নিজের সহজ ইচ্ছার সঙ্গে সংগত করে সত্যকে সে যাচাই করে নি। প্রতিদিন জয় করেছে সে জ্ঞানের জগৎকে, কেননা তার বুদ্ধির সাধনা বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত মোহ থেকে নির্মুক্ত।" এই বুদ্ধির অনুশীলনের ফলে নিদারুণ শক্তি তার করায়ত্ত, স্থলে জলে আকাশে তার অবাধ বিচরণ, পারমাণবিক তত্ত্বের মালিক সে। যে কথা স্বপ্নের মত শোনাত, সে-সব কথা আজ বাস্তবে পরিণত। ব্যাধি-মহামারীকে এরা বিতাড়িত করল, দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। এই প্রবল ঢেউয়ের সামনে আমাদের আচার-সংস্কারের ঠুনকো বেড়া আর রইল না, প্রথম ঢেউয়েই তা গেল ভেসে। আর যাই হোক, প্রত্যক্ষ এরোপ্লেনের সামনে গল্পের পুষ্পকরথ টেকে না।

আজ যখন এই বিজ্ঞানবুদ্ধির ধাক্কায় আমাদের সমস্ত সংস্কার-

আচার ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছে, সে সময় এই বিপুল শক্তির অধিকারীদের মধ্যেই জেগেছে প্রশ্ন, ততঃ কিম্। ইতিহাসের দৃষ্টিতে চার-পাঁচ শো বছর বেশি নয়—টয়েনবী তো বলেন, গ্লেশিয়াল পিরিয়ডের হিসেব ধরলে পাঁচ হাজার বছরও কিছু নয়—কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে। য়ুরোপে গিয়ে দেখে এলুম, এক দিকে যুদ্ধের দামামা বাজাবার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু আমেরিকার ডলারের ঠুংকার ও কামানের হুংকার শুনেও য়ুরোপের চিত্ত তাতে সাড়া দিয়ে উঠছে না। তাই চার্চিল সাহেবের ইঙ্গিতে ইডেন জেনিভা বৈঠকে ডালেসের সঙ্গে সায় দিলেন না, তাই বৃটিশ লেবার দল গেলেন চীন দেখতে, তাই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আজ য়ুরোপের কুলীন জাতগুলি পর্যন্ত ভারতবর্ষের নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দে এবং সাগ্রহে মেনে নিচ্ছে। এর কারণ কি? কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হয় না। আজ পারমাণবিক মহাশক্তির অধিকারী হয়ে এরা থমকে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে তারা যে মহাশক্তি আজ লাভ করেছে, সেই শক্তি যুদ্ধে ব্যবহৃত হলে উভয়পক্ষই ধ্বংস হবে। সেই কারণেই আইসেনহাওয়ার পর্যন্ত কিছুকাল আগে বক্তৃতায় বলেছেন, পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান সকল জাতিই সকলের গোচরীভূত করুক। ছিন্নমস্তার সাধনার অনিবার্য পরিণতি এই-ই। শেষ পর্যন্ত প্রলয়ংকর শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে সেই শক্তির ভীষণতায় বিহ্বল হয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, এই শক্তির প্রয়োগে তো এবার চরম ধ্বংস—কোন পক্ষই বাঁচবে না।

বহুকাল পূর্বে "স্বাধিকার-প্রমত্তঃ" নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আজ পশ্চিম মহাদেশের লোক হঠাৎ পৃথিবীর সকল জাতির সংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহৎ ঘটনার জন্য তার ধর্মবুদ্ধি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই। তাই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য আজ বিধ্বস্ত, চীন বিষে জীর্ণ, পারস্য পদদলিত ; তাই কঙ্গোয়

য়ুরোপীয় বণিকদের দানবলীলা এবং পিকিনে বক্সার যুদ্ধে য়ুরোপীয়দের বীভৎস নিদারুণতা দেখিয়াছি···আজ তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের ঘরের মধ্যেই বেশ করিয়া বুঝিতেছে।" পরে আরও তীক্ষ্ণতর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ("বাতায়নিকের পত্র") "যারা শক্তিকেই চরম ব'লে জানে তারা আয়তনে বড় হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে। এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।"

এই বলির খাঁড়া যতদিন অপরের ঘাড়ে পড়ছিল, ততদিন এদের তেমন চিন্তার উদয় হয় নি। কিন্তু সেই খাঁড়া যখন নিজের ঘাড়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে তখনই মৌলিক প্রশ্ন জেগেছে। তখনই জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছে, এই প্রচণ্ড শক্তির পরিণাম কি! যে বিশ্বাসে অটল থেকে য়ুরোপ গত পাঁচ শো বছর সমস্ত পৃথিবীময় কেশর ফুলিয়ে বেড়িয়েছে, স্থলে জলে অন্তরীক্ষে শোনা গিয়েছে তার পরাক্রান্ত সিংহগর্জন, জ্ঞানবিজ্ঞানে করেছে কল্পনাতীত উন্নতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সীমানা বাড়িয়েছে অবিশ্বাস্য রকমের, আজ তার সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরে গেল। এত সত্ত্বেও কি হল! প্রকৃত পথ কি! এই প্রশ্ন সকলের মনে না হোক, য়ুরোপের চিন্তানায়কদের মন অধিকার করে বসেছে।

২

সমস্যার কথা মনে হলেই সমাধানের কথা এসে পড়ে। বিশেষত সজীব মনের ধর্মই হল, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, বিপদ

যত কঠিন আকারে দেখা দেয় সেই বিপদ উত্তীর্ণ হবার জন্য তার চেষ্টাও তেমনই দুর্জয় হয়ে ওঠে। আর য়ুরোপের মন যে সজীব মন, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু এই সংকটে সে কোন্ পথের সন্ধান পেয়েছে ?

বর্তমানে এ বিষয়ে যে সমস্ত বিভিন্ন মতামত দেখা যাচ্ছে তাতে মোটামুটি তিনটি পথের আভাস মিলছে। এক দল বলছেন, মানুষের মনে এই যে ধ্বংসের প্রবৃত্তি তা থেকে বাঁচতে হলে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে হবে। এই সংঘবদ্ধতাই হল মৃত্যু হতে অমৃতে উত্তরণের পথ। এঁদের মধ্যে কেজো লোকও আছেন, চিন্তানায়কও আছেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। মিলব তো, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে ? আমাদের সভ্যতার ধারা যেমন আছে তেমনি থাকবে, মৃত্যুবুদ্ধির ক্ষয় ঘটবে না একটুও, চলতে থাকবে অ্যাটম বোমার আবিষ্কার, আর অন্য দিকে হাত মেলানো হবে উনোর বৈঠকে, মুখে কথা চলবে নিরস্ত্রীকরণের—এমনতর অসম্ভব কি করে সম্ভব হতে পারে ? এর কোনও জবাব পাওয়া যায় না। কিন্তু যতক্ষণ এর মৌলিক জবাব না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তো ও-রকম মেলা হবে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি, সে তো সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া হবে মাত্র। তাতে অমৃতের আস্বাদ মিলবে না, পাওয়া যাবে মৃত্যুভীতদের পরামর্শ মাত্র। তাতে সভ্যতার সংকট কেবল সাময়িক চাপা পড়বে মাত্র, নতুন সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর কিছু লোক আছেন যাঁরা সমস্যার সমাধান খুঁজে পান ধর্মে। আজকাল য়ুরোপে ধর্মের নানা আলোড়ন হচ্ছে, গির্জেয় যাবার লোকের সংখ্যা নানা জায়গায় বেড়েছে শুনি। তা ছাড়া, ঠিক ধর্ম না হলেও তার আড়ালে-আবডালেও নানারকম আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ দেশে এম-আর-এ দল এসেছিলেন, তাঁরা বোধ হয় ঐ রকম আন্দোলনের অন্যতম। কিন্তু এ রকম ছোটখাট দল

নয়, খুব বড় বড় চিন্তানায়কেরাও এই দিকে ভাবতে শুরু করেছেন। এই প্রসঙ্গে টয়েনবীর কথা মনে পড়ে। কিছুকাল হল তিনি Civilisation on Trial বলে একটি বই লিখেছেন। তার মোট প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ। টয়েনবীর পরিধি খুব বড়, অল্প কালের হিসেবে তাঁর মন ওঠে নি। তাই তিনি প্রথমেই বলছেন, এক শো বছর আগে ইতিহাস লিখতে বসলে বলতে হত জগতের আরম্ভ খ্রী-পূ ৪০০৪ হতে। কিন্তু এখন ভূতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন কত কোটি বছর ধরে জীবজগতের অস্তিত্ব, জ্যোতির্বিদেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন কত কোটি বছর ধরে গ্রহ-তারার সংগঠন। এই বিরাট পটভূমিকায় যদি ইতিহাস আলোচনা করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস কিছুই নয়। ৩০৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক যদি ইতিহাস লিখতে বসেন, তাঁরা, টয়েনবীর মতে, দেখতে পাবেন যে, এ শতাব্দীর প্রধানতম ঘটনা হল সারা জগতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব। সে প্রভাব এত ব্যাপক এবং এত গভীর যে তার সংস্পর্শে যে এসেছে—এবং সারা জগৎই তার সংস্পর্শে এসেছে—তারই জীবনধারা একেবারে বদলে গিয়েছে। তার চাল-চলন আচার-আচরণ সংস্কার ধারণা সবেরই বদল ঘটেছে। কিন্তু এত বড় প্রভাব সেই সুদূরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে না। ক্রমে দেখা যাবে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অন্য সভ্যতার চাপে সংকুচিত হয়ে স্বকীয় যথোচিত ক্ষুদ্র স্থানে ফিরে গিয়েছে। টয়েনবীর কথায়, As, in the course of generations and centuries, a unified world gradually works its way toward an equilibrium between its diverse component cultures, the Western component will gradually be relegated to the modest place which is all that it can expect to retain in virtue of its intrinsic work by comparison with those other

cultures—surviving and extinct—which the Western society, through its modern expansion, has brought into association with itself and one another (ঐ, পৃঃ ১৫৮)। আরও সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে টয়েনবী বলেছেন, ৩০৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক দেখবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা শুধু যে সংকুচিত হয়েছে তাই নয়, তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। টয়েনবীর কথায়, By A. D. 3047, our Western civilisation, as we and our Western predecessors have known it, say, for the last twelve or thirteen hundred years.... may have been transformed, almost out of all recognition, by a counter-radiation of influences from the foreign worlds which we, in our day, are in the act of engulfing in ours—influences from Othodox Christendom, from Islam, from Hinduism, from the Far East. আরও সুদূর ভবিষ্যতের দিকে টয়েনবী দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, ৫০৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক আরও অন্য কথা বলবেন। তাঁর মতে The historians of A. D. 5047 will say, I fancy, that the importance of this social unification of mankind was not to be found in the field of technics and economics, and not in the field of war and politics, but in the field of religion (ঐ, পৃঃ ২১৬)। আর এই ধর্ম কোন্ ধর্ম ? তার ইঙ্গিত টয়েনবী দিয়েছেন, পূর্বোক্তির মধ্যেই তার ইঙ্গিত আছে। টয়েনবী এমন অবিশ্বাস্য কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি যে, this Russian counter-discharge in the form of Communism may come to seem a small affair when the probably far more potent civilisations of India

and China respond in their turn to our Western challenge. In the long run India and China seem likely to produce much deeper effects on our Western life than Russia can ever hope to produce with her Communism (ঐ, পৃঃ ২২১)।

এ সব কথা সত্য হবে কি না তা একমাত্র ভবিষ্যৎ জানে। কিন্তু লক্ষ্য করবার কথাটা এই যে, পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয় সম্বন্ধে টয়েনবী নিঃসন্দিগ্ধ। অন্যত্র তিনি স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে, প্রথম মহা-যুদ্ধের ঠিক আগে যখন পশ্চিমী সভ্যতার গৌরব সর্বোচ্চ, তখনই তার ভিত ছিল সবচেয়ে আলগা। She [Europe] was in the enjoyment of an undisputed ascendancy, and the peculiar civilization which she had built up for herself was in process of becoming world-wide. Yet this position, brilliant though it was, was not merely unprecedented and recent; it was also insecure. It was insecure chiefly because, at the very time when European expansion was approaching its climax, the foundations of West European civilization had been broken up (ঐ, পৃঃ ১০৩)। তার ফলে তার পতন এত দ্রুত ঘটেছে। ত্রিশ বছর আগের সঙ্গে এখনকার অবস্থা তুলনা করলেই তা বোঝা যায়। টয়েনবীর ভাষায় a contrast that is staggering to the imagination.

কিন্তু বহু হাজার বছর পরে কি হবে সে কথা ভেবে যাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, যাঁরা বর্তমান কালে নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করছেন, তাঁদের পক্ষে চার হাজার বছর পরে বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্মের প্রসার হবে—এ কথা কোনও সান্ত্বনার কথা নয়। সেইজন্য সভ্যতার

সংকট তীব্রতর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাঁদের পরিচিত ধর্মের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছেন। আজ এ রকম উদাহরণের অন্ত নেই। উদাহরণ-স্বরূপ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এলিয়টের নাম উল্লেখ করা যায়। বহির্জগতের দ্বন্দ্ব হতে পালিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে, আর এলিয়ট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টধর্মে। তাঁর মতামত তিনি বহুবার বহু ক্ষেত্রে স্পষ্ট করেই বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর Notes Towards the Definition of Culture নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, The first imortant assertion is that no culture has appeared or developed except together with a religion: according to the point of view of the observer, the culture will appear to be the product of the religion, or the religion the product of culture. কিন্তু এ পথের পথিক এলিয়ট একা নন। বহু সহযাত্রী তাঁর। ইশেরউডও তো ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এমন কি সময় সময় হাক্সলেও তার কাছা-কাছি যান। আরও অনেক আছেন, উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

বস্তুতান্ত্রিকতার ধ্বংসমূলক পরিণতিতে ভীত হয়ে পশ্চিমের মানুষ ধর্মে আশ্রয় খুঁজছে এ কথা শুনলে 'ধর্ম'প্রাণ সনাতন ভারতবাসীর আহ্লাদে আটখানা হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুত আমরা তা হচ্ছিও— পশ্চিমের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলছি, দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত ধর্মে ফিরতেই হল। কিন্তু এইখানে একটা কথা ভাবতে হবে। ধর্ম মানুষকে এবং সমাজকে ধারণ করে বলেই তার নাম ধর্ম, এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মবুদ্ধি না থাকলে লাভ ও লোভের সংঘাত প্রলয়ংকর হয়ে উঠবেই। কিন্তু সে ধর্মবুদ্ধি আর আনুষ্ঠানিক ধর্মাঙ্গ কি এক? ব্যাপক সামাজিক ধর্মবুদ্ধি ও ব্যক্তিক আনুষ্ঠানিক ধর্ম কি এক? আমি সমাজের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে গীতাতেই মনোনিবেশ করি অথবা খৃষ্টধর্মেই

আশ্রয় গ্রহণ করি, তাতে কি সমাজের মোড় ফিরবে ? প্রলয়ংকর আগুনের যে ধারা বইছে, সে ধারা কি বন্ধ হবে ? সহজেই বোঝা যায়, সমাজের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একাকী ধর্মের আশ্রয় নিলে তা কখনও হবে না। এই কারণেই আমাদের ধর্মে ব্যক্তিক তপ-জপ-উপাসনার কথা যতই থাক্ না কেন, সেইসঙ্গে শীল ও নয়ের কথা ছিল, অর্থাৎ সামাজিক কোড নির্দিষ্ট ছিল, রাষ্ট্রগত আচরণেরও নির্দেশ ছিল। মনুর সময় সেকালের উপযোগী নির্দেশ ছিল, বুদ্ধের সময় তা আরও অন্য রকম চেহারা নিল। সে যাই হোক, লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমাজকে তাঁরা বাদ দেন নি। তাই মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে সুষম শীল ও নয় ছাড়া চলতে পারে না বলে তাঁরা মনে করতেন, সেগুলিকে তাঁরা ব্যক্তিক অনুষ্ঠানের সীমিত পরিধির বাইরে টেনে এনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলেছেন।

সেই জন্য এ কথা সহজেই বোঝা যায়, ঐরকম ব্যক্তিক আনুষ্ঠানিক ধর্মের আবরণে আত্মগোপন পলায়নী মনোবৃত্তিরই নিদর্শন, সামাজিক ক্ষেত্রে বাঁচবার উপায় নয়। আর ধর্মই বা বলি কাকে ? আজ এই সংকট হতে বাঁচবার জন্য উপরি-উক্ত দুটি পথ ছাড়া যে তৃতীয় পথের অভ্যুদয় হয়েছে সে হল কমিউনিজম। তার চেহারা হল সম্পূর্ণ উলটো। বস্তুতান্ত্রিকতার সযত্ন অনুশীলনের অনিবার্য পরিণতি কমিউনিজম ছাড়া কিছুই হতে পারে না। যে সকল ভোগ্যবস্তু য়ুরোপ এতকাল চেয়েছে, যার জন্য লড়াই করেছে, গোটা পৃথিবী ছারখার করতেও ইতস্তত করে নি, অথচ সেই ভোগ্যবস্তু কেবলমাত্র বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর সুখসুবিধার উপকরণ হয়েই রয়েছে, সাধারণের কাজে লাগে নি—এখন যদি কেউ বলে, আমরা ভোগ্যবস্তুই চাই, তাকে বহুগুণিত করতে চাই, অথচ তা চাই মুষ্টিমেয় জনকয়েকের স্বার্থে নয়, তা চাই বহুজনহিতায় এবং বহুজনসুখায়, তাতে যারা বাধা দেবে তারা সমাজের শত্রু, তাদের নিশ্চিহ্ন করাই সামাজিক কর্তব্য, তা হলে

য়ুরোপের কেতাবে তার কোনও উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে য়ুরোপের তরবারি প্রাচ্যভূখণ্ডে রক্তের স্রোত বইয়েছে, শোষণের দরজা খুলে দিয়েছে; এনেছে অধীন দেশে অনাহার অপমৃত্যু অশিক্ষা, আজ যদি বহুজনহিত ও বহুজনসুখের জন্য সেই তরবারি তার নিজের ঘাড়েই পড়ে, তা হলে সে বাধা দেবে কোন্ মুখে, কোন্ যুক্তির জোরে?

আজ সেইজন্য উ-নো এবং ধর্ম ছাড়া সংকটমোচনের যে তৃতীয় পথ উন্মোচিত হচ্ছে এবং যে পথের আকর্ষণ আজ ভয়ংকর, সে হল সাম্যবাদের পথ। দুর্দাম তার বেগ, দুর্নিবার তার গতি। এ তো হওয়া স্বাভাবিক। এতকাল জগৎ বস্তুতান্ত্রিকতারই পাঠ নিয়েছে সযত্নে, এখন যদি তা মুষ্টিমেয়ের মুষ্টি ছাড়িয়ে বহুজনসুখের জন্য প্রযুক্ত হতে চলে, তা হলে তাতে হোক না বলপ্রয়োগ, হোক না সমাজ-বিরোধীদের অন্ত, তার আদর্শের দুর্নিবার আকর্ষণ ঠেকানো যাবে কেমন করে?

৩

কমিউনিজমের আকর্ষণ দুর্বার হলেও এ কথা ভুললে চলবে না যে, আহরণের শেষ নেই। আজ যাতে আমরা তুষ্ট আছি, কাল তার চেয়ে আরও বেশি চাই। আজ যদি আমার রাষ্ট্রে অনেক অব্যবহৃত উপাদান থাকে, তা হলে তাই দিয়েই অনেককাল চলবে। কিন্তু তা যদি না থাকে, তা হলে হয়তো পররাষ্ট্রের সম্পদের দিকে নজর পড়বে। এখন যা পড়ছিল ইম্পীরিয়লিজমের নামে, তখন তা পড়বে একটা জনহিতের বৃহৎ আদর্শের নামে। এইভাবে বিশ্ব-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষের সত্যিকারের অন্ত হওয়া সম্ভব নয়, সাময়িক ভাবে co-existance-এর কথা যতই বলা হোক না কেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ The Economic Problems

of Socialism in the USSR-তে স্টালিন নিজে বলছেন :—
What is most likely is that the present day peace-movement, as a movement for the preservation of peace, will, if it, succeeds, result in preventing a particular war, in its temporary postponement, in the temporary preservation of a particular peace.... That, of course, will be good. Even very good. But, all the same, it will not be enough to eliminate the inevitability of wars between capitalist countries generally. It will not be enough, because for all the successes of the peace movement, imperialism will remain, continue in force—and, consequently, the inevitability of war will also continue in force. To eliminate the inevitability of war, it is necessary to abolish imperialism. সুতরাং ইম্পীরিয়লিজম উচ্ছেদের চেষ্টা যেমন একদিকে চলতে থাকবে অন্যদিকে তেমনি উচ্ছিন্ন-সাম্রাজ্য দেশগুলিতে রাখতে হবে কড়া নিয়ন্ত্রণ, যাতে আবার ধনতান্ত্রিকতার বিষ সঞ্চারিত না হতে পারে। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন বটে, এককালে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ সকল লোকেই এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্যবাদের আচরণ করবে যে উপর থেকে নিয়ন্ত্রণের দরকার হবে না, মানুষের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণেরই কাজ চ'লে যাবে, কাজেই তখন রাষ্ট্রের আর কিছু করবার থাকবে না। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বলপ্রয়োগ এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রকর্তৃত্ব খুব ব্যাপক বিপুল ও ভয়ংকর আকারে রাখতেই হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ঘরের মানুষ গান্ধীর কথাটা ভেবে দেখা যেতে পারে। গান্ধীজীর চরমতম দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর কথাটার প্রকৃত

মর্ম বুঝবার চেষ্টা না করে ছোট কাপড় পরা, নিমপাতা খাওয়া, ছোট চুল রাখা ইত্যাদি কতকগুলি বাহ্যিক লক্ষণকেই লোকে গান্ধীবাদ বলে মনে করে। আমি কিছু লোককে জানি যাঁদের মন ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসায় ক্রূরতায় পরিপূর্ণ, অথচ যাঁরা খালিগায়ে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে সভায় বক্তৃতা শুনতে শুনতে হাঁটু মুড়ে উরুর উপর রেখে তকলি ঘোরান বলে লোকের কাছে প্রচণ্ড গান্ধীবাদী বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আমি এ ধরনের গান্ধীবাদের কথা বলছি না। আজ এইসব বাহ্যিক লক্ষণের মধ্য দিয়ে তার মোদ্দা কথাটায় পৌঁছবার দরকার হয়েছে। সেই হিসেবে দেখলে দেখা যায়, গান্ধীজী উপরি-উক্ত তিনটি পথ ছাড়াও একটি নতুন পথের কথা বলেছিলেন। সে পথ নতুন, এক হিসেবে অসাধারণ নতুন, আবার আর এক হিসেবে সব চেয়ে পুরনো। কারণ সব চেয়ে মৌলিক কথাগুলি সব চেয়ে পুরনো হ'লেও কখনও পুরনো হয়ে যায় না। সত্যভাষণ বা অস্তেয়-এর কথা বুদ্ধ বলেছেন, যীশু বলেছেন, গান্ধীও বলেছেন। তবে গান্ধীজীর বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি এইসব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বলেন নি, বলেছেন সর্বসাধারণের জন্য। অর্থাৎ সব ত্যাগ করে নির্জনে বসে এইসব নীতি অনুশীলন করার কথা নয়। সমাজে সংসারে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এইসব অত্যন্ত মৌলিক ও অত্যন্ত সহজ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর ইঙ্গিত তখনই বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে। সমাজে পুরোপুরি অস্তেয় প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হল বড়লোকদের অর্থ-সঞ্চয় বন্ধ করা—কেননা সে অর্থসঞ্চয় সামাজিক স্তেয়। গান্ধীজী এই দুরূহ সত্যের ও কঠিন পরীক্ষার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে।

গান্ধীজীর দর্শন বিশ্লেষণ করলে বাস্তবিক তিনটি প্রধান জিনিস চোখে পড়ে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি প্রায় নৈরাজ্যবাদী। থোরোর মত উদ্ধার করে তিনি বলতেন যে, রাষ্ট্রের কর্মপরিধি যত কম, যত

কম শাসনের দরকার হয় ততই ভাল। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমাজবাদী। এসব ক্ষেত্রে তাঁর অনেক উক্তি আছে, তা সকলেই জানেন, পুনরুক্তির দরকার নেই। তৃতীয়ত, তিনি সব চেয়ে মূল্য দিয়েছেন ব্যক্তিকে। সব সময়েই ব্যক্তি তাঁর কার্যক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে। যাতে ব্যক্তিসত্তা দলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এমন কার্যক্রম তিনি কখনও চান নি। তাঁর গড়বার উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিমানুষ এবং তারই সমন্বয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র। আপাতদৃষ্টিতে এ তিনটে জিনিস পরস্পরবিরোধী। কারণ যেখানেই সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানেই রাষ্ট্রযন্ত্র হয় বিপুল ও বিরাট, অত্যন্ত বিস্তৃত তার কর্মপরিধি, ব্যক্তিক জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবনের আনাচেকানাচে তার হস্ত প্রসারিত। এ রকম রাষ্ট্র থোরোর আদর্শের ঠিক উলটো—সে governs least-এর বদলে governs most করে চলে। নৈরাজ্য হল সমাজবাদের বড় শত্রু। অন্য দিকে তেমনি ব্যক্তির প্রাধান্য দিলে সমাজবাদ টেকে না। আমরা দিকে দিকে দেশে দেশে প্রত্যক্ষ করছি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রাবল্যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য নিষ্পিষ্ট, সামাজিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিক অধিকার খর্বীকৃত। সুতরাং এক দিকে সমাজবাদ বলব, অথচ অন্য দিকে নৈরাজ্যবাদের কথা বলব এবং ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক দেব সব চেয়ে বেশি—এই সব পরস্পরবিরোধী কথার মিল কোথায় ?

আপাতদৃষ্টিতে মিল নেই বলেই মনে হয় বটে। কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে হয়তো একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় এই হিসেবেই সে প্রচলিত চিন্তাধারা হতে পৃথক এবং অনন্য। সে কথাটা খুলে বলি। গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়ার কথাটা ছিল ব্যক্তি। তাকে নতুন মানুষ করবার জন্যই তাঁর সমস্ত চেষ্টা ছিল। যদি সে অহিংস হয়, অস্তেয় অভ্যাস করে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে সেই মানুষ নতুন মানুষ হয়ে দেখা দেবে। সমাজে যে যে কারণে

সংঘর্ষ উপস্থিত হচ্ছে এবং প্রচলিত সাম্যবাদ অনুসারে রাষ্ট্রযন্ত্র যেসব সংঘর্ষে একটা পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বাধ্য হচ্ছে তার কোনও প্রয়োজন হবে না। তার ফলে এঙ্গেলস যে কথা বলেছিলেন যে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, কিন্তু বহুকাল সাম্যবাদের বলপ্রয়োগে শ্রেণীসংঘর্ষ লুপ্ত থাকতে থাকতে তারপরই তা সম্ভব হতে পারে, গান্ধীজীর পরিকল্পনা তা নয়। পরিবর্তনটা হবে রাষ্ট্রের চাপের তলায় বহুপুরুষ বাধ্যতামূলক অনুশীলনে নয়, সেটা তলার থেকে ব্যক্তির মনে মনে শুরু হয়ে উপর পর্যন্ত প্রসারিত হবে। তারই ফলে বাধ্যতামূলক অনুশীলনের ফলে পরিবর্তন আনবার দরকার হবে না, তা হবে স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং স্বেচ্ছামূলক। একথা নতুন কথা সন্দেহ নেই। আমরা অস্থির হয়ে বলে থাকি বটে, এত সময় কোথায়, এত ধৈর্যও কোথায় পাব ? আর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল শক্তি যখন হাতে রয়েছে তখন সেটা ব্যবহার করে সকলকে চাপ দিয়ে গড়ে-পিটে দিলেই তো হয়। হয়তো হয়, কিন্তু তাতে সে চাপের চিরস্থায়িত্ব থেকে আমরা কোনও কালে মুক্তি পাব কিনা সন্দেহ, এঙ্গেলস-কল্পিত যুগ কোনও কালে আসবে কিনা তাও সন্দেহ। কারণ শেষ পর্যন্ত সবার গোড়ার কথা মানুষ—এ কথা ভুলে গেলে আসল কথাটাই ভুলে যাওয়া হয়। চিরকালই যদি মানুষকে চাবুক মেরে চালাতে হয় তা হলে তার মূল্য রইল কোথায় ?

এই দ্বিধারার মধ্যে ভারতবর্ষকে পথ বেছে নিতে হবে। কাজটা সহজ নয়। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, এই দুরূহ কাজেই ভারতবর্ষ ব্রতী হয়েছে। সে যখনই প্রতিজ্ঞা করেছে একদিকে গণতন্ত্রও রাখব, অন্যদিকে সমাজবাদও স্থাপনা করব, তখনই সে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সমাজে যে অত্যাচারকে খর্ব করবার জন্য অন্য রাষ্ট্রে ভয়ের শাসনসীমা প্রসারিত হতে হতে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, এখানে সেই অত্যাচারকেও দূর করতে হবে অথচ ভয়ের সীমা

প্রসারিত করব না, এই অতি কঠিন কাজ সুসম্পন্ন না করতে পারলে এই দায়িত্ব পালন হবে না। তার জন্য চাই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত চেষ্টা এবং সজ্ঞান কর্তব্যপালন। গান্ধিজীর একথা ঠিক যে আমাদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সহযোগিতা না থাকলে কখনও শোষণ বা অত্যাচার চলতে পারে না। সুতরাং যে নতুন পরীক্ষা ভারতবর্ষ করতে চাইছে তা কখনও সফল হবে না যদি সমাজের কোনও স্তরে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে শোষণের প্রতি সহযোগিতা থাকে। সুতরাং আজ আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হওয়া উচিত প্রত্যেকটি লোককে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাতে ঐরকম সহযোগিতা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ কাজ সহজ নয়, কিন্তু আমাদের নতুন পরীক্ষাও তো সহজ নয়— এক হিসেবে জগতে অভিনব। এই বিরাট উদ্বোধন যদি জনচিত্তে প্রবল জোয়ার আনতে পারে তা হলেই আমাদের পরীক্ষা সফল হবে।